বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার

প্রতিভাস □ কলকাতা

উৎসর্গ

বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক-সাহিত্যিকদের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

পুঁথি সাহিত্য ও পুঁথিকার

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যযুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার অবলুপ্তি। তারপর কয়েক দশক কাব্য সংকট। বাংলা সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্ন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) আবির্ভাব তার মধ্যে মধ্যযুগীয় ও আধুনিকযুগীয় কাব্য ধারার সংমিশ্রণ। এই সময় আধুনিক কাব্য সাহিত্যের দিকপাল স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব। বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা কবিতার জনক। এই দু'ধারার মাঝখান দিয়ে মধু কবির আগ পর্যন্ত যাত্রা ছিল কবি ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯)। পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রচলন ঘটে বাংলা সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে। পুঁথি কাব্যের উদ্ভব সম্পর্কে নির্ধারিত সন-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও ত্রয়োদশ শতক এর সর্বনিম্ন পর্যায় বলে পণ্ডিতকুলের ধারনা। ভ্রূণাবস্থার কারণে পুঁথি সাহিত্যে সেই সময়কার কোন বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এই মঙ্গল কাব্যের চরম বিকাশ ও ঐশ্বর্যের যুগ। এই সময়েই বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীচৈতন্যের আদর্শে জীবনী সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাহিত্যের এই ত্রিবেণী সংগমকালে পুঁথি সাহিত্যও আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়। পুঁথি সাহিত্য একান্তভাবে এদেশের মুসলমানরাই প্রচলন করেন। হিন্দু দেব-দেবী, রথী, মহারথীদের গুণকীর্তন বর্ণনায় যখন এদেশের হিন্দু সাহিত্যিককুল দিশেহারা তখন তারই প্রতিবেশী মুসলমানদের ভিতরেও নিজ ধর্মের মাহাত্ম বর্ণনায় একটি প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হিন্দু কবিরা পূর্বাহ্নেই বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাই প্রতিযোগী মুসলমানরাও নিজেদের ঐতিহ্যমূলক ও জাতীয় জীবনে প্রেরণাদায়ক ক্লাসিক্যাল আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে সরাসরি কিংবা উর্দু থেকে পুঁথিতে পুঁথিতে অনুবাদ করেন এবং বড় খাঁ গাজীর কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করে এদের মাহাত্ম হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম অপেক্ষা হীনতর নয় মর্মে প্রমাণে সচেষ্ট হন। এভাবেই হিন্দুদের মঙ্গল কাব্যের সমসাময়িক কালে মুসলিম পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতামূলক ধর্মীয় যুদ্ধংদেহী মনোভাবপুষ্ট দুটি স্বতন্ত্র কাব্যধারার উন্মেষ ঘটে কাব্য সাহিত্যে। মঙ্গল কাব্য ও পুঁথিসাহিত্য এরা কখনও পরিপূরক হতে পারেনি বরং প্রতিযোগী হয়েছে পরস্পর। মুসলমান কবিরা ফারসি বিভিন্ন পাঁচালি শ্রেণীর কাব্যকে তাদের পুঁথি রচনার মূল হিসাবে বেছে নেন। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের ভাষায়, 'তারা হিন্দু দেব-দেবীর পাশাপাশি মুসলিম ধর্মবেত্তা ও পীর ফকির দাঁড় করিয়ে মিশ্রিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। আর তাঁদের রচিত সে সাহিত্য শুধুমাত্র ধর্মের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জনগণের মনের ক্ষুধা মিটানোর জন্য ফারসী রচনার মূলকেই অনুসরণ করে।"

পুঁথি সাহিত্য বিষয়টি খুব একটা পুরোনো দিনের নয়— এই সেদিনওতো এর কদর ছিল। আজকের দিনে হয়তো এ সাহিত্যের কদর আর তেমন নেই। তবে একেবারে যে শূন্যের কোঠায় তাও নয়। এখনও গ্রামবাংলার পল্লী অঞ্চলে রাত্রিকালে সুর করে পুঁথি

পাঠের আসর বসে। শ্রোতাও সেখানে নেহায়েত কম হয় না। গ্রামের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ হয়তোবা পুঁথিপাঠকে সেকেলে বলে ঘৃণাই করবেন তবুও প্রাকৃতজনের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। হয়তোবা আরও অনেক যুগ ধরেই থাকবে। তবে পুঁথিসাহিত্য আমাদের ক্ষয়িষ্ণু ধারার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন কাব্যধারার ন্যায় এটিওধারা তবে স্বতন্ত্র। এই সাহিত্য প্রাকৃতজনের। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত কবি-সাহিত্যিক এর রচয়িতা। মধ্যযুগের সমাপ্তি ক্রান্তিলগ্নে আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিবর্জিত পুরাতন রুচিবিশিষ্ট জনসাধারণের রস পিপাসা মিটানোর উদ্দেশ্যে এই ধারা সাহিত্যের সৃষ্টি। কিংবদন্তি, গাল-গল্প, ধর্মীয় কাহিনী ও রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত পুঁথি সাহিত্য মূলত গ্রাম বাংলার প্রাকৃতজনের জন্যই সৃষ্ট। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও বর্ণনার আতিশয্যে সাধারণ্যে- বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের মুসলিম সমাজে একসময় এটি খুবই নন্দিত হয়ে উঠেছিল। ক্ষীণপ্রায় ধারাটি বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় হলেও বর্তমান রয়েছে।

পুঁথি সাহিত্য সাধারণ সাদামাটা শিক্ষিত লোকদের রচিত। গ্রামের খেটে খাওয়া অতীব সহজ-সরল জনসমষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই এর যাত্রা। বাংলাদেশে ১৭৬০ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত এর ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রচলন। ইতোমধ্যে বাংলা কাব্যে আধুনিক ধারা শুরু হয়ে গিয়েছে মধুসূদনের আবির্ভাবে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ে এদেশ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনে চলে যায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরও এদেশে পাশ্চাত্য ও আধুনিক ভাবধারার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেনি। ঘটেছে তার ছয় দশক পর ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর তার সিংহভাগ দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় মুসলিমদের ওপর। এই সময় থেকেই এদেশের মুসলমানগণ ইংরাজদের রোষানলে পতিত হয়। সঙ্গতভাবেই ইংরাজরা তখন হিন্দুদের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইংরাজদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে এদেশে হিন্দুগণ ক্রান্তিকালে সূচিত আধুনিক জীবনধারা ও সমাজ সচেতনতাকে রাজনৈতিক ও বৈষয়িক কারণে বরণ করে নেয়। মুসলমান কবিরা তা পারেননি। বাংলাদেশের জনসংখ্যায় অর্ধেকের বেশি অংশই মুসলমান। এই মুসলমানেরা শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে দ্রুত পরিবর্তিত নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গ্রহণ করতে পারেনি। এ কারণে প্রাচীন ও নতুন যুগের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ মুসলিম মানসের রস পিপাসা নিবারণের মানসে একদিকে কবিয়ালরা ও অন্যদিকে পুঁথিকার শায়েরগণ বাংলায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, কাহিনী কাব্য বা ধর্মভিত্তিক কাব্য রচনার প্রাণান্ত প্রয়াস চালান। তখন রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক ও বৈষয়িক দুর্গতিতে এ কাব্যধারা সাধারণ্যের মনে আনন্দ সৃষ্টির প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক কারণে বিক্ষুব্ধ-বীতশ্রদ্ধ পরিবেশে রস-ঘন সাহিত্য পরিবেশন খুব সহজ বিষয় নয়— যার কারণে পুঁথি সাহিত্য সংখ্যায় কম হলেও মুসলিম শিক্ষিত মহলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। সেই অর্থে নতুন কাব্য ধারার প্রভাব সমগ্র বাংলাদেশে যৌক্তিক অবস্থান করে নেয় এবং পুঁথি সাহিত্য একটি ক্ষীণ আবেদন নিয়ে বেঁচে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষার বদৌলতে সাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তখন তুলনামূলকভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে পুঁথি সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পান। উদাহরণ হিসেবে আমরা মুন্সী আজিমউদ্দিনের কথা

এখানে উল্লেখ করতে পারি। তিনি ময়মনসিংহের লোক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়/চতুর্থ দশকে তিনি জীবিত ছিলেন এবং তিনি অনেকগুলো পুঁথি-সাহিত্য রচনা করে পুঁথি সাহিত্যের এই ধারাটি অব্যাহত রাখেন। মুন্সী আজিমউদ্দিনের কাব্যিক যাত্রা যে ক্রান্তিকালের রোমান্টিক ভাবাদর্শেই সূচিত হয়েছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ময়মনসিংহের অপর দুই সাহিত্যিক শ্রী বরকত সরকার ও আবদুল জব্বার মুন্সীর যথাক্রমে 'ইমাম সাগরের পুঁথি' ও 'মদীনা' কাব্য দুটোও এ ধারার উল্লেখযোগ্য সংস্করণ। এঁরা উভয়েই অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে এগুলো রচনা করেন। পরে এ দুই পুঁথিকাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

অপ্রতুল তত্ত্ব ও তথ্যের কারণে পুঁথি সাহিত্য ও পুঁথিকারদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা একান্তই কঠিন। কেননা এ নিয়ে আমাদের সাহিত্য গবেষকরা বলতে গেলে কৃপণতাই দেখিয়েছেন। ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক মোহাম্মদ আজিমউদ্দিনও অকাতরে এ-কথাটি স্বীকার করেছেন। 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক জেলা পরিষদ ময়মনসিংহ প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তিনি 'ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধে অবলীলায় বলেছেন যে, পুঁথি সাহিত্যের ওপর গবেষণা সত্যিকার অর্থেই একটি দুরুহ কাজ। এক্ষেত্রে তাঁর একটি দীর্ঘ উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি এরূপ, "পুঁথি সাহিত্য বিষয়টি পুরোনো দিনের, এ দিনে এর কদর তেমন নেই। সম্ভবত সেই কারণেই তথ্যের অভাব যথেষ্ট, পুঁথির নতুন সংস্করণ-সংকট তো আছেই। এমতাবস্থায় ছেঁড়া-কাটা বা পোকা-মাকড় দ্বারা নষ্ট পুরোনো পুঁথির সংখ্যাই বেশি হস্তগত হয়, তাতে প্রায় সময়ই বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনার উদ্ভাবন ব্যতিত অন্য কোন পথ থাকে না। বিশেষত ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ মাত্রেরই দৈন্য যেখানে প্রকট, যেখানে ক্ষয়প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যাই বেশি; জিজ্ঞাসাবাদ যেখানে তথ্য সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম, সেখানে সুচিন্তিত আলোচনার প্রয়াস সন্দেহাতীতভাবে কঠিনতর কাজ। এ ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুঁথি সংক্রান্ত তথ্য, তত্ত্ব ও বিবরণ উদ্ধারে আমার প্রধান অবলম্বন হয়েছে সম্ভাব্য জায়গায় নিজের ব্যক্তিগত উপস্থিতি, নিজস্ব লোক মারফত সংবাদ সংগ্রহ, লোক পরম্পরায় আলোচনা-আলাপ এবং যেখানে এগুলোর একটিও সম্ভব হয়ে ওঠেনি সেখানে নিদেনপক্ষে চিঠির যোগাযোগ রক্ষা। এই সমস্ত প্রচেষ্টার সমন্বয়ে প্রাপ্ত সংবাদাদি, কাহিনী, তত্ত্ব ও তথ্য যেগুলো আমার বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে, সেগুলোকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এমন কথা বলার উপায় নেই যে, জেলার সকল মৃত বা জীবিত পুঁথিকার ও তাঁদের পুঁথির সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত পরিসরে এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে অথবা ব্যাখ্যাত বিষয় অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ের মূল তত্ত্বগত বা বাস্তব বীক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নয়।... এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস সামনের গবেষকদের কাজে আসবে হয়তো।" এই প্রবন্ধেরই শেষাংশে তিনি তাঁর নানা প্রখ্যাত লোক-সাহিত্য বিশারদ সিরাজ উদ্দীন কাশিমপুরীর একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তাঁর নানাকে এই পত্রটি লিখেছিলেন এবং তাঁর নানার জবাব, "ভাইরে শয্যাগত থাকিয়া তোমার ২৫/৯/৭৭-এর পত্র গেল শুক্রবার পাইয়া পড়িলাম— কয়েকবার পড়িলাম, আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ... দ্বাদশ শতাব্দির কিছুকাল পর হইতে পুঁথির ফসলে বাংলার মুসলমান তার তাহজিব-তামুদ্দুন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আমরা জাতি হিসাবে

আজও বাঁচিয়া আছি। তুমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ তাহা উত্তম কর্ম, কিন্তু সাহায্য-সহানুভূতি খুব কমই পাইবে। লোক-সাহিত্য বিষয়ে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই বলিলাম। আমি কিন্তু নাছোড় বান্দা হইয়া সহনশীলতা গুণে যতদূর পারি করিয়াছি তুমিও কর।" অতএব দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্যের তথ্য সংগ্রহের কাজটি সত্যিকার অর্থেই জটিল ও দুরূহ। তদোপরি বিষয়টি যদি পুঁথি সাহিত্য হয় যেখানে তত্ত্ব ও তথ্যের প্রামাণ্য চিত্র একান্তই অবর্তমান সেখানে তো কথাই নাই। সুতরাং প্রথিতযশা লোক-সাহিত্য গবেষকরাই যেখানে অবলীলায় স্বীকার করেছেন যে লোক-সাহিত্যের এই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উদঘাটন দুরূহ কাজ সেখানে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধসমূহে তথ্য বিভ্রান্তি থাকতেই পারে তবে প্রবন্ধসমূহে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার বিষয়ে আমাদের কোন কৃপণতাই নাই। আমরা যথাসাধ্য সত্য বিষয়টি উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছি।

পুঁথি সাহিত্যে বিভিন্ন ইসলামী রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। পুঁথির লাইনসমূহ বাংলা/ইংরাজি নিয়মে বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়েছে কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা আরবি, ফারসি নিয়মে ডান দিক থেকে বাম দিকে। সকল পুঁথিতেই হামদ ও নাত আছে। হামদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং নাত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রশংসা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গুণগান সকল পুঁথির বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও পুঁথির মাঝখানেও আল্লাহ্-রাসূলের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে এবং পুঁথিকার সব সময়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা করেছেন। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যেও হিন্দু কবিরা তাদের বিদ্যাদেবী স্বরস্বতির স্মরণ করেছেন ঘনঘন। তবে মুসলমানগণ পুঁথি সাহিত্যে হামদ ও নাত হিন্দু কবিদের অনুসরণে করেছেন বলে মনে হয় না। এখান্ত নিজস্ব তাগিদেই তা করা হয়েছে। হিন্দু কবিদের মঙ্গল কাব্যে কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছড়াছড়ি ঠিক তেমনই মুসলমানদের এই পুঁথি সাহিত্যে আরবি-ফারসি ভাষার বহুল প্রয়োগ রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাদের ধর্মীয় দিকটিকে সম্ভবত অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। পুঁথির রচয়িতাগণ সহজ-সরল সকলের বোধগম্য ভাষায় পুঁথি সাহিত্যকে অলংকৃত করেছেন। এই সহজ-সরল ভাষার মধ্যেও ব্যাকরণ সঙ্গত রূপের পরিবর্তন সাধন আছে লক্ষ্য করা যায়। অনুসর্গ-উপসর্গ রূপে আরবি-ফারসির ব্যবহার, পদ প্রকরণ ও শব্দ গঠনের দিক থেকে সাধু ভাষার সাহিত্যিক রূপের সংগে পুঁথির ভাষার সাদৃশ্য বর্তমান। তবে সর্বত্রই তা ব্যাকরণের রীতিকে অনুসরণ করেনি। কথ্য বা চলিত ভাষাও এতে সময় সময় সংমিশ্রণ করা হয়েছে। এরূপ হয়েছে সম্ভবত অল্পশিক্ষিত পুঁথিকারদের অজ্ঞতার কারণেই। একথা সুবিদিত যে বিভিন্ন অপরিহার্য কারণে পুঁথির ভাষায় ভিন্ন বিদেশী ভাষার শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। দোভাষী পুঁথির উৎপত্তিস্থল কোলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ ভরশুট-মন্দারন প্রভৃতি এলাকা। পুঁথি সাহিত্যে এ ধারার পথিকৃত ফকীর গরিবুল্লাহ ও সৈয়দ হামযার বাড়ি ভরশুট-মন্দারনে। মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে আরব, ইরাক ও ইরানের বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ সমস্ত এলাকায় ভিড় জমায়। তারা বাংলা ভাষা কিংবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন ফলে কথাবার্তা ও ব্যবসায়ী লেনদেনে তারা নিজেদের ভাষাই ব্যবহার করতেন। এ দিনে মুসলমানধর্মীয় ভাষা হিসাবে এদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে আরবি ভাষা অনুপ্রবেশ করে। মুসলমানদের প্রাত্যহিক ধর্মকর্মে আরবি ভাষা অত্যন্ত জরুরি। আরবি ভাষা আবার ফারসি ভাষার সাথে গভীর মিতালীতে আবদ্ধ। ইসলামের রাজধানী বাগদাদ নগরীর ভাষা হলো ফারসি। সতরাং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আরবির সাথে ফারসি ও মধ্যপ্রাচ্যের অপর দু'

একটি ভাষার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং সে কারণেই এদেশে মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে আরবি-ফারসি ভাষার প্রচলন গড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতকে ইরানে শিয়া সাফাবী বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। সাফাবী বংশের এই বিলুপ্তিজনিত কারণে বহু অত্যাচারিত শিয়া মতাবলম্বী মানুষ ভারতে প্রবেশ করে। তৎকালীন বাংলাদেশের নবাব মুর্শিদ কুলি খান। তার বদান্যতায় শিয়ারা বাংলাদেশে আশ্রয় পায়। এ সময় অনেক পীর-আউলিয়া-দরবেশ গণ ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে আগমন করেন। এভাবে বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের অবস্থান ও বাঙালিদের সাথে সংঘর্ষ ও আলাপচারিতায় দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে বাংলা ভাষার সাথে তাদের ভাষার মিশ্রণ ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ দুটি- প্রথমত, বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা কিংবা রাজভাষা হিসাবে ফারসি ভাষার মর্যাদা প্রাপ্তি চাকুরির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। রাজকার্যে নিয়োজিত সকল কর্মচারীই ফারসি জানতেন। এদিকে এদেশী রাজকর্মচারীরাও চাকরির স্থায়িত্বের মোহে ফারসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। এভাবে বিদেশীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও বাঙালির নিজস্ব প্রয়োজন, এ দুয়ের কারণে ফারসি ভাষা বাঙালিদেরও প্রিয় ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান যুগে ইংরাজি জানা যেমন জরুরী ঠিক তেমনই তখন ফারসি জানা জরুরী ছিল। এদেশী মুসলমানেরা আরবি-ফারসিকে সব সময়ই তাদের ধর্মীয় ভাষা হিসাবে জ্ঞান করতো। তারা সব সময়ই আরবি ফারসি ভাষার জানাকে গৌরবের মনে করতো। দ্বিতীয়ত, বিষয়ের প্রয়োজনেই পুঁথি সাহিত্যে ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। পুঁথির অধিকাংশই মূল ফারসি, আরবি কিংবা উর্দু কাব্যের অনুবাদ। বাংলা ভাষায় স্বল্প শিক্ষিত অনুবাদকারীদের তেমন পাণ্ডিত্য না থাকায় অনেক জটিল ও কঠিন আরবি-ফারসি শব্দের প্রতিশব্দ তারা বের করতে পারেনি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রতিশব্দের দৈন্যতার কারণে মূল আরবি-ফারসি শব্দই রেখে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উর্দু কাব্য আবার মূল আরবি-ফারসি কাব্যেরই উর্দু অনুবাদ—যা পুঁথিকারেরা অনুবাদ করেছেন বাংলা ভাষায়।

অষ্টাদশ শতাব্দির শুরু থেকেই বর্তমান বাংলাদেশের পুঁথিকারদের ভাষায় সঙ্গতভাবে পশ্চিম বাংলা তথা কোলকাতা, হুগলি, হাওড়ার ভাষার প্রভাব পড়েছে। কোলকাতা, হাওড়া, হুগলির সাথে আমাদের এখানকার শিক্ষিত লোকদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অষ্টাদশ শতকের ৬ষ্ঠ দশকে এদেশে প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ শাসন শুরু হয়। কোলকাতা ছিল তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী (সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত)। রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে এখানকার অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক কোলকাতা নগরীতে অবস্থান করতেন। সেই সূত্রে সেখানকার সাহিত্যিক প্রভাব অতি সঙ্গত কারণেই আমাদের ওপরও পড়েছে। কোলকাতাকেন্দ্রিক পুঁথি সাহিত্য বলতে গেলে এদেশের পুঁথি সাহিত্যের জনক। ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ পুঁথিকার মুন্সী আবদুর রহিম দীর্ঘদিন কোলকাতায় অবস্থান করেন এবং সেখানে থেকে বেশ ক'টি পুঁথি রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই কারণে তার পুঁথিতে কোলকাতাকেন্দ্রিক পুঁথির প্রভাব পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। কেন্দুয়া উপজেলার হাজী মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন হজব্রত সমাপন শেষে তার 'ছহিহ সফরে মক্কা ও মদিনা' পুঁথিটি তার হজব্রত পালনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কথা তুলে ধরেছেন— সেটিতে তার সফররত জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব অসংগত নয়। এভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকে পুঁথির ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং ময়মনসিংহ সহ বর্তমান বাংলাদেশের সর্বত্রই তার ছাপ পড়েছে।

পুঁথি সাহিত্য প্রধানত পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে লিখিত। এ তিনটি ছন্দের একঘেয়েমী থেকে রক্ষার নিমিত্ত পুঁথিকার আবার অনেকাংশে থমক, ভোটক, ধুয়া, গীত তাল আদ্ধা, ভর, গীত খয়েরা ধামাছি ছুটকি ছন্দ, ছড়া ছন্দ, গদ্য ছন্দ, ছুট পয়ার, ভঙ্গ ত্রিপদী, হ্রস্য ত্রিপদী, ঢপ, গীত রাগিনী, ইমন, ইমন কল্যাণ প্রভৃতি ছন্দ ও রাগিনী ব্যবহার করেছেন। তবে পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছাড়া অপর ছন্দগুলির ব্যবহার কদাচিত করা হয়েছে। পয়ার, ত্রিপদী, চোপদী, হ্রস্য ত্রিপদীতে অক্ষর মাত্রা রক্ষা করা হয়েছে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। পয়ারে চৌদ্দ অক্ষর ব্যবহার প্রায় সকল পুঁথিতেই রক্ষিত হয়েছে। যেমন মুন্সী আবদুর রহিম রচিত 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' থেকে উদাহরণ : 'চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর/উপনিত হৈলে এসে ব্রাহ্মণা নগর ॥ জাননা মুকুট রাজা হয় মোর পিতা/যবন পাইলে সেহ কাটে দায় মাথা ॥' ত্রিপদী ছন্দে সাধারণত অক্ষর সংখ্যা থাকে প্রতি লাইনে ৮+৮+১০=২৬টি। উক্ত পুঁথি থেকেই উদাহরণ : 'দক্ষিণা রায়ের জন্যে, ভাবে রাজা মনে মনে, হেট শিরে গালে হাত দিয়া/আছিল এমন বীর, ধরিয়া হাতীর শির, দিছে হাতি দূরেতে ফেলিয়া ॥ তাহাকে যবনে ধরে, কেবা যুদ্ধে আর পারে, কোথা যাব ঠেকিলাম দায়/জাতি কুল সব যাবে, বাঘে আর ধরে খাবে, হায় হায় করি কি উপায় ॥' হ্রস্য ত্রিপদীতে অক্ষর সংখ্যা সাধারণত ৬+৬+৮=২০টি। যেমন, 'ডাকে কালু ভাই, চাম্পাবতী নাই, অমনি পড়িল ঢলি/পড়িয়া ধরাতে, লাগিল লোটিতে, কেন্দে কেন্দে হৈয়া সাড়া ॥" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মধ্যযুগ সমাপ্তির ক্রান্তিকালে পুঁথিকারগণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে ধর্মীয় ইতিহাস ঘেঁষা কাহিনীর সাথে নিজেদের ঐতিহ্যমূলক ও জাতীয় জীবনে প্রেরণাদায়ক বিভিন্ন গালগল্প নিয়েও পুঁথি রচনা করেন। এ ধারায় তারা দেশীয় রাজন্যবর্গ, পীর-আউলিয়াদের জীবনী কিংবা উপাখ্যানকে প্রাধান্য দিতেন। ময়মনসিংহে এরূপ বেশ ক'টি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের কেন্দুয়ার (বর্তমান নেত্রকোনা) আবদুল আলী মল্লিক রচিত 'দুনা শাহার পুঁথি' (১৯০১), পূর্বধলার হাজি আমির উদ্দিনের 'বাহাদুর খাঁ' (১৮৩০), নেত্রকোনা থানার মুন্সী জহির উদ্দিনের 'বংশনামা' (১৮৮৭), আবদুর রহিম মুন্সী, কিশোরগঞ্জের 'বিধবার বিবাহ বৃত্তান্ত' (১৮৮৯) এই ধারার পুঁথি। 'ইউসুফ জোলেখা, 'সোনাভান', 'আমীর হামজা', 'হাতেম তাই', 'রসুল বিজয়', 'জঙ্গনামা', 'নবীবংশ' ইত্যাদি পুঁথি সরাসরি ফারসি মূলকে অনুসরণ করে রচিত কাব্য। প্রেম উপাখ্যান বর্ণনায় শুধু বিদেশী নয়, আমাদের এখানকার মাটি থেকেও বহু কাহিনী উৎসারিত হয়েছে। ময়মনসিংহের মুন্সী আবদুর রহিম ও আকবর আলী রচিত 'গাজী কালু চম্পাবতী' (১৮৮৭) ও অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা (১৯৬৩)-এবং ঢাকার মনোহরদী থানার মোহাম্মদ সেকান্দর আলী বেপারীর 'গহুর বাদশা ও বানেছা পরী'র (১৯০৪) বিষয়বস্তু একান্ত দেশীয়।

পুঁথির বিষয়বস্তু প্রধানত রোমান্টিক ও রহস্যজনক প্রণয়-উপাখ্যান। স্থান-কাল-পাত্র, ইহকাল-পরকাল, প্রেম-বিরহ, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-রহস্য ও উত্থান-পতন প্রভৃতি বিষয়ক বাস্তব, অবাস্তব ও ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব বিষয়ও ঘটনার বর্ণনাতিশয্য বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সম্পর্কীয় যেমন কোরআন-হাদিস, আরকান-আহকাম, তত্ত্বগ্রন্থ ও সুফিবাদ নিয়েও অনেক পুঁথি লিখা হয়েছে। অন্যদিকে রোমান্টিক পুঁথিসাহিত্য বিষয়বস্তুতে অবাস্তব, অসম্ভব হয়েও প্রাকৃতজনে বিপুল প্রাণবন্যার জন্ম দিয়েছিল। তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়, বিষয়বস্তুর অনেকখানি সার্থকতা এখানে নিহিত রয়েছে এবং অদ্যাবধিও চালু রয়েছে।

ঘটনা, বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুঁথি সাহিত্যকে আমরা সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করতে পারি। নিম্নে আমরা পুঁথি সাহিত্যের এই ছয়টি ভাগের প্রত্যেকটির আওতায়

বৃহত্তর ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্যগুলোকেও চিহ্নিত করেছি।

(১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান : সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান, ইউসুফ জোলেখা মধুমালতি, ভানুমতির লড়াই, বীরবল, চন্দ্রবান, রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা, চন্দ্রাবতী, লাইলী মজনু, গুলে-বাকাউলি প্রভৃতি। ময়মনসিংহের গাজী কালু চাম্পাবতী, বাহাদুর খাঁ ইত্যাদি। প্রেম কাহিনী এ সমস্ত পুঁথির উপজীব্য। দয়িত-দয়িতার প্রেম, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রণয়-বিচ্ছেদ ও শেষাবধি পুনঃমিলনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি। জনপ্রিয়তায় এ সকল পুঁথি প্রথম স্থান অধিকার করে।

(২) ধর্ম সংক্রান্ত : নামাজ-মাহাত্ম, কেয়ামতনামা, নছিয়তনামা, খায়রল হাসর, দোয়াগঞ্জল আরসের পুঁথি অংশ, বিসমিল্লাহ্র বয়ান, হেদায়াতুল ইসলাম, একশত ত্রিশ ফরজ, হাজার মাসলা ইত্যাদি এই শ্রেণীর পুঁথি। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ইমাম সাগরের পুঁথি, তাইইয়াতুচ্ছালাত্, রোজ হাসর প্রভৃতি। এ সমস্ত পুঁথিতে পবিত্র কোরআন-হাদিস, ইজমা কিয়াস ও বিভিন্ন মছলা মাসায়েল নিয়ে ইসলামের আচার ও নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত পুঁথিতে ইসলামের নিরেট তত্ত্বাবলী কোন রকম কাল্পনিক তত্ত্ব ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) যুদ্ধকাব্য বা জঙ্গনামা : আমীর হামজা, জঙ্গনামা, কারবালা যুদ্ধ, শহীদে কারবালা, ইমাম হোসেনের যুদ্ধ, জঙ্গে বদর, জঙ্গে ওহোদ ইত্যাদি এই শ্রেণীর পুঁথি সাহিত্য। বৃহত্তর ময়মনসিংহের শাহাদতনামা, হোসেন কুলি খা ইত্যাদি। এ জাতীয় পুঁথি কাব্যে ইসলামের গৌরবনামা, স্বজাতীর গৌরব কীর্তিত হয়েছে। এ সকল কাব্যে ইসলামী যুগ ও নিজ দেশের বিভিন্ন বীরদের গৌরব কাহিনী ছান্দসিকতায় বর্ণিত হয়েছে অন্য দিকে ইসলামী যুগের বীরগণ কর্তৃক কাফের, মুশরিক নিধনের কাহিনী ব্যাখ্যাত হয়ে স্বধর্মকে অন্য ধর্ম অপেক্ষা বড় করে দেখানো হয়েছে। অতীতের গৌরবময় কাহিনীকে বর্তমান প্রজন্মের জনগণকে উৎসাহিত করার প্রয়াসও আছে কোন কোনটিতে।

(৪) সুফিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় : তরিকতে হক্কানী, সুফিতত্ত্বের মর্ম ইত্যাদি এ শ্রেণীর পুঁথিকাব্য। ময়মনসিংহের দেল দেওয়ানা এ শ্রেণীর পুঁথি কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সকল পুঁথিতে ইসলামী সুফিইজম ব্যাখ্যাত হয়েছে। মানবাত্মা কেমন করে পরমাত্মার সংশ্রব পায় তার সবিস্তার কাহিনী এতে বিধৃত হয়েছে।

(৫) পয়গম্বর, পীর-ফকিরদের জীবনী সম্বন্ধীয় : নিযামুদ্দিন আউলিয়া, মনসুর হাল্লাজ, শফি খাঁ গাজী, বড় খাঁ গাজী, হাসন উদাস, ইসমাইল গাজী, গোরাচাঁদ, খাঞ্জা খাঁ গাজী প্রভৃতি এই শ্রেণীর পুঁথির আওতায় পড়ে। ময়মনসিংহের শেখ ফরিদের পুঁথি, শাহজালালের পুঁথি এই শ্রেণীর উদাহরণ। এই সমস্ত পুঁথিতে পয়গম্বর, পীর-আউলিয়াদের জীবনী ও তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মতবাদ বর্ণিত হয়েছে।

(৬) ভ্রমণকাহিনীমূলক পুঁথি : পারস্য ভ্রমণ, পূর্ণতীর্থ এই শ্রেণীর স্বভাবজাত। ময়মনসিংহের 'ছহিহ ছফরে মক্কা ও মদিনা' পুঁথিটিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সমস্ত পুঁথিতে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কাহিনী ও ভ্রমণকারীর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ও জনকল্যাণমূলক কিছু পুঁথি রয়েছে। ময়মনসিংহের 'কৃষক সহায়' 'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক পুঁথি। এ পর্যন্ত আলোচিত বিভাগ ছাড়া তর্ক -বিতর্কমূলক অনেক পুঁথি রয়েছে। সাধারণত সেখানে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যধর্মের হীনতা প্রকাশের প্রবণতা রয়েছে। কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, ইবলিসনামা, ফালনামা ইত্যাদি হচ্ছে খাঁটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক পুঁথি। এ সমস্ত পুঁথিকাব্যে ইসলামের

মাহাত্ম ও বাস্তব ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও স্বপ্নের বৃত্তান্ত, চিকিৎসা, তাবিজ ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি বিয়ে পুঁথি রচিত হয়েছে অল্প-বিস্তর। ইসলামী খাবনামা ও ফালনামা, সোলেমানী তাবিজের কিতাব এগুলোর উদাহরণ। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ থানার মুন্সী আজিমউদ্দিন বাংলা ও উর্দুসহ ১০/১২টি পুঁথি লিখেছেন। তার বাংলা ভাষায় রচিত পুঁথির বর্তমানে অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলেও 'আসরাবেস সালাত' ও 'রিসাল-ই-আজিমউদ্দিন হানাফী' নামক দুটি উর্দু ভাষায় রচিত কিতাবের সন্ধান পাওয়া যায়। এ উর্দু পুঁথি দুটির রচনাকাল ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমিত হয়। শেরপুরের বসির উদ্দিন মুন্সী ১৮৯০ সনের দিকে সুললিত ফারসি ভাষায়ও একটি পুঁথিকাব্য লিখেছিলেন বলে দরজি আবদুল ওয়াহাব 'ময়মনসিংহের চরিতাভিধান' গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন। পুঁথিটি এখন দুষ্প্রাপ্য বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ময়মনসিংহ জেলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র সম্ভারে মুখরিত। বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা হিসাবে এ জেলার চিরায়ত ঐতিহ্য কেবল এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও ময়মনসিংহ জেলা সারা বাংলাদেশে প্রশংসার দাবিদার। মঙ্গলকাব্য, পুঁথি, চর্যাপদ, কবি জারী, সারী, বাউল গান, একদিল গান প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার নিয়ে এ জেলা অনেক আগে থেকেই সারা বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বকারী। লোক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় এখানকার পুঁথি সাহিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও একেবারে অপাঙক্তেয় নয়। বাংলাদেশের যে ক'টি জেলায় পুঁথি সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর ও চট্টগ্রাম জেলার নাম উল্লেখ করার মতো দাবিদার। পশ্চিম বাংলার কোলকাতা, হুগলি ও হাওড়ার পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব বাংলাদেশের কথিত জেলাগুলোকে বেশি করে বিধৌত করেছে। ময়মনসিংহ তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ময়মনসিংহের পুঁথিকারগণ যে একান্তভাবে পশ্চিম বাংলার পুঁথি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা কিন্তু সর্বাংশে ঠিক নয়। ময়মনসিংহ জিলার পুঁথিকারগণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতিও অনেকাংশে রক্ষা করেছেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথি ও পুঁথিকারদের বিষয়ে আলোচনার সময় তা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হবে।

আমরা জানি আমাদের পুঁথি কাব্যের শায়েরগণ দীর্ঘদিন ধরে প্রাকৃতজনের মনে বিপুল আনন্দ দিয়ে আসছেন এ সকল পুঁথির মধ্য দিয়ে। তারা সর্বদাই দেশীয় মনোভাব লালন করেছেন এবং পুঁথিগুলোতে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশে খেটে খাওয়া মানুষ—যারা একান্তই সহজ-সরল-অশিক্ষিত আজও পুঁথি সাহিত্যকে প্রীতির চোখে দেখেন। তাদের জীবনের আনন্দ-বেদনার এক মূর্ত প্রতীক যেন এগুলো। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে বসে পুঁথি পাঠের জমজমাট আসর। রাত যত গভীর হয় পুঁথি শোনার আনন্দও যেন তত উথলে ওঠে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মনযোগ দিয়ে শুনেন। কখনও পুঁথির বর্ণনায় হেসে কুটি কুটি হন আবার কখনও বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। একজন পুঁথি পাঠক গ্রামের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বলতে বাঁধা নেই যে একজন পুঁথি পাঠক গ্রাম বাংলায় একজন পরিচিত ব্যক্তি এবং এ কারণে তিনি আদৃতও হয়ে থাকেন সর্বত্র। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে পুঁথি সাহিত্য নানা গুরুত্বে ভাস্বর হয়েও ক্রমশ বিলীয়মান, সম্ভবত বর্তমানের সমস্যাসংকুল পৃথিবী, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, একশ্রেণীর অত্যাধুনিক লোকদের এ সাহিত্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও পুঁথির ভাষা বিষয়ে শায়েরদের অজ্ঞতা ও দুর্বোধ্যতা এই সাহিত্যের ক্রম বিলুপ্তির কারণ। বিষয়বিন্যাস ও বক্তব্যে পুঁথিকারগণ শক্তিশালী নন।

তাই শিল্প নিপুণতায় পুঁথি সাহিত্য অনেকাংশে দুর্বল। এ কারণেই হয়তোবা শিক্ষিত শ্রেণীটিকে এ সাহিত্য তেমনভাবে আকর্ষণ করে না। পুঁথি সাহিত্যের কদর কমে যাওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে আকাশ সংস্কৃতির সর্বনাশা আগ্রাসন। আকাশ সাংস্কৃতি ও নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যের কাছে তো পুঁথি সাহিত্য কিছুটা অপাঙক্তেয়ই মনে হতে পারে। তথাপি জ্ঞানী মাত্রই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যের প্রাচীন ধারার প্রবহমান সমাজ জীবনের চিত্র ও ঐতিহ্য রক্ষায় পুঁথিগুলো এক অমূল্য রক্ষাকবচ।

পুঁথি সাহিত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বিশ ও একুশ শতকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এখন আর ঠিক পুঁথি রচিত হচ্ছে না— যা হচ্ছে তা হলো কবিতা নামধেয় পুঁথির অজস্র ছোটো ছোটো প্রকাশ বা সংস্করণ। আমাদের শহর-বন্দরের স্বল্প শিক্ষিত কবিরা ও গ্রাম অঞ্চলের গ্রাম্য কবিরা এগুলো রচনা করেন। সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনীকে উপজীব্য করেই সাধারণত এগুলো রচিত হয়। এ সমস্ত কবিতা একা বা দলবদ্ধভাবে সুরের মাধ্যমে পাঠ করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনও করা হয়। অনেকে তো এটাকে জীবিকা নির্বাহের পেশা হিসেবে বেছে নেয়। গ্রাম্য বাজার, রেলস্টেশন, শহরের কাচারী, জাহাজ ঘাটা প্রভৃতি জনসমাগমের এলাকায় এগুলোর আসর বসে। শ্রোতারা শহর-বন্দরে কিংবা বাজারে এসে চতুর্দিকে গোল হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনে এ সকল কবিতা। এখানে সর্বক্ষেত্রেই পাঠককে সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হতে হয়। এগুলো প্রকৃতপক্ষে পুঁথিরই শেষ অনুকৃতি বা আমেজ। আলোচনার শেষ অংশে আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করবো।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ বর্তমানে ছয়টি জিলায় বিভক্ত। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্যই এই বিভক্তি। জিলাগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর— এই ছয়টি জিলার প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা অনুসন্ধান করে মোট ১৯ জন পুঁথিকারের জীবনী আমরা কমবেশি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রভূত অভাব অনুভূত হয়েছে এগুলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে। আপ্রাণ চেষ্টায় সংগৃহীত সংবাদাদি, কাহিনী, তত্ত্ব, তথ্য ও জনশ্রুতি যেগুলো আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য ও সত্য বলে মনে হয়েছে আমরা শুধু সেগুলোই এখানে তুলে ধরেছি। আমরা এমন ধৃষ্টতা দেখাব না যে এই বৃহত্তর জিলার জীবিত কিংবা মৃত সকল পুঁথিকারদের জীবনী ও তাদের পুঁথি সাহিত্য নিয়ে অভ্রান্ত আলোচনা করছি কিংবা আমাদের আলোচনা অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্য বিষয়ে মূলে তত্ত্বগত বা বস্তুগত বাস্তব বীক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয় তবে আশার কথা হলো এই যে আমরা এই কর্তব্য করতে গিয়ে নিষ্ঠার সাথে তা করতে এতটুকু কার্পণ্য করিনি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আজিমউদ্দিনের প্রবন্ধ 'ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্য' এবং শ্রদ্ধাস্পদ গবেষক দরজি আবদুল ওয়াহাবের 'ময়মনসিংহের চরিতাভিধান' গবেষণা, আলোচনা কিংবা তথ্য সংগ্রহে সব সময়ই আমাদের সামনে রেখেছি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জিলা লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দেওয়ানা মদীনাসহ মৈমনসিংহ গীতিকার চারণভূমি এই বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল। এ কথা সুবিদিত যে পুঁথি সাহিত্যে ময়মনসিংহসহ সারা বাংলাদেশ পশ্চিম বাংলার তুলনায় পিছিয়ে ছিল। তবু এদেশে পুঁথি সাহিত্য যেটুকু চর্চা হয়েছে তার মধ্যে ময়মনসিংহ প্রশংসার দাবিদার। অবিভক্ত বাংলাদেশে সবচে জনপ্রিয় পুঁথি 'গাজী কালু চাম্পাবতী'র রচয়িতা তো এই ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ

মহকুমার। বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই পুঁথিটির জনপ্রিয়তা বিচারে উভয় বাংলার অন্য কোন পুঁথিই এর ধারেকাছেও যেতে পারেনি। নিম্নে বৃহত্তর ময়মনসিংহের জেলাভিত্তিক পুঁথিকার ও তাদের সাহিত্য সম্ভার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ময়মনসিংহ জিলা

বর্তমান ময়মনসিংহ জিলা (তৎকালীন ময়মনসিংহ সদর মহকুমা) পুঁথি সাহিত্যে তেমন উন্নত নয়। অনেক অনুসন্ধান করে আমরা ময়মনসিংহে মাত্র দুইজন পুঁথি সাহিত্যিককে খুঁজে পেয়েছি। এদের পুঁথি সাহিত্য কিশোরগঞ্জ, জামালপুর কিংবা নেত্রকোনার অপরাপর পুঁথি সাহিত্যিকদের তুলনায় একান্ত অপ্রতুল। এ দুজন পুঁথি সাহিত্যিক হলেন গফরগাঁও-এর আবদুল জব্বার মুন্সী ও সদরের মোহাম্মদ আকবর আলী। আবদুল জব্বার মুন্সীর রচিত পুঁথির নাম 'মদীনা' এবং আকবর আলীর পুঁথির নাম 'অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা'। মুন্সী আবদুল জব্বার গফরগাঁও থানাধীন পড়শীপাড়া গ্রামে ১১৫৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২০০ বঙ্গাব্দে তার 'মদীনা' পুঁথি রচনা করেন। তার এই পুঁথিতে তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্র তীর্থস্থান বা রাসূলে করিম (সাঃ)-এর রওজা মোবারক সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন কিংবা মদীনা নামীয় কোন রমণীর প্রণয়োপাখ্যান বর্ণনা করেছেন তা জানা যায়নি। পুঁথিটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। দু'একজন গবেষক মদীনা বানানটি হ্রস্য ই কার যোগে লিখেছেন এতে মনে হয় মদীনা পুঁথিটি কোন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা : 'অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা' পুঁথিটি একটি ছোট কলেবরের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান শ্রেণীর পুঁথি কাব্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ। ১৯৬৩ ইংরেজি সনে ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণে সংস্করণ সংখ্যা উল্লেখ নাই। মূল্য মাত্র ১/২৫ পয়সা। পুঁথির শায়ের মুন্সী আকবর আলী। তার পরিপূর্ণ পরিচয় পুঁথিকার নিজেই 'শায়েরের পরিচয়' শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। তবে এতে পুঁথির রচনাকাল বা প্রথম প্রকাশকাল সম্বন্ধে কোন হদিস নেই। এখানে শায়ের বলেন—

"মেরা ছোট যেইজন, নাম আবুল হোসেন, মকবিল আপিল ছোট তার/ ময়মনসিংহ জেলা বিচে, সদর মহকুমা আছে, থানা কোতয়ালি এলাকার। বিজয়নগর গ্রাম বিচে, একটু ঠিকানা আছে, অধীনের বসতি সেখানে। মোমীন সবার পায়, অধম কোরবান গায়, সালাম আলেক জনে জনে।" আবার এই পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় সরল গদ্যে পুঁথিকার স্বয়ং বর্ণনা করেন, "আমি এই 'অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা'র স্বত্ব (কপিরাইট) স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে হামিদিয়া লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী সাহেবগণকে উচিত মূল্যে সাফ বিক্রয় করিলাম। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশগণের কোন প্রকার দাবি-দাওয়া স্বত্ব রহিল না বা থাকিবে না। যদি দাবি-দাওয়া করি বা করে তবে তাহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবেক ইতি—

আকবর আলী।

সাং-বিজয়নগর, জিলা ময়মনসিংহ।

হামিদিয়া লাইব্রেরীর ম্যানেজারও লিখেছেন যা প্রকাশকের কথা শিরোনামে উল্লেখিত, "আমাদের অনুমতি ভিন্ন এই অতুলা সুন্দরীর কেতাব কেহ ছাপিবেন না। ছাপিলে বা ছাপাইলে আমাদের সম্পূর্ণ খেছারতের দাবি দিতে হইবে। ইতি—

ম্যানেজার—হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা।"

উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতাংশ থেকে বুঝা যায় যে পুঁথিকার আকবর আলী ময়মনসিংহ জিলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কোতোয়ালি থানার বিজয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারা কয়েক ভাই। পুঁথিকারের জন্ম আনুমানিক ১৮২০ সনে এবং তিনি আশি বছর বয়সে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পুঁথিটির প্রকাশ ১৮৯০ সনের কাছাকাছি সময় বলে ধরে নেওয়া যায়। তার রচিত একমাত্র 'অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা' নামক পুঁথিটি পাওয়া যায়। এটি একটি লোককাহিনীভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান শ্রেণীর পাঁচালি কাব্য। অতি সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপ : মেরছিপুর শহরের এক রাজা। যেমন শক্তিশালী তেমনই দয়ালু। বদান্যতায় ভুবন বিখ্যাত। রাজার ঘরে আলো জ্বালিয়ে এলো এক পুত্র, নাম নওয়াদর। একই দিনে রাজার উজির সাহেবের ঘরেও এক সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দুজন একই সাথে বড় হতে থাকে। নওয়াদর অপরূপ সুন্দর যুবক। যেই দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। নগরবাসী নারীগণ তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ,

"আহা মরি কিবা রূপ রূপে মন মজাইয়া যায়।
ভুবন মোহন রূপ এমন রূপ নাইগো ধরায় ॥"

পরিণত বয়সে অপরূপ সুন্দর নওয়াদরের সাথে ইস্পেহানের আদজ্রাহান শহরের অতুলা সুন্দরীর বিয়ে হয়। পরম সুখে কালাতিপাত করছিলেন তারা। অতুলা রূপবতী কন্যা;

"এক বেটী ঘরে তার সুরত মেহেরী।
বাছিয়া রাখিছে নাম অতুলা সুন্দরী।।
যত রূপবতী আল্লা ভেজিল সংসারে।
তার সাথে তুলনা নাহিক হয় কারে ॥"

অতিরিক্ত রূপই হলো অতুলা সুন্দরীর কাল। উজির তার রূপে মোহিত হয়। কিন্তু শাহজাদার স্ত্রী অতুলা। সে অতুলাকে পাবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজতে থাকে। খোঁজ পেয়েও যায়। সে সুকৌশলে অতুলা সুন্দরীর পিতার কাছ থেকে 'কাক চোর খেলা' শিখে নেয়। এই খেলায় মন্ত্র বলে কাউকে কাকে পরিণত করা যায়। উজিরের সাথে 'কাক চোর খেলায়' নওয়াদর হেরে যায়, সে কাকে পরিণত হয়। এই অবস্থায় উজির অতুলাকে ভালবাসা নিবেদন করে। অতুলা তাতে রাজি হয় না। তার মন নওয়াদরের প্রতি। অতুলার নানা তদবিরে শাহজাদা তার আসল সুরতে ফিরে আসে। পুঁথির মাঝখানে 'কাকের কেচ্ছা' শীর্ষক বয়ানে অযোধ্যার রাজা হরিশচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতিরও বর্ণনা আছে। নিজ গোসাইর দুরভিসন্ধির শিকারে রাজা হরিশচন্দ্র রাজ্য হারায়। তার জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা।

"রাজা ছিনু চাকর হৈনু ডোমের বাড়িতে।
দিনভর শুয়োর চড়াই ময়দানেতে ॥"

এই কাকের কেচ্ছার মধ্য দিয়েই অতুলার সম্বিৎ ফিরে আসে। কাকে রূপান্তরিত স্বামীর প্রতি তার সচেতনতা আসে এবং এইভাবে তার স্বামীর মুক্তি আসে। দীর্ঘ বিরহের পর পুনর্মিলন হয় তাদের। পুঁথিকারের ভাষায়—

"শাহজাদা শাহাজাদী তারা দুইজনা।
আল্লার দরগায় ভেজে হাজার শোকরানা।"

পুঁথিকার আকবর আলী ঘটনা বর্ণনায় দ্বিধাহীন। কোন রাখঢাক নেই তার মধ্যে। নিঃসংকোচে সকল কথা খুলে বলেছেন তিনি। নববিবাহিত নওয়াদর ও অতুলা সুন্দরীর বাসর ঘরের প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করতে নিয়ে তার অসংকোচ প্রকাশ—

"বিবিকে লইয়া কোলে, দুই হাতে কুচ মলে, মুখে বোছা দেয় বারবার
অবলা সরলা বালা, না জানে প্রেমের খেলা, লাজে আঁখি মুছে আপনার ॥"

অন্যত্র :—

"সারা নিশি এই মতে, দেল খুশী খোশালিতে, দুইজনে করে রতি খেলা।
যার যত আশা ছিল, দুইজনা পুরাইল নিভাইল মদনের জ্বালা ॥"

এই ধরনের সহজ সরল অবলীলা প্রকাশ অতি সহজ নয়। এমন বর্ণনা খুব সহজে মেলে না কিন্তু তাই বলে অশ্লীল নয় তা, কারণ সাহিত্যে সব ধরনের অশ্লীলতা বর্জনীয়।

কোথাও পুঁথিকার কবিত্ব শক্তিতে ভরপুর। একজন স্বভাব কবির মতোই প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি উদার হস্ত। কবিত্ব শক্তির কী সুন্দর প্রকাশ—

"সূর্যমুখী কৃষ্ণচূড়া আর টগর ফুল।
চেয়ে চেয়ে রব করি ডাকিছে বুলবুল ॥
ভ্রমর ভ্রমরী কত আমোদে মাতিয়া।
উড়ে আর পড়ে তারা ঝঙ্কার মারিয়া ॥" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পয়ার, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ও ধুয়া প্রভৃতি পুঁথির ছন্দে এই পুঁথিটি রচিত। বর্ণনায় ধারাবাহিকতা মনে রাখার মতো। উপমা চয়ন আনন্দদায়ক। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাগিনীর গান পুঁথিটিকে রসঘন করেছে। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো, ভালা, বুরা, কৈয়া, কয়, পিন্দায়, মৈল, প্রভৃতি ময়মনসিংহ সদরের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা। প্রয়োগ দৃষ্টিকটু হয়নি, মোটামুটিভাবে শক্তিশালী, প্রশংসনীয় ভাষায় এই পুঁথিটি রচিত হয়েছে। সর্বত্রই রয়েছে পুঁথিকারের অপরূপ ছান্দসিকতার কারসাজি যা পুঁথিটিকে সুখপাঠ্য করেছে। তবে ইতিপূর্বে উল্লেখিত 'শায়েরের পরিচয়' শীর্ষক বর্ণনায় কেন 'মোমিন সবারপায়, অধম কোরবান গায়, সালাম আলেক মনে জনে' পদটিতে 'কোরবান' নামটি ব্যবহার করা হয়েছে তা বোধগম্য হলো না। সম্ভবত পুঁথিকারের ডাকনাম 'কোরবান' হয়ে থাকবে। অথবা 'কোরবান' শব্দটি Dedieated-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে।

নেত্রকোনা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোনাও পুঁথি সাহিত্যে তেমন উন্নত নয়। সেখানে এ পর্যন্ত মাত্র চার/পাঁচজন পুঁথিকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এঁরা হচ্ছেন পূর্বধলার আমির উদ্দিন মুন্সী (১৮৭০-১৯৪৫), নেত্রকোনার শাহ জহিরউদ্দিন মুন্সী (১৮৫০-১৯১৯), কেন্দুয়ার আবদুল আলী মল্লিক (১৮৬৫-১৯৪৭) এবং নেত্রকোনা সদরের শাহ ফকির উদ্দিন (১৭৬০-১৮৩০)। এদের মধ্যে নেত্রকোনা সদরের শাহ ফকির উদ্দিন অষ্টাদশ শতকের পুঁথিকার। নেত্রকোনার পুঁথিকারদের মধ্যে হাজী মহাম্মদ মুজাফর হোসেন সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তার রচিত পুঁথির নাম 'ছহি ছফরে মক্কা ও মদীনা'। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৩০০ বঙ্গাব্দে কেন্দুয়ার কান্দিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৬০ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

হাসান কুলি খাঁ : 'হাসান কুলি খাঁ' পুঁথিটির রচয়িতা হচ্ছেন শাহ্ ফকির উদ্দিন। তিনি নেত্রকোনা সদরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরন করেন। 'হাসান কুলি খাঁ' তার একমাত্র পুঁথি। এটি একটি জঙ্গনামা শ্রেণীর পুঁথিকাব্য। অন্যান্য পুঁথির মতোই এটি পয়ার ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দে লেখা। পুঁথিটির রচনাকাল ১৮১০

থেকে ১৮২০ সনের বলে অনুমিত হয়। নেত্রকোনার সন্নিকট অভয়পাশা গ্রামের পশ্চিমে মাটিকাটা গ্রামের এক কাহিনী 'হাসান কুলি খাঁ' পুঁথির পটভূমি। সংক্ষেপে কাহিনীটি হচ্ছে: হাসান কুলি খাঁ নামের এক যুবক, তিনি মায়ের খুবই ভক্ত। মায়ের প্রতিটি কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন। একদিন হাসান কুলি খাঁকে তার মা মামার বাড়ি থেকে প্রাপ্য ওয়ারিশ আনতে হুকুম দেন। মা অন্তঃপ্রাণ হাসান কুলি খাঁ মাতৃ আদেশ পালনে কৃতসংকল্প হন। তিনি মামাদের কাছে গিয়ে মায়ের ওয়ারিশ দাবি করেন। মামারা তার কথায় রাগ পান। ওয়ারিশ তো দিলেনই না উপরন্তু নানা কটুবাক্যে তাকে জর্জরিত করেন। তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে আনুমানিক একুশ একর জমিতে মায়ের ওয়ারিশ ঠিক করে উক্ত জমির মাঝখানে নিজের কাস্তে পুঁতে রেখে চলে আসেন। 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না' জেনে তিনি শক্তি সঞ্চয় করার জন্য দিল্লির বাদশার দরবারে চাকরি নেন। বাদশার অনুগ্রহে তিনি অসংখ্য ফৌজ যোগার করতে সক্ষম হন। পরে বাদশার অনুমতি নিয়ে হাসান কুলি খাঁ ফৌজ নিয়ে বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বঙ্গদেশে এসে নেত্রকোনার নিকটবর্তী খালকি গ্রামে তিনি ছাউনি ফেলেন। ভয়ে মামারা বাড়ি ছেড়ে চলে যান। শত শত ফৌজ তখন সেই একুশ একর জমি জুড়ে মাটি কাটা শুরু করে। এক রাত্রিতেই খনন হয়ে যায় এক বিরাট পুকুর। সেই গ্রামের নাম হয় মাটিকাটা এবং সেই বৃহৎ পুকুরের নাম হয় হাসান কুলি খাঁর দীঘি। সেই দীঘি এখনও আছে এবং হাসান কুলি খাঁ'র মাহাত্ম বর্ণনা করছে। এই কাহিনীই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এই পুঁথিটিতে। বর্তমানে পুঁথিটি দুষ্প্রাপ্য। মানুষের বক্তব্য থেকেই এই পুঁথিটির অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। লোক পরম্পরায় চলে আসা কাহিনীরও মূল্য আছে, তাই এই পুঁথিটির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকৃত নয়। নেত্রকোনা অঞ্চলে 'হাসান কুলি খাঁর' কথা অহরহ শোনা যায়। পুঁথিটি দীর্ঘদিন আগে রচিত বলে বর্তমানে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বংশ নামা : 'বংশ নামা' পুঁথিটি রচনা করেছেন মুন্সী শাহ জহুর উদ্দিন। তিনি হজরত শাহ জালাল (রঃ)-এর সঙ্গী হজরত শাহ কামালের বংশধর। হজরত শাহ কামাল (রঃ)-এর বংশে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। বর্তমান নেত্রকোনা জিলার সদর থানার ব্রাহ্মণ মোহা গ্রামে পিতা শাহ কবিল উদ্দিনের ঘরে তার আগমন। শাহ কামাল (রঃ) শাহজালালের সাথে ৩৬০ আওলিয়ার সাথী হয়ে সিলেট আসেন। শাহ জালালের (রঃ) নির্দেশে তিনি বর্তমান সুনামগঞ্জের জগন্নাথ থানার তিলক গ্রামে আসেন ইসলাম প্রচারার্থে। সেখানে তিনি দীনি তাবলিগ করেন। তার নামানুসারে ঐ গ্রামটি এখনও শা পাড়া নামে সুপরিচিত। শাহ কামালের অধঃস্তন পুরুষ শাহ কবি উদ্দিন ইসলাম প্রচারের মানসে নেত্রকোনার ব্রাহ্মণ মোহা গ্রামে আসেন। তার পুত্র মুন্সী শাহ জুহুর উদ্দিন পিতৃ প্রদত্ত তাবলিগি কাজ চালিয়ে যান এবং ১৯১৯ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে পূর্বধলা থানার জারিয়া ঝাঞ্জাইলে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৬৯ বছর জীবিত ছিলেন। মারা যাওয়ার পর তার দাফন-কাফন সম্পূর্ণ হয় ব্রাহ্মণ মোহা গ্রামে। তার ভক্তবৃন্দ জারিয়া থেকে তার মৃতদেহ ব্রাহ্মন মোহায় বয়ে আনেন। 'বংশ নামা' পুঁথিটি ১৯১০ সনের দিকে রচিত বলে অনুমান করা যায়। তিনি এই পুঁথিতে নিজের বংশের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। হজরত শাহ কামালের পূর্বতন পুরুষ ও সেলসেলার বর্ণনায় তিনি হজরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহু তথা রাসূলে করিম (সাঃ) পর্যন্ত এবং অধঃস্তন পুরুষ নিজ অবধি বংশ পরিচয় এই পুঁথিটিতে বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে পুঁথিটি দুষ্প্রাপ্য। মুন্সী শাহ জহুর উদ্দিন অন্য কোন পুঁথি রচনা করেছেন বলে জানা যায় না।

বাহাদুর খাঁ : 'বাহাদুর খাঁ' পুঁথিটি হাজী আমির উদ্দিন মুন্সী বিরচিত তৎকালীন সমাজ-

চিত্র সংরক্ষণের একটি প্রয়াস। হাজী আমির উদ্দিন বর্তমান নেত্রকোনা জিলার পূর্বধলা থানার খলিসাপুর গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৪ বছর বয়সে তিনি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তার মধ্যে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ছিল। শোনা যায় তিনি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করার জন্য কবিয়ালদের মতো মুখে মুখে সরস কবিতা রচনা করে শ্রোতামণ্ডলীকে তাক লাগিয়ে দিতেন। এই জন্য তিনি কোন কোন জায়গায় কবিয়াল নামেও পরিচিত ছিলেন। তার বংশধরদের কেউ কেউ এখনও জীবিত কিন্তু তাদের কাছ থেকে তার পিতৃ পরিচয় কিংবা পুঁথিটির সন্ধান লাভ করা যায়নি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে এই পুঁথিটি রচিত হয় এবং প্রকাশ হয় তবে বর্তমানে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুঁথিটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী এরকম : চিমুরানী ও বাহাদুর খাঁ দুই ভাই-বোন। চিমুরানী বড় আর বাহাদুর খাঁ ছোট। চিমুরানী অসম্ভব ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। নিজে বিয়ে বসলে তার ছোট ভাইকে মানুষ 'শালা' ডাকবে এই ভেবে তিনি বিয়ে করেননি। বরণ করে নেন কুমারিত্বের জীবন। স্বামী তার আপন ভাইকে শালা ডাকবে এ যে তার কাছে অসহনীয় ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী। এই ঘটনা অবলম্বন করে 'বাহাদুর খাঁ' পুঁথির কলেবর। দীর্ঘদিন জীবিত থেকে চিমুরানীর মৃত্যু হয়। তার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী নেত্রকোনার অদূরে মদনপুরে শাহ সুলতান কমরউদ্দিন রুমী (রঃ)-র মাজারের কাছে তাকে সমাহিত করা হয়। তার কবরস্থান এখনও সেখানে আছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। এটি নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহের অতি পরিচিত কাহিনী। এখনও এই কেচ্ছার কথা লোকমুখে শোনা যায়। মদনপুরে শাহ সুলতানের মাজারে গেলেও তার সত্যতা মিলে। এই কিংবদন্তি বা ঘটনা অবলম্বনে বাহাদুর খাঁ পুঁথিটির মূল্যবোধ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। বিশেষত সমাজ-চিত্র সংরক্ষণে পুঁথিটির মূল্যবোধ অবিস্মরণীয়।

ছহিহ্ ছফরে মক্কা ও মদীনা : 'ছহিহ্ ছফরে মক্কা ও মদীনা' পুঁথির রচয়িতা হাজী মুহাম্মদ মোজাফর হুসেনের পৈত্রিক নিবাস বর্তমান নেত্রকোনা জিলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত কান্দিপাড়া গ্রাম। তার জন্ম সন ১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯৪ খ্রিঃ)। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে তিনি এই পুঁথিটি রচনা করেন এবং তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন প্রথম ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। ইংরেজি সন ১৯২৮। ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীতে গমন করেছিলেন। নিজ বাড়ি থেকে মক্কা মদীনা পর্যন্ত যাওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এতে বর্নিত হয়েছে। পুঁথির নামকরণের মধ্যেই 'ছহিহ ছফরে মক্কা ও মদীনা' পুঁথিটির বিষয়বস্তুর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূল পুঁথি আরম্ভ করার পূর্বেই শায়েরের নিবেদন এখানে উপস্থিত করা হলো—

ছহি ছফরে মক্কা ও মদীনা
শায়ের হাজী মহাম্মদ মোজাফর হুসেন
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত এবং সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
রচনাকাল : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ প্রথম সংস্করণ ১৩৩৫। মূল্য ১/-
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত
হরি প্রেস, ভালুকা, পোঃ গৌরীপুর
জেলা : ময়মনসিংহ।

"মুসলমান ভাইদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আমি মক্কা মদীনা বহিয়া হজ গোজারিয়া যে যে স্থান জিয়ারত করিতে হয় তাহা করিয়া ছহি ছালামতে নিজালয়ে আসিয়া এই কিতাব রচনা করিয়াছি। আপন আপন দেশ হইতে কিরূপে হজস্থানে যাইতে হয় ও যাইয়া যে যে স্থানে জিয়ারত করিতে হয় তাহা তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এই কিতাব হজযাত্রীদের

বিশেষ আবশ্যক। মুসলমান ভাইদের মধ্যে যাহারা অর্থাভাবে বা অন্য কোনো কারণে হজস্থানে যাইতে অক্ষম তাঁহারা এ কিতাব পাঠে মক্কা মদীনার সারা হাল বুঝিতে পারিবেন।

বিনীত নিবেদক
হাজী মহাম্মদ মুজাফর হুসেন
সাং-কান্দিপাড়া, পোঃ-কেন্দুয়া
জিঃ-ময়মনসিংহ।

বক্ষমাণ পুঁথির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুঁথিকারের উপরোক্ত বর্ণনার পরে সম্ভবত অধিক বলার প্রয়োজন পড়ে না। পুঁথিটিতে একশত বত্রিশ পৃষ্ঠা রয়েছে। কলস আটী গ্রামের চান্দের বাপ পুঁথিটি প্রকাশে পুঁথিকারকে যে বিড়ম্বনা দেন তা সহ গাভী শিমূলের অতিথি পরায়ণ আবদুর রহমান মুন্সীর প্রশংসা কীর্তনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানেন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় কাব্যটি প্রকাশের ইতিকথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই পুঁথিরই একশত চব্বিশ পৃষ্ঠায় শায়েরের নিজ জবানিতে। 'এই কিতাব দেখিয়া যে যে আলেমগণে ছহি বলিয়া নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার বয়ান' নামক শেষ অধ্যায়ে মোট তেইশজন স্বাক্ষরদাতার নাম, স্বাক্ষর ও সংক্ষেপে পরিচয় দেয়া হয়েছে। এই কাব্যের সত্যতা ও উৎকর্ষ বিচারে যে তেইশজন মুন্সী মাওলানা স্বাক্ষর করেছেন তারা সবাই সে সময়ের দেশখ্যাত আলেমউলামা। এইভাবে পুঁথিটির সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়েছেন পুঁথিকার।

পুঁথিকার নিজেও ছিলেন একজন উত্তম পুঁথি পাঠক। তার প্রমাণ তিনি নিজেই পুঁথিতে দিয়েছেন এইভাবে—

সে ঘরেতে আমি গিয়া চৌকির উপর।
বসিয়া করিনু শুরু এ কিতাব মোর ॥
উত্তর বাড়িতে যত লোক বসা ছিল।
আওয়াজ শুনিয়া সব আসিয়া পৌছিল ॥
মনযোগ দিয়া সবে শুনিল কথন।
আমি দীনহীন অতি সরস বচন ॥

হাজী মহাম্মদ মোজাফর হোসেন বাড়ি থেকে শুরু করে মক্কা-মদীনা যাওয়ার সকল ব্যবস্থাপনা এই পুঁথিটিতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিঃসর্গের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে এতে। এদেশে নতুন আমদানিকৃত রেলগাড়ির হুইসেল শুনে তিনি তার বর্ণনা দিতে কসুর করেননি। নতুন রেল ইঞ্জিনের হুইসেল যেন কোকিলের গান, কৃষ্ণের বাঁশির মতো—

হুইসেল দেয় এছা শুনিতে অবাক।
কৃষ্ণের বাঁশীর মত কোকিলের ডাক ॥

ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত কাব্য এই 'ছহিহ ছফরে মক্কা ও মদীনা'। সংক্ষেপে হজব্রত পালনের সামগ্রিক পরিচয় পুঁথিকার তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এই পুঁথিকাব্যটিতে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে সমস্ত কাব্যখানা। তবে এক জায়গায় মাত্র 'স্থির বয়ান রাগিনী ছক্কাছয় পদে মিল' নামক এক প্রকার নতুন ছন্দের ব্যবহার আছে। হ্রস্য ত্রিপদী, চৌপদী ধুয়া প্রভৃতি ছন্দ এখানে একবারও ব্যবহৃত হয়নি। দোভাষী রীতির অনুসরণ থাকলেও মিশ্র ভাষার দুর্বলতা লক্ষণীয় তবে তা একেবারে দৃষ্টিকটু নয়। ময়মনসিংহের আঞ্চলিক শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে পুঁথিটিতে। গোছুল, বুঝাইবেন, লওনা, গিলাফ, পাড়াপাড়ি, ফরক

ইত্যাদি বহু আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে এ কাব্যে। ভাষাগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পুঁথিটিকে কমবেশি বৈশিষ্ট্যায়িত করেছে। সমগ্র পুঁথিটি কাঁচা হাতের স্বাক্ষর বহন করলেও ময়মনসিংহের সহজ-সরল প্রাসঙ্গিক ভাষায় পুঁথিকার বক্তব্য পেশ করেছেন। ভাষার সারল্যে বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে একটুও সন্দেহ নাই। হজব্রত, মক্কা-মদিনা সফর, আনুষ্ঠানিক কর্মাদি, এ সম্বন্ধে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান বিতরণে পুঁথিটি মুসলিম সমাজের সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে, এমন ধারণা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এক কথায় এই পুঁথিটি হজব্রত পালনকারীদের বিশেষ সহায়তা দিবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

দুনা শাহার পুঁথি : সাহিত্য যে পরিবর্তিত ধারায় যুগ-মানস-নির্ভর মহৎ সৃষ্টি তারই পরিচয় প্রকাশ ঘটেছে 'দুনা শাহার পুঁথিতে'। বিষয়-বৈচিত্র্য ও কাহিনীর দিক থেকে এ পুঁথিটির একটি অভিনবত্ব আছে। মধ্যযুগের পীর-ফকিরদের অলৌকিক কারামতির প্রতি প্রাকৃতজনের অন্ধ বিশ্বাসের প্রবণতা পুঁথিতে বিদ্যমান থাকলেও এ সকল ভণ্ডপীরদের ভণ্ডামির প্রেক্ষিতে প্রতিবাদের সুরও উচ্চারিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী পুঁথি। অন্ধত্বে নয়, পরীক্ষিত সত্যে বিশ্বাস আরোপণ এখনকার মানব ধর্ম এবং এই ধ্রুব সত্যটির প্রতিফলন ঘটেছে এ দুনা শাহার পুঁথিতে। সর্ববিচারে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আধুনিক ধারায় রচিত এই পুঁথি আপন মহীমায় সমুজ্জ্বল। এই পুঁথির রচয়িতা হলেন আবদুল আলী মল্লিক। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দুয়া থানার পালরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র এক মাস আগে মৃত্যুবরন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তার দান আছে বলে সবাই উল্লেখ করেছেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৫ দিন আগে ১৯৪৭ সালের ৯ই জুলাই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার রচিত পুঁথি বৃহত্তর ময়মনসিংহের পুঁথি সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জ্বল ব্যতিক্রম। পুঁথিটির কাহিনী হলো সংক্ষেপে এই : কেন্দুয়ার নিকটবর্তী ফতেহপুর দেওয়ান বাড়ির জমিদার ছিলেন দোলা মিঞা। তিনি প্রজাবৎসল হলেও খুবই লোভী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার কোষাগারের মালিক ছিল তারই গৃহ শিক্ষক আবদুল আলী মল্লিক। সে জমিদারের মতো লোভী প্রকৃতির ছিল না। এদিকে দেওয়ান বাড়িতে শাহ নামক একজন পীর সাহেব আস্তানা গাড়েন। আস্তানা গেড়ে তিনি ঘোষণা করেন যে তার কাছে কেউ টাকা গচ্ছিত রাখলে এক সপ্তাহে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং সেই টাকা অবশ্যই জমাদারকে ফেরত দেওয়া হবে। তার কাছে পরশ পাথর আছে। সেই পরশ পাথরের কারামতির বদৌলতে এক সপ্তাহে এইভাবে জমাকৃত টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যেই কথা সেই কাজ; শাহ ফকিরের নিকট টাকা জমা রাখার যে কি হিড়িক! সপ্তাহ খানেক অনেকেই দ্বিগুণ হারে টাকা ফেরত পেয়ে ফকিরের কারামতিতে আস্থা স্থাপন করেন। জমিদার দোলা মিঞা লোভের বশবর্তী হয়ে ফকিরকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং টাকার হিসাব রাখার দায়িত্ব দেয়া হয় সেই আবদুল আলী মল্লিকের ওপর। এই ঘটনায় গ্রামবাসী লোকেদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় তারা ফকিরের ফকিরিত্বের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গোপনে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ভণ্ডপীর ফকির স্বভাবতই খুব চালাক চতুর হয়। অবস্থা টের পেয়ে ভণ্ডফকির জনগণের জমাকৃত হাজার হাজার টাকা নিয়ে একদিন গোপনে সটকে পড়ে। পীরের টাকা নিয়ে এই পলায়নকে কর্তাব্যক্তি দোলা মিঞার কারসাজি মনে করে গ্রামবাসীরা দোলা মিঞার ওপরই প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করে। অবস্থা বেগতিক। এদিকে ভণ্ড ফকিরের ঠিকানাও দোলা মিঞার জানা নেই। দোলা মিঞা পড়েন মহাবিপদে। দোলা

মিঞার স্ত্রী ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও গুণবতী। তিনি পতিগতপ্রানা ছিলেন। স্বামীর এই সমূহ বিপদে তিনি স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। উদ্ধার পায় তার স্বামী। এই ঘটনার কিছুদিন পর আবদুল আলী মল্লিক স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনুরোধে একে পুঁথির আকারে রূপ দেন। পুস্তকাকারে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সনে। পুঁথিটি অতি অল্প সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৫/১৬ সনের দিকে আবদুল আলী মল্লিকের বাড়িতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সমস্ত মালামালের সাথে পুঁথিটির সমস্ত কপিও আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। উক্ত পুঁথির দু'একটি কপি নাকি এখনও দু'একজনের কাছে আছে তবে তা উদ্ধার করা যায়নি। পুঁথিকারের সুযোগ্য সন্তান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলাউদ্দীন মল্লিকের সৌজন্যে এই পুঁথিটির সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটন সম্ভব হয়েছে। পুঁথিটিতে শুধুমাত্র ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য কোন ছন্দ এতে আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। পুঁথিটির সাইজ মাঝারি আকারের। প্রচ্ছদ স্বয়ং পুঁথিকার নিজ হস্তে অংকন করেছেন। পুঁথিটি জীবনঘন ও বৈষয়িক আবেদনযুক্ত।

নেত্রকোনা জেলা পুঁথি সাহিত্যে সম্পৃক্ত নয় এবং এটি পুঁথি অধ্যুষিত এলাকাও নয়। অনেকের বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে এ কথা সুবিদিত। পুঁথি সাহিত্য গবেষক জনাব আজিমউদ্দিনের এক পত্রের উত্তরে নেত্রকোনার সুসাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী জানান, "আপনি যে বিষয়ের ওপর গবেষণার ভার নিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। তাই ভাবলাম যে আপনাকে এ বিষয়ে বাস্তবিকই সাহায্য করা যায় কিনা।...আমি নেত্রকোনা মহকুমা সম্বন্ধে তাই সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য চিন্তা করি।...সময় করে দেরিতে হলেও কয়েকটি জায়গায় গিয়েছি।...কোথাও একটি পুঁথিরও সন্ধান পেলাম না। নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে সবখান থেকেই। তাই এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে না পেরে লজ্জিত এবং দুঃখিত। আপনার প্রচেষ্টা ও সাধনা সার্থক হোক এ কামনা করেই মাফ চাইছি।"

শেরপুর

বর্তমান শেরপুর জিলায় মাত্র দুইজন পুঁথিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হলেন বসির উদ্দিন মুন্সী ও রমজান আলী মুন্সী। বসিরউদ্দিন মুন্সীর পুঁথির নাম 'শাহাদত নামা' ও 'শের আলী খান ও পদ্মিনী কন্যার পুঁথি' এবং রমজান আলী মুন্সীর পুঁথির নাম 'ছহিহ তাহইয়াতুচ্ছালাত'।

শাহাদত নামা : 'শাহাদত নামা' পুঁথির রচয়িতা মুন্সী বসিরউদ্দিন। তিনি বর্তমান শেরপুর জিলার শেরপুর থানাধীন পীরগঞ্জ অথবা করিমগঞ্জ গ্রামে ১৮৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ষাট বছর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। 'শাহাদত নামা' পুঁথিটি তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রচনা করেন। পুস্তকাকারে এই পুঁথিটি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি ধর্মীয় ইতিহাস ঘেঁষা কাহিনী। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌহিত্র এবং হজরত আলী (রাঃ) ও খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর পুত্র হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর সপরিবারে এজিদের সৈন্যের হাতে দাস্তে কারবালায় শাহাদত বরণের কাহিনী এতে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী এই পুঁথির পেক্ষাপট।

শেরআলী খান ও পদ্মিনী কন্যার পুঁথি : 'শের আলী খান ও পদ্মিনী কন্যার পুঁথি'টি ফারসি ভাষায় রচিত বলে জানা যায়। পূর্বোক্ত বসিরউদ্দিন মুন্সী এই পুঁথিটিরও রচয়িতা।

প্রকাশকাল ১৯০৮ বলে অনুমিত হয়। শেরপুরের শের আলী খানের জমিদারি প্রাপ্তি ও তার নামানুসারে শেরপুরের নাম শেরপুর হওয়ার কাহিনী এতে বিধৃত হয়েছে। শেরআলী খানের সাথে পাশ্ববর্তী দর্শা গ্রামে নন্দী বংশীয় কন্যা পদ্মগন্ধা ওরফে পদ্মিনীর সাথে প্রণয় কাহিনীও এতে বিবৃত হয়েছে। নন্দী বংশের লোকদের শেরপুরে জমিদারি প্রাপ্তির গল্প অবলম্বনে তিনি সুললিত ফারসি ভাষায় এই পুঁথি কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

. **তাহ্ইয়াতুচ্ছালাত** : 'তাহ্ইয়াতুচ্ছালাত' পুঁথিটি রচনা করেন মুন্সী রমজান আলী। তিনি শেরপুর জিলার নালিতাবাড়ি থানার পাইকুড়া গ্রামে ১৮৪৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ সনের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত 'তাহ্ইয়াতুচ্ছালাত' একটি সুবৃহৎ পুঁথি। ১৮৮৫ সনের দিকে তিনি পুঁথিটি রচনা করেছিলেন এবং দু' একবছর পরই তা প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার নামাজ সম্পর্কে এতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ বাদ দিয়েও এতে ঈদের নামাজ, জানাজার নামাজ, বেতরের নামাজ, এশরাক ও চাস্তের নামাজ এবং অন্যান্য নফল নামাজ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেয়া হয়েছে। রমজান আলী মুন্সী জামালপুরের আমলাপাড়াস্থ ফজলুর রহমান আজনবীর পিতামহ।

টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জিলায় এ পর্যন্ত মোট তিনটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি তিনটি হলো 'সোনা বান ও হানিফা', 'শরা শরিয়ত' এবং 'ইমাম সাগরের পুঁথি'। 'ইমাম সাগরের পুঁথি'র রচয়িতা হচ্ছেন শ্রী বরকত সরকার এবং প্রথম দুটি পুঁথির রচয়িতা আবদুস সোবহান মুন্সী।

ইমাম সাগরের পুঁথি : 'ইমাম সাগরের পুঁথি' একটি কলমী পুঁথি। রচয়িতা হলেন শ্রী বরকত সরকার। শ্রী বরকত সরকার বাংলা ১১৩৯ অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৩২ খৃস্টাব্দে বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার পুঁথিতে সংশ্লিষ্ট কাগজে ১১৯৯ বঙ্গাব্দে একটি মসজিদের কাজ আরম্ভ করেন তখন তার বয়স ৬০ বছর উল্লেখ আছে। সেই থেকেই তার জন্মকাল নির্ণয় করা গেল। তিনি ১২১৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮১০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরন করেন। 'ইমাম সাগরে'র পুঁথিটি সেই সময়কারই রচনা অর্থাৎ ১১৯৯-১২০০ বঙ্গাব্দের। যে মসজিদ নির্মাণ করার দায়িত্ব তার ওপর পড়েছিল তিনি সেই মসজিদে বসেই কথিত পুঁথিটি রচনা করেন। তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন কেননা তখনকার দিনে কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই নামের পরে 'সরকার' উপাধি লিখতে পারতেন। অশিক্ষিত লোকেরা এই উপাধি কখনও লিখতে পারতেন না। হিসেব অনুযায়ী তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিকে মৃত্যুবরন করেন। সেই হিসাবেই তার মৃত্যুর সন ১৮১০ বলে উল্লেখ করা হলো। তিনি বাংলা সাহিত্যের শেষ ক্রান্তিকালে যখন মধ্যযুগীয় কাব্য ধারার শেষ অধ্যায়, তখন জীবিত ছিলেন। তাই তার পুঁথিটিতে দোভাষী রীতির প্রভাব পড়েছে এবং ভাষায় অনেকটা মধ্যযুগীয় টান লক্ষ্য করা যায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এরূপ ঘটেছে বলে মনে হয়। পুঁথিটির ভাষা বড়ই দুর্বল। মাঝে মাঝেই ছন্দপতন্ লক্ষ্য করা যায়। তবে আরবি, ফারসি নিয়মেই এটি লিখিত। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে এ পুঁথিটিকে পাঠযোগ্য বলে মনে হয়। এ ছাড়া এককালের ইসলামী মানস ও পুঁথিটি সংস্করণের দাবি রাখে। তার ভাতিজা মোঃ আবুল হুসেন সরকারের কাছে পুঁথিটি সংরক্ষিত আছে।

ইমাম সাগরের পুঁথিটি তুলট কাগজে লিখা। পরিমাপ ৯ ১/২´´ × ৫ ১/২´´ হস্তাক্ষর ভারি সুন্দর। পুঁথি ও খণ্ডিত কাগজের হস্তাক্ষর নিঃসন্দেহে একই হাতের, একই ব্যক্তির।

খণ্ডিত কাগজে লিখা পুঁথিকারের নাম ও সন অভ্রান্ত। প্রথম আট পৃষ্ঠা ও শেষ দিকের কিছু পাতা নেই। পুঁথিটি বৃহৎ আকারের, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২। তবে ৪৩২ পৃষ্ঠার পরেও আরও কিছু পৃষ্ঠা এতে থাকতে পারে। পুঁথিতে মাঝে মাঝে 'ইমাম সাগরের পুঁথি' নামটি লিখা আছে আবার কোথাও কোথাও শুধু 'এমাম সাগর' লিখা রয়েছে। মোটামুটিভাবে পুঁথিটিকে একটি সুবৃহৎ পুঁথি বলা যায়। কলেবর তাই প্রমাণ করে।

ইমাম সাগরের পুঁথিটি দোভাষী নিয়মে লিখিত। সমগ্র কাব্য গ্রন্থটি শুধুমাত্র পয়ার ছন্দে লিখা। ত্রিপদী, চৌপদী একেবারেই নেই। পুঁথিটিতে আরবি, ফারসি ভাষার চমৎকার ব্যবহার রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে পুঁথিকার আরবি, ফারসি বিশেষত আরবি ভাষায় প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। তার এই পুঁথি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন উল্লেখ করেন, 'আমার হস্তগত তাঁর নিজ হাতের লেখা কোরআন শরীফ (কয়েক পারা মাত্র) সেই চিন্তার প্রমাণ। আরবি হাতের লিখা অবিশ্বাস্য সুন্দর যা প্রকাশিত গ্রন্থকেও হার মানায়।' পুঁথিটির পাঠ উদ্ধারে লিপিগত বাধা আছে। মধ্যযুগীয় ভাষাশৈলী ব্যবহার হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। অনেক চেষ্টা করেই তবে এর পাঠ উদ্ধার সম্ভব। এটি খাঁটি ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত রচনা। ইসলামের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এর ভাবধারা পরিবেশিত। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নবী, পয়গম্বর, রাসূল, ইমাম সম্পর্কিত আলোচনাই এ পুঁথিটির প্রাণ। ইসলামের অন্যান্য করণীয় কর্ম যেমন নামাজ, রোজা, ইমান, হজ, যাকাত, রোজ হাসর, সৃষ্টি রহস্য, ইসলামী জীবন ও জিন্দেগির পরিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে এতে। হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসমাইলের কোরবানি সংক্রান্ত ঘটনা, হজরত আইউব নবীর কুষ্ঠ রোগের কেচ্ছা প্রভৃতির বর্ণনাও রয়েছে পুঁথিটির অনেকাংশ জুড়ে। নিম্নে বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করলাম এবং এর সাথে সাথে উদ্ধৃতাংশের পাঠও উদ্ধার করে সরল বাংলায় তুলে ধরা হলো:

সসর্গ মঞ্চ পাতাল আছে জতেক ফেরেস্তা।
আল্লা বিনে কেহ তার নাহি জানে সর্খা ॥
সরলোক প্রিথিবিত জতেক শ্রিজিছে।
তাহার দশগুণ পবি শ্রিজন কবিছে ॥
পবি হতে দশগুণ জিরজন্তু গণ।
জলে স্তলে জত জন্তু কবিছে শ্রিজনু ॥'

এই লাইন কয়টির পাঠ উদ্ধার করলে যা দাঁড়ায় তা হলো :

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আছে যতেক ফেরেস্তা।
আল্লা বিনে কেহ তার নাহি জানে সংখ্যা ॥
সবলোক পৃথিবীতে যতেক সৃজিছে।
তাহার দশগুণ পরী সৃজন করিছে ॥
পরী হতে দশগুণ জীবজন্তু গণ
জলে স্থলে যত জন্তু করিছে সৃজন ॥

উপরোক্ত অংশে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যত্র হজরত ইসমাইল সম্পর্কে বলতে গিয়ে,

আল্লার যেবা নরি কবিছে জর্তনে।
মন দিয়া সোন সর কহি রিরবন ॥

একদিন পুবি হৈতে নরি নিকলিন।
ইছমাইল পুত্র তান সঙ্গোত আছিল ॥
রাপেব আঙ্গুলি ধবি সঙ্গেতে লাগিয়া।
আসিলেন ইছমাইল নরি হাটিয়া হাটিয়া ॥

পাঠোদ্ধার করার পর দাঁড়ায়—

আল্লার সেবা নবী করিছে যতনে।
মন দিয়া শোন সব কহি বিবরণে ॥
একদিন পুরি হইতে নবী নিকলিল।
ইছমাইল পুত্র তার সঙ্গেতে আছিল ॥
বাপের আংগুল ধরি সঙ্গেতে লাগিয়া।
আসিলেন ইছমাইল নবী হাঁটিয়া হাঁটিয়া ॥

আল্লাহ্‌র খেদমত কেমন করে করতে হয় তার সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন পুঁথিকার। তার প্রমানস্বরূপ নিম্নে আমরা দুইটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

কাযমনে আল্লাব সেরা যেজনে কবির।
সর্রলোক যেজন হৈতে সন্তুষ্ট পাইর ॥

সরল বাংলায় যা দাঁড়ায়—

কায়মনে আল্লার সেবা যেজনে করিবে।
সর্বলোক সেজন হইতে সন্তুষ্ট পাইবে ॥

পবিত্র ইমান সম্পর্কে পুঁথিকার বলেন :

সপ্তম ইমান আন আল্লাব ফরমান হইতে।
নিশ্বয তুলিরেন আল্লা করব হইতে ॥
চিবংকাল গোবেতে রসতি হইর।
ক্যামতেব দিন আল্লা অরষ্য তুলির ॥
নেকিরদি রান্ধা তুলিরেন গোব হইতে।
এহিরূপে কাযারম্ভ দির সে দিনেতে ॥

পাঠ উদ্ধার করার পর বাক্য কয়টি এরকম দাঁড়াবে—

সপ্তম ইমান আন আল্লার ফরমান হইতে।
নিশ্চয় তুলিবেন আল্লা কবর হইতে ॥
চিরকাল গোরেতে বসতি হইবে।
কিয়ামতের দিন আল্লা অবশ্য তুলিবে ॥
নেকি বদি বান্ধা তুলিবেন গোর হইতে
এইরূপে কার্যারম্ভ দিব সে দিনেতে ॥

এই পুঁথির বিভিন্ন উদ্ধৃতাংশের পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে পুঁথিকার এখানে 'ব' এর নিচে ফোঁটা দিয়েছেন এবং 'র' এর নিচে কোন ফোঁটা দেননি। তৎকালে এরূপ প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

সোনাবান ও হানিফা : 'সোনাবান ও হানিফা' কিংবা 'সোনাবানের সাথে হানিফার লড়াই' একটি জঙ্গনামা শ্রেণীর পাঁচালি কাব্য। এ কাব্যের রচয়িতা হলেন

আবদুস সোবহান মুন্সী। পুঁথিকার আবদুস সোবহান মুন্সী বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার বল্লা বাজারে ১৮০০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি প্রায় ১০০ বছর জীবিত থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরন করেন। তার দীর্ঘ জীবনে তিনি দুইটি পুঁথি লিখেছেন বলে জানা যায়। একটি হলো 'সোনাবান ও হানিফা' এবং অপরটি হলো 'শরাশরিয়ত'। পুঁথি দুইটির রচনাকাল ১৮৬০ ইংরেজি সন থেকে ১৮৯০ ইংরেজি সন বলে মনে হয়।

সোনাবান ও হানিফা পুঁথির কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ : প্রথমে পুঁথিটি শুরু হয় এভাবে :—

আল্লা আল্লা বল ভাই নবী কর সার।
নবীর কলিমা পড় হইয়া যাবে পাড় ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই যত মুমীন গণ।
মোহাম্মদ হানিফার কিছু শোন দিয়া মন ॥
বার জঙ্গ করে মর্দ্দ কিতাবে খবর।
তের জঙ্গা লিখা যায় টঙ্গীর শহর ॥
সোনাবান নামে বিবি বাদশা সে শহরে।
কুউতের হর্দ আল্লা দিয়াছে তাহারে ॥

টঙ্গীর শহরের বাদশা এক রমণী। নাম সোনাবান। যেমন রূপবতী তেমনি শক্তিধর। একদিন সোনাবান তার শক্তির বড়াই করতে গিয়ে উজিরকে বলেন—

এক রোজ সোনাবান বলেন উজীরে।
এয়ছা কে হইয়াছে জোর পাছাড়ে আমারে ॥

তখন উজীর বলেন—

উজীর বলেন ওগো শোন সে খবর।
মোহাম্মদ হানিফা আছে মদিনা শহর ॥
হজরত আলীর বেটা রাসুলের নাতী।
আপনা কুউতে মর্দ্দ ফেরে ঢালে হাতী ॥
তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই।
মনে নয় দেখ গিয়া না করি বড়াই ॥

উজীরের কথায় কন্যার রাগ হয়—

সোনাবান বলে আমি যাব মদিনায়।
হানিফা কেমন মর্দ্দ দেখিব তাহায় ॥
মদিনার লোক আমি বান্দিয়া আনিব।
তবে তো আপন দেশে মুখ দেখাইব ॥
একেলা যাইয়া যদি এ কামনা করি।
সোনাবান নাম তবে বৃথা আমি ধরি ॥

সোনাবান নিজের শক্তিতে বড়াই করে না। সে বড়াই করে তার ঠাকুর দেবতার জোরে।

সোনাবান বলে ওগো উজীর আমার।
আমি যে করিগো বড়াই মোর দেবতার ॥
ঠাকুরের জোরে আমি করি এত জোর।
নহেতো করিগো লড়াই সাধ্য কিবা মোর ॥

সোনাবানের এহেন প্রগলবতায় আরশে আল্লা পাক বেজার হন। বেটি খায় দায় আমার আর বড়াই করে দেবতার—

এ কথা শুনিয়া আল্লা হইল বেজার।
কার খায় কার গায় বড় অবিচার।

সেই রাতে আল্লা তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মনস্থ করেন। হানিফাকে পাঠানো হবে এই কন্যার সাথে লড়াইয়ে। আল্লাহ্ হানিফাকে স্বপ্নে দেখালেন—

হানিফা স্বপন দেখে পালঙে শুইয়া।
টঙ্গীর শহরে যাও সেতাবী করিয়া ॥
সোনাবান নামে বিবি বাদশা সে শহরে।
জোরেতে ধরিয়া তুমি সাদী কর তারে ॥
স্বপন দেখিয়া তুমি থাক যদি ঘরে।
বেজার হইবে আল্লা তোমার উপরে ॥

যাক। যথারীতি রাত্রি পোহাল। হানিফা বিদায় নিয়ে টঙ্গীর শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু তিনি যাবেন কেমন করে? টঙ্গীর শহর কোন দিকে কতদূর তা তো তিনি জানেন না। আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করলেন। তার ইশারায় বৃদ্ধ খোয়াজ খিজির তার রাহাবর হলেন। কিন্তু রওয়ানা দিবার সময় তিনি আল্লার নাম নিতে ভুলে গেলেন। আল্লা এ জন্য তাকে উপযুক্ত সাজা দিবেন ঠিক করলেন। অবশেষে কয়েকদিন পর তারা টঙ্গীর শহরে এসে হাজির হলেন। খিজির (আঃ) বিদায় নিলেন। যুদ্ধ শুরু হলো সোনাবানের সাথে হানিফার। সে কি যুদ্ধ! 'কেহ নাহি হারে জিতে সমানে সমান'। হানিফা বাড়ি থেকে রওয়ানার সময় আল্লার নাম মুখে নেয়নি। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। এ সময় হানিফার অপর এক স্ত্রী তাহাকে সাহায্য করলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হলো। আল্লার দয়ায় যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে সোনাবানের 'বুকের বসন তার খুলিয়া পড়িল'। এই সুযোগে হানিফা তার চুলের মুঠিতে ধরে ফেললেন। যুদ্ধে সোনাবানের হার। এইভাবে আল্লাহ তার ওয়াদা রক্ষা করলেন। মহা ধুমধামের সাথে সোনাবান ও হানিফার বিয়ে হলো। এই হলো টাঙ্গাইলের আবদুস সোবহান মুন্সী বিরচিত 'সোনাবান ও হানিফা'-র পুঁথির সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আবদুস সোবহান মুন্সী এই পুঁথিটিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পুঁথিটিতে হিন্দু দেব-দেবীর ওপর মুসলমানদের বিজয়ের গৌরবগাথা বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগ ও তার শেষ ক্রান্তি লগ্নে হিন্দু-মুসলমানদের রচিত কাব্যে এ ধর্মীয় ধারাটি প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপর ধর্মের দুর্বলতা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তৎকালীন সামাজিক বিচারে এটি তেমন দূষণীয় ছিল না।

উল্লেখ্য যে কিশোরগঞ্জের মুন্সী আবদুর রহিমও 'সোনাবান' নামে একই কাহিনীর একটি পুঁথি লিখেছেন।

শরা শরিয়ত : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'শরা শরিয়ত' পুঁথিটি আবদুস সোবহান মুন্সীর ১৮৬০ সনের দিকের রচনা। এ পুঁথিতে পুঁথিকার ইসলাম ধর্মে তাহজিব তামদ্দুন, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। পুঁথিটি বর্তমানে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। সে কারনে পুঁথিটি সম্পর্কে পাঠককুলকে সম্যক ধারণা দেয়া সম্ভব হলো না।

জামালপুর

জামালপুর জিলা পুঁথি সাহিত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ জেলায় যেমন অনেক পুঁথিকার জন্মগ্রহণ করেছেন তেমনই অনেক পুঁথিকাব্যেরও জন্ম হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন পুঁথিকার সারা দেশব্যাপী পরিচিত। তারা হলেন (১) মৌলভী সৈয়দ আবদুর রহমান (১৭৭০-১৮৩০) পুঁথির নাম উমদাতুল মোছায়েল (১৩১৩ বঃ) এনায়েত রহমান (১৩১৫ বঃ), (২) সৈয়দ তজাম্মল হোসেন (১৮৬০-১৯৪০) পুঁথির নাম দেলমোহিত, (৩) মুন্সী মোহাম্মদ তাহের উদ্দিন (১৮৫০-১৯৩৫) পুঁথির নাম আফতাবে হেদায়েত (৪) শাহ হামিদ আলী ফকির (১৮৪০-১৯৩০) পুঁথির নাম 'রোজহাসর ও রাখাল রাজার বিচার', (৫) হাজী মীর্জা মোঃ জাফর আলী (১৯০০-১৯৫০) তার পুঁথির নাম 'বোরহানে হক ও কৃষক সহায়' এবং (৬) মোক্তার ফজলুর রহমান আজনবী (বিংশ শতাব্দি)।

জামালপুর পুঁথিসাহিত্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যতম অঞ্চল হলেও জামালপুরের পুঁথি সাহিত্য ইদানীং দুষ্প্রাপ্য বলে তার সবিশেষ বর্ণনা দেয়া সম্ভব হলো না।

দেলমোহিত : 'দেলমোহিত পুঁথিটিতে হানাফী জামাআতের প্রশংসা ও মোহাম্মদী জামাআতের নিন্দাবাদ বর্নিত হয়েছে। পুঁথিকার মোহাম্মদী জামাআতের ওপর হানাফী জামাআতের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন। এই পুঁথিটির রচয়িতা হলেন সৈয়দ তজাম্মল হোসেন। তিনি ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫/৪০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দেলমোহিত পুঁথিটি ১৯২৫-১৯৩৫ সনের দিকের কোন এক সময়ে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এই পুঁথি নিয়ে মোহাম্মদী জামাআতের লোকেরা মানহানির মামলা করেন। ময়মনসিংহের বিখ্যাত সব আইনজীবী এই মামলায় পক্ষ সমর্থন করেন। ব্যারিস্টার কে. সি. নাথ, অ্যাডভোকেট সারদা চরণ ঘোষ, (রায় বাহাদুর) খান বাহাদুর জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, জনাব মৌলভী আবদুল খালেক ও রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা আইনজীবীগণ এই মামলার পক্ষ ও বিপক্ষ পরিচালনা করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যা দিবার জন্য আল্লামা মোহাম্মদ সাহেবকে আনা হয়। বেশ কিছুদিন শুনানির এই মানহানি মামলাটি ডিসমিস হয়ে যায়। এই মামলার শুনানি শুনার জন্য আদালতে প্রচুর জনসমাগম হতো বলে জানা যায়।

উমদাতুল মোছায়েল ও এনায়েত রহমান : মৌলভী সৈয়দ আবদুর রহমান এই পুঁথি দুইটির রচয়িতা। তিনি বর্তমান জামালপুর জিলার জোকারপুর গ্রামে ইংরেজি ১৭৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২১৩ বঙ্গাব্দে তিনি 'উমদাতুল মোছায়েল' এবং ১২১৫ বঙ্গাব্দে 'এনায়েত রহমান' রচনা করেন। কেউ কেউ তার জন্মস্থান জামালপুর সদর থানাধীন ভটবাড়ি গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় বর্তমানে উক্ত পুঁথি দুটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

আফতাবে হেদায়েত : 'আফতাবে হেদায়েত' পুঁথির লেখক হলেন মুন্সী মোঃ তাহের উদ্দিন। তিনি আনুমানিক উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৮৫০ সনের দিকে জামালপুর জিলার দেওয়ানগঞ্জ থানার নিলক্ষিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার আফতাবে হেদায়েত আনুমানিক ১৯২৫/৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে লিখা। বর্তমানে পুঁথিটির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, কেননা অনেক অনুসন্ধান করেও পুঁথিটির কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

রোজহাসর ও রাখাল রাজার বিচার : এই দুইটি পুঁথির রচয়িতা হলেন শাহ হামিদ আলী ফকির। তিনি জামালপুর জিলার ইসলামপুর থানাধীন চারিয়া গ্রামে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুকাল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। তার রচিত পুঁথি দুটিও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। রোজ হাসর পুঁথিটি একান্তই ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত বলে নামে বুঝা যায়। সম্ভবত এই পুঁথিটিতে রোজ হাসরের বিচারের দিনের বর্ণনা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে।

বুরহানে হক ও কৃষক সহায় : আলহাজ মীর্জা জাফর আলী এই পুঁথি দুইটি রচনা করেন। তিনি জামালপুর জিলার মাদারগঞ্জ থানার সুখনগরী গ্রামে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ খ্রিঃ মৃত্যুবরন করেন। পুঁথি দুটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'কৃষক সহায়' পুঁথিটিতে সম্ভবত কৃষিকাজ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

জামালপুরের আমলাপাড়াস্থ মোক্তার ফজলুর রহমান আজনবী দুটি পুঁথি লিখেছেন বলে জানা যায়। তিনি শেরপুরের নালিতাবাড়ি থানার পাইকুড়া গ্রামের 'তাহইয়াতুচ্ছালাত' পুঁথির রচয়িতা মুন্সী রমজান আলীর নাতনী। বংশগত ধারানুযায়ী তিনি হয়তোবা পুঁথি লিখাতে মনযোগী হয়ে থাকবেন। এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে জামালপুরের অধিকাংশ পুঁথির বিবরণ ও পুঁথিকারের পরিচয় আলহাজ গোলাম মোহাম্মদ রচিত 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। গ্রন্থটি ১৯৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকর মির্জ্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দার এবং তা জামালপুরে আমিনা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। 'জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত' একটি নির্ভেজাল প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত।

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ জিলা পুঁথি সাহিত্যে সারা বাংলাদেশে সম্ভবত প্রথম স্থান দখল করে আছে। এখানে পুঁথিকারের জন্ম হয়েছে কম কিন্তু তাদের পুঁথিকর্ম পরিমাণ ও উৎকর্ষের তুলনায় বাংলাদেশে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁথিকার মুন্সী আবদুর রহিম (১৮২৫-১৯০০) এই জিলারই কৃতী সন্তান। করিমগঞ্জের অপর পুঁথিকার মুন্সী আজিমউদ্দিনও প্রায় বাংলা-উর্দু মিলিয়ে ১০/১২টি পুঁথি রচনা করেছেন। মুন্সী আবদুর রহিম পুঁথি সাহিত্যে সারাদেশেই কিংবদন্তি তুল্য। তিনিও পুঁথিকার আজিমউদ্দিন প্রায় সমসাময়িক বলে জানা যায়। শুনা যায় তাদের ভিতরে একটি সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। মুন্সী আবদুর রহিমের জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর থানা এবং মুন্সী আজিমউদ্দিনের জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ থানার দেহন্দা বা গোজাদিয়া গ্রাম। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় তার। 'আসরাবেস সালাত' ও 'রেমানে আজিমউদ্দিন হানাফী' নামে তিনি দুইটি উর্দু পুঁথি লিখেছেন বলেও জানা যায়। এই দুইজন পুঁথিকারের পরিচয় আমরা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করার আশা রাখি।

মুন্সী আবদুর রহিম : উনবিংশ শতকের শেষ পাদে সমগ্র বাংলাদেশে যে ক'জন পুঁথিকার জীবিত ছিলেন মুন্সী আবদুর রহিম তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার। আবহমানকাল থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহে যে সকল পুঁথিকার জন্ম নিয়েছেন পুঁথির জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষতার দিক দিয়ে কেউই মুন্সী আবদুর রহিমের সমকক্ষ নন। মুন্সী আবদুর রহিম পুঁথি সাহিত্যে কিংবদন্তিতুল্য কিন্তু এই প্রথিতযশা পুঁথিকারের সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা হেতু অতি সামান্যই জানা যায়। বিভিন্ন গবেষকরাও তার সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়ে তেমন কিছু লিখে যাননি। আমরা তাই এ বৃহত্তর জিলার কৃতী সন্তান

হিসেবে আবদুর রহিমের বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। তার জীবিত বংশধরদের সাথে আলাপ-আলোচনা, অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ ও বিভিন্ন পুঁথিতে তার আত্মপরিচয় এক্ষেত্রে আমরা সহায়ক হিসাবে তুলে ধরছি। ভনিতায় আত্মপরিচয় প্রকাশ দোভাষী পুঁথিকারের স্বভাবজাত ধর্ম। মুন্সী আবদুর রহিম তার 'গাজী কালু চাম্পাবতী' পুঁথির চুরাশি পৃষ্ঠায় ভনিতায় বলেন—

আবদুর রহিম আমি হীনের বচন।
পরিচয় শুন মোর কোথায় ভবন ॥
ময়মনসিংহ জিলা বিচে গলাচিপা গ্রামে।
আশুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে ॥
বাটীর দক্ষিণে নদী সুসন্দা নামেতে।
মহকুমা হয় কিশোরগঞ্জের অধীনেতে ॥
জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তপাতি।
আছি দীনহীন আমি করিয়া বসতি ॥

এ ছাড়া তার 'দেল দেওানা' পুঁথির শেষাংশে 'শায়েরের পরিচয়' শীর্ষক দীর্ঘ অধ্যায়ে পুঁথিকারের বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরা-হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হলো—শায়ের আবদুর রহিম। পিতা হাজী বরকতুল্লাহ্, দাদা শেখ ডেডু ('দেল দেওানা' পুঁথির ১৯৬৩ সনের সংস্করনে দাদার নাম শেখ তেতু উল্লেখ করা হয়েছে যিনি পুঁথিকারের জন্মের পূর্বেই মারা যান। অর্থাৎ পুঁথিকার তার দাদাকে দেখেননি) তার বাবা হাজী বরকতুল্লাহ্র মৃত্যু হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ সোমবার। পুঁথিকাররা নয় ভাই। পাঁচ ভাইয়ের পরিচয়—তুরিকুল্লাহ্ সকলের বড়, পুঁথিকার মধ্যম, এরপর হাবীব নবী, কলিমউদ্দিন ও সকলের ছোট আবদুল জলিল। তার ওস্তাদ মুন্সী আবুল হোসেন পীরের নাম শাহা আস্কর আলী, অপর ওস্তাদ মুন্সী কেয়ামুদ্দীন, পুঁথিকারেব দোস্ত সৈয়দ হামিদ উদ্দিন, পৌত্র আহমদ মুন্সী (জীবিত ছেলের দিক থেকে), রইস উদ্দিন (জীবিত ভাতিজার দিক থেকে)। গেল শতাব্দির আশির দশক পর্যন্ত আবদুর রহিমের বর্তমানে জীবিত অতিবৃদ্ধ ভাতিজার ছেলে দিনাজপুরে চাকরিরত ছিলেন।

আবদুর রহিমের জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় না করা গেলেও আহমদ মুন্সী ও রইস উদ্দিন জানিয়েছেন যে তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দুই তিন দশকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ শতকের একেবারে শেষাংশে বা বিংশ শতকের একেবারে শুরুতে তিনি মৃত্যুবরন করেন। বাংলা ১২৭৪ সালে তিনি দেল দেওানা পুঁথি রচনা করেন। তিনি তাতে উল্লেখ করেন—

নয় হাজার সাল আর চব্বিশ যে সাল।
বারশত চুয়াত্তর সনে কহিল কাঙ্গাল ॥

পুঁথির ভনিতা, আত্মপরিচয় ও দুই পৌত্রের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে মুন্সী আবদুর রহিমের জন্ম সন ১৮২৫ বলে স্থির করা হলো এবং মৃত্যুর সন ১৯০০ বলে ধরে নেওয়া যায়।

আবদুর রহিমের একটি নিজস্ব ছাপাখানা ছিল কোলকাতায়। তার অধিকাংশ পুঁথি তার এই নিজস্ব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। পুঁথিকারের 'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' গ্রন্থটি মুদ্রনের সময় হঠাৎ করে তার ছাপাখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। মনের দুঃখে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকাতেও একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার নাম

ইসলামিয়া প্রকাশনী। ঢাকায় অবস্থানকালে আবদুর রহিমের অনেকগুলি পুঁথি এই ইসলামিয়া প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি মুদ্রণ কাজে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তার পুত্র আবদুল করিম মুন্সী তার মৃত্যুর পর বিক্রীত পুঁথির আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন এবং আবদুল করিম মুন্সীর মৃত্যুর পর পুঁথির স্বত্ত্বাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুন্সী আবদুর রহিমের মোট গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি। এই গ্রন্থগুলির প্রায় সব ক'টিই তার নিজস্ব প্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশিত, যদিও বর্তমানে সংস্করণের অভাব হেতু দুষ্প্রাপ্য। তার সর্বপ্রথম গ্রন্থ হচ্ছে 'দেল দেওানা'। এটি ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে লিখিত বা রচিত হয়েছে। এ ছাড়া তার অন্যান্য পুঁথি হচ্ছে— আমির হামজা ১৮৭৩, হজরত বিলালের জীবনী ১৮৭৯, গাজী কালু চাম্পাবতী ১৮৮৭, জারী জঙ্গনামা ও শেখ ফরিদের পুঁথি ১৮৯৩, চমৎকার জালের পুঁথি ১৮৮৭, বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত ১৮৯১, সহিহ সোনাবান ১৮৮৯, নবী নামা ও ছহিহ নালিতার পুঁথি ১৮৯০, মোহাম্মদী বেদতত্ত্ব ও নাঙ্গা তলোয়ার ১৮৯৬, মসনবী শরীফ (১ম খণ্ড) ১৮৯৮ সনে রচিত কিংবা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সম্ভবত তিনি একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মসনবী শরীফ (২য় খণ্ড) রচনা করে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে (তার মৃত্যুর পর) তার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তার পুত্র মুন্সী আবদুল করিম মসনবী শরীফ (২য় খণ্ড) রচনা করেন। মসনবী শরীফ রচনাকাল (২য় খণ্ড) ১৯০০/১৯০১ খৃস্টাব্দ।

পুঁথি সাহিত্যে আবদুর রহিম নামের চার ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হলেন. 'গাজী কালু চাম্পাবতী'র আবদুর রহিম (কিশোরগঞ্জ) 'আখলাকে আহম্মদীয়া'র আবদুর রহিম (নোয়াখালী), ঢাকার নবাবের পুঁথির আবদুর রহিম (ঢাকা) এবং 'প্রেম লীলা'র আবদুর রহিম (হাওড়া, পশ্চিম বাংলা)। আবার উনিশ শতকের শেষ দিকে রচিত 'গাজী কালু চাম্পাবতী' বা 'কালু গাজী চাম্পাবতী' পুঁথি কাব্যের চারজন রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের নাম হলো আবদুর রহিম মুন্সী, আবদুল করিম মুন্সী, আবদুল গাফফার ও সৈয়্যিদ হালু মিঞা। অনেকে আঃ করিম মুন্সীকে কিশোরগঞ্জের আবদুর রহিম মুন্সীর পুত্র বলে মনে করেন। আবদুল করিম মুন্সী নামে আবদুর রহিম মুন্সীর এক পুত্র ছিল যিনি মসনবী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থের রচয়িতা। সুতরাং এ বিচারে আবদুল করিম মুন্সী যে কথিত আবদুর রহিম মুন্সীর পুত্র তাতে যুক্তিগ্রাহ্যতা রয়েছে।

গাজী কালু চাম্পাবতী : 'গাজী কালু চাম্পাবতী' পুঁথির আদি রচয়িতা কে তা এখন আর বলার উপায় না থাকলেও সর্ববিচারে কিশোরগঞ্জের মুন্সী আবদুর রহিমের রচিত 'গাজী কালু চাম্পাবতী' যে শ্রেষ্ঠ তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গের পুঁথি সাহিত্যে নির্ভেজালভাবে 'গাজী কালু চাম্পাবতী' সবচে বহুল পঠিত এবং উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তার বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। পুঁথি পাঠ ও বিভিন্ন আলোচনাদৃষ্টে অন্তত তাই প্রতীয়মান হয়। কিশোরগঞ্জের মুন্সী আবদুর রহিম বিরচিত 'গাজী কালু চাম্পাবতী' কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নরূপ :-বৈরাট নগরের রাজা শাহা সেকান্দর। তিনি কারুনের মতো ধনী, হাতেমের মতো দাতা আর রুস্তম নরিম্যানের মতো বীর। বলিরাজা যুদ্ধে পরাজিত হন শাহা সেকান্দরের সাথে। পরাজিত হয়ে তিনি নিজ কন্যা অজুপা সুন্দরীকে সেকান্দরের হাতে তুলে দিয়ে রাগে-ক্ষোভে-অপমানে পাতাল নগরে গমন করেন। 'অজুপা নামিনী কন্যা, ছিল তার অতি ধন্যা, সেকান্দরের হাতে তুলে দিল।' অজুপা মুসলমান হয়ে রানীর আসন লাভ করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই জুলহাস নামে তার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। যুবক বয়সে জুলহাস সুন্দরবন এলাকায় হরিণ শিকারে যান। এক মায়াবী হরিণীর পিছু পিছু তিনি পাতাল নগরে গমন করেন। পাতালপুরীর রাজা জঙ্গরাজার কন্যা পাঁচতোলাকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যান। জুলহাসের না আসাতে রাজা কান্দে, রানী কান্দে, পুরবাসী সবাই কান্দে। একদিন অজুপা নদীতে ভাসমান একটি সিন্দুক থেকে কালুকে কুড়িয়ে পান। কিছুদিন পর অজুপা সুন্দরী এক স্বপ্ন দেখেন যে তার কোল জুড়ে এক পুত্র আসছে। এভাবে দশ মাস দশদিন পর গাজীর জন্ম হয়। গাজীর বয়স এখন দশ বছর। গাজী কালু এখন পরস্পরের সহচর। একদিন বাদশা তদপুত্র গাজীকে বলেন, 'রাজত্ব করহ বাছা বৈসে সিংহাসনে'। গাজী উত্তর দেয়, 'সংসারবাসীর মুখে মারিয়াছি লাথি', গাজীর কথায় রাজার রাগ হয়। বিভিন্ন কঠিন সাজা দেন তাকে। একদিন অভিমান করে গাজী রাজা-রানীকে ঘুমন্ত রেখে ফকিরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। যেতে পথে কালুর সাথে দেখা। কালুও তার সঙ্গী হলো। গাজী কালু দুই ভাই নানা দেশ ভ্রমণ করে সুন্দরবনে আসেন। 'নানা দেশ নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ' শ্রীরাম রাজার রাজ্যে তারা আসেন। প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে কালু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে রাজ দরবারে ভিক্ষা মাগেন। মুসলমান দেখে ব্রাহ্মণ রাজা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বন্দি করা হলো কালুকে। গাজীর কারামতীতে রাজপুরীতে আগুন লেগে গেল। নিখোঁজ হলেন রানী মাতা। রাজা মুসলমান হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলে রাজ্য ও রানীকে ফেরত পান। এদিকে পরীদের সহায়তায় সোনাপুরে একটি মসজিদ বানিয়ে দুই ভাই দুই পালংকে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘটল এক আজব ঘটনা :

কোকাফ দেশেতে বসে করে পরীগণ।
তার মধ্যে ছয় পরী প্রথম যৌবন ॥
লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরী।
কাল পরী সাদা পরী তার ছোট নূরী ॥

তারা রথে চড়ি খোদার আশ্চর্য সৃষ্টি দেখছিল। বেড়াতে বেড়াতে তারা এসে হাজির হলো সোনাপুরে। দেখে, দুই ভাই দুই পালংকে নিদ্রা যাচ্ছেন। গাজীর রূপের আলোতে সারা মসজিদ উদ্ভাসিত। তারা প্রাণ ভরে গাজীর রূপ মাধুরী অবলোকন করে। এক পরী বলে, 'হেন রূপের কন্যা কিগো আছে এ সংসারে।' অন্য এক পরী জবাব দেয়,

এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি।
নিশ্চয় গগন শশী সেই বিনোদিনী ॥
জবাফুল জিনি জিহ্বা তাতে খায় পান।
না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান ॥
মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন।
জিনিয়া চান্দের ছটা চোখের কিরণ ॥

এ নিয়ে পরীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে 'লাগায়ে গাজীর অঙ্গ চাম্পার অঙ্গেতে/কেবা বেশি কেবা কমি দেখিব চোখেতে ॥' যেই কথা সেই কাজ তারা গাজীকে পালংক সমেত ব্রাহ্মণা নগরে সেই কন্যার মহলে নিয়ে হাজির। তারা দেখল, রূপের পাল্লায় কেউ কম-বেশি নয়, দুজনে সমানে সমান। তারা গাজীকে চাম্পাবতীর মন্দিরে রেখে রাজ বাগানে ফলমূল খেতে চলে গেল। এদিকে গাজী—

কালু ভাই বলে গাজী গা মোচর দিল।

চাম্পার অঙ্গেতে হাত অমনি পড়িল ॥
পুরুষ পরশে ধনী পাইল চেতন।

...

দাসী হেন জ্ঞান কন্যা মনেতে করিয়া।
দাঁড়াইয়া উঠে বালা খাড়া হাতে লইয়া ॥

কিন্তু একি! এ যে রূপের নাগর!! তার রূপ দেখে চাম্পাবতী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কতক্ষণ পরে হুঁশ হয়ে ভাবে, ঠিক আছে, একে ডেকে জিজ্ঞাসা করি।

উঠ উঠ প্রাণচোরা কত নিদ্রা যাও?
অভাগিনী চাম্পা তাকে চক্ষু মেলি চাও ॥

চাম্পার ডাকাডাকিতে গাজী সজাগ হয়। চাম্পাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে পড়ে। চাম্পা গাজীকে তার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাস করে। গাজী উত্তরে বলে,

মুছিয়া কমল আঁখি, বিধুমুখে সুধা মাখি, কহে গাজী মধুর বচনে।
কি কহিব পরিচয়ে, প্রাণ মোর কাঁপে ভয়ে, শুন যদি সাধ থাকে মনে ॥
বিরাট নগরে ঘর, পিতা সাহা সেকান্দর, অজুপা সুশীলা সতী মাতা।
মোর নাম জান গাজী, তোমার মন্দিরে আজি মিনমত হৈছি জালে গাথা ॥
শুন চাম্পা বলি তোরে, দক্ষিণা রায়ের মোরে, ভয় যে দেখাও বার বার।
মোর বাপ যিনি কাল, পাইলে করিতে লাল, কান দুটি মলিয়া তাহার ॥
আমার বাপের তরে, কাঁপে ভূমি থরে থরে, আর কাঁপে সর্ব দেবগণ।
মাতামহ রাজ বলি, পিতার ভয়েতে চলি, গেল রাজা পাতাল ভবন ॥
শুন সতী হৈয়া ধৈর্য, করিবারে রাজকার্য, মোরে ডাকি কহিলেন পিতা।
আমি তাতে অস্বীকার, কৈল কত বারবার, আজ্ঞা দিল কাটিবারে মাথা ॥
না ধরিল হাতিয়ারে, তবু পিতা ক্রোধ ভরে, পাড়াইল দশ হাতী দিয়া।
তাহাতে বাচিনু যবে, অগ্নিকুণ্ড করে তবে, দিল বাপে তাহাতে ফেলিয়া ॥
অগ্নি হতে উদ্ধার হই, সাগরে ফেলিয়া সুঁই, বলে মোরে উঠাইয়া দিতে।
সুঁই আমি দিনু যদি, তবু পিতা নিরবধি, বলে মোরে রাজত্বের কথা।
অতএব নিশা কালে জননীকে ঘুমে ফেলে, দেশ ছাড়ি মনে পাই ব্যথা ॥

... ...

সেই মসজিদ পরে, ছিলাম ঘুমের ঘোরে, দুই ভাই দুই পালঙ্কেতে।
কে মোরে এখানে আনে, কিছু নাহি জানি মনে, কহিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥

গাজীর বচন শুনে চাম্পাবতী বলে—

চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর।
উপনিত হৈলে এসে ব্রাহ্মণা নগর ॥
জান না মুকুট রাজা হয় মোর পিতা
যবন পাইলে সেহ কাটে দায় মাথা ॥
জান না দক্ষিণা রায় রাজার গোসাই।
মানুষ্য পাইলে যেন অম্বল চিবায় ॥
কেমনে আসিলে চোর আমার মন্দিরে।

নিজেও মরিতে আর মারিতে আমারে ॥

যবনের সাধ্য নাই দেশে দিতে পারা।
একেবারে মধ্য ঘরে বসিয়াছ চোরা ॥
গাজী মুসলমান এ কথা জেনে চাম্পাবতী বলে,
রাম রাম জাতি মোর গেল একেবারে।
ত্বরায় বাহিরে যাও ছুঁইবে আমারে ॥

গাজী চাম্পাবতীকে জ্যোতিষশাস্ত্রে কার কি ভাগ্য তা গুনে দেখার জন্য অনুরোধ করে। গুনে চাম্পা দেখল,

এ বলিয়া রাজবালা খড়ি লয়ে হাতে।
দুই নাম যুক্ত করি লাগিল গণিতে ॥
গণিয়া দেখিল চাম্পা লিখেছে বিধাতা।
গাজীর সঙ্গেতে চাম্পা এক সুতে গাথা ॥
হইবে সাহেব গাজী প্রাণেশ তাহার।
গাজী বিনে সংসারেতে পতি নাই আর ॥

গাজী তার স্বামী হবে জেনে চাম্পা গাজীকে বলে,

যৌবন অমূল্য ধন সপিনু তোমারে।
যাহা ইচ্ছা হয় নাথ কর তুমি মোরে ॥

গাজী উত্তর দেয়—

যতদিন না হইবে বিবাহ বন্ধন।
ততদিন তব সাথে না হবে মিলন ॥

গাজী ও চাম্পাবতী দুইজনে প্রেমবশে মিষ্টি, ফলমূল, তাম্বুল খেয়ে নিজ নিজ হাতের আংটি পরস্পর বদল করে, পালংক বদল করে ঘুমিয়ে পড়ে। এ দিকে 'বাগানেতে পরীগণ ফলমূল খায়।'

হঠাৎ গাজীর কথা হইল স্মরণ ॥

তারা এসে দেখে 'জাগিয়া করেছে এরা দুজনে বিহার'। তারা এ জোড় ভেঙ্গে নিতে চায় না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়—

যেখানের মরা চল সেখানে রাখিয়া।
আপন ঘরেতে মোরা যাইগো চলিয়া ॥

পরীগণ পালংক সমেত গাজীকে সোনাপুরে রেখে চলে গেল। কালু ফজরের আজান দিলে গাজীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। একি! কোথায় চাম্পাবতী! কোথায়ইবা ব্রাহ্মণা নগর!! 'ডাকে কালু ভাই, চাম্পাবতী নাই অমনি পড়িল ঢলি ॥ কালুর সেবা যত্নে তার হুঁশ হয়। গাজী তার ভাইকে বলে—

যেই রূপ দেখিয়াছি চোখে আপনার।
কি কহিব ভাই কালু কাছেতে তোমার ॥
কোটী কোটী রবি আর কোটী শশী জিনি।
দেখিতে সুন্দর অতি তার মুখখানি ॥
ভ্রমরের বর্ণ যার লম্বা কেশ শিরে।

টলিবে মুনির মন কেশ যদি হেরে ॥
কিবা হস্ত কিবা পদ আহা মরি মরি।
তাহার সদৃশ নাই ত্রিজগত জুড়ি ॥

গাজীর পীড়াপীড়িতে কালু গাজীকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণা নগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল.। কয়দিন পর তারা ব্রাহ্মণা নগরের কাছাকাছি নদীর তীরে একটি কদম বৃক্ষের তলে আস্তানা গাড়লো। কালু গাজীকে বলে যদি আগামীকল্য নদীর ঘাটে সেই কন্যার সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে বুঝবো কন্যা তোমার ভাবে আছে। আমি তখন ঘটক সেজে বিয়ের পয়গাম নিয়ে রাজপুরীতে যাব। এদিকে চাম্পাবতী গাজীর চিন্তায় একেবারে দিশেহারা, ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে না—কেশ বেশ বাঁধে না। সেদিন রাত্রে,

কদম্ব গাছের তলে, দুই ভাই শোকাকূলে, চাম্পা আশে আছেন বসিয়া।
সেখানেতে চাম্পাবতী, কান্দে সদা দিবারাতি, গাজী গাজী জবানে বলিয়া ॥
অন্ন নাহি রুচে মুখে, নিদ্রা নাহি আসে চোখে, কান্দে সতী লোটায়ে ধরণী।
কেন্দে কেন্দে হৈয়া সাড়া, ভেবে সেই প্রাণ চোরা, চোখে নিদ্রা হইল অমনি ॥
বিধির আদেশ হেতা, আসিয়া এক ফেরেস্তা, দেখাইল এমন স্বপন।
ফেরেস্তা শিরাণে বসি, কহেন চাম্পাকে আসি, দুঃখ তবে যাইবে এখন ॥
শোন শোন চাম্পাবতী, তোমার ভাসুর পতি, সেপাড়েতে দুজনা আসিয়া।
উত্তরের বান্দা ঘাটে, বসিছে নদীর তটে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
কাল যদি তব সনে, দেখা হলে দুইজনে, তবে তারা আসিবে পুরীতে।
না হলে চলিয়া যাবে, তব নাম নাহি লিবে, শাহা গাজী আপন মুখেতে ॥
শোন চাম্পা তোরে বলি, চলিয়া যাইবে কালি, গাজী প্রতি যদি থাকে মন।
উত্তরের ঘাটে যাবে, সেই ঘাটে গিয়া পাবে, গাজী আর কালুর দর্শন ॥

স্বপ্ন দেখে রাজকন্যা জেগে উঠলো। যথারীতি রাত্রি পোহাল। মাকে ডেকে চাম্পাবতী বলে—

ফজর হইল ভানু রবির উদয়।
হেন সমে চাম্পাবতী মাকে ডেকে কয় ॥

মা'র অনুমুতি নিয়ে চাম্পাবতী নয় মামী, সাত ভাজু ও শত সখী সমভিব্যাহারে নদীর ঘাটে স্নান করতে গেল। দেখা হলো গাজী কালুর সাথে। কথামতো কালু ঘটক হয়ে রাজবাড়িতে গেলো। মুকুট রাজা এহেন বিয়ের প্রস্তাব শুনে যারপরনাই রাগান্বিত হলেন। বন্দি করা হলো কালুকে। তার বুকে পাষাণ চাপা দেয়া হলো। শিরের পাগড়ি খসে পড়ায় গাজী বুঝল যে তার ভাই বিপদে পড়েছে। যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নাই। গাজী সৈন্য যোগাড়ের নিমিত্ত সোজা সুন্দরবনে এলেন। সুন্দরবনের বাঘকুলই হবে তার সৈন্য সামন্ত। বাঘেরা গাজী জিন্দাপীরের হুকুম পেয়ে সাজতে শুরু করল—

সাজে বাঘ খান্দেওয়ারা বাঘের প্রধান।
রাক্ষস ধরিয়া খায় ভাঙ্গিয়া গর্দান

বেড়াভাঙ্গা, মেচি, খেচি আরও কত বাঘ সাজে গাজীর সাথে যুদ্ধে যেতে। বাঘ সৈন্য নিয়ে গাজী যুদ্ধে রওয়ানা দিলেন। বাঘ সৈন্যদল আগে আগে আর গাজী পিছনে পিছনে 'আসা' লয়ে হাতে খেদারিয়া যান'। বাঘ দেখে লোকজন বলে—

এই যে ফকির বেটা বড় যাদু জানে।

এ জন্য বনের বাঘ তারে পোষ মানে ॥

গ্রামবাসীদের উক্তিতে গাজী বড় লজ্জা পেল। সে সমস্ত বাঘ সৈন্যকে কারামতী বলে ভেড়ায় পরিণত করল,

বিছমিল্লা বলিয়া গাজী এক ফুঁক দিল।
যত বাঘ ছিল সব ভেড়া হৈয়া গেল।

যেতে যেতে তারা ব্রাহ্মণা নগরের এ পাড়ে নদীর ঘাটে পৌঁছল। ঘাটের খেওয়ানী হলো ছিঁড়া, ডোরা দুই ভাই। তারা দুইটি বড় ভেড়ার পরিবর্তে গাজীকে ব্রাহ্মনা নগরে পাড় করে দিল। এদিকে ছেড়া ডোরার বাপের শ্রাদ্ধের সময় এসে গেল। ভেড়া দুইটিকে তারা শ্রাদ্ধের কাজে ব্যবহার করতে মনস্থ্ করল। তারা তের খান পাড়া নিমন্ত্রণ করে এলো। ভেড়া বলি দিতে ডেকে আনা হল দুই দ্বিজবরকে। বেচু আর খেচু। উভয়েই ভারি লোভী। ভেড়ার অণ্ডকোষ নিয়ে ব্রাহ্মণে বাধে ঝগড়া। এক ব্রাহ্মণ বলে,

আমার ব্রাহ্মনী তিনি হন গর্ভবতী।
অণ্ডকোষ খাইবারে অভিলাষ অতি ॥

ছেঁড়া ডোরার মধ্যস্থতায় দুই দ্বিজবরের ঝগড়া নিষ্পত্তি করা হয়।

'দুইটি ভেড়ার আছে অন্ডকোশ চারি।
বিভাগ করিয়া লহ দুই দুই করি ॥

বলি দেওয়ার সময় দুই বাঘ নিজ নিজ ছুরত ধরে চলে এলো। এদিকে ব্রাহ্মণা নগরের লোক সকল বাঘের ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হতে পারে না। তারা ঝারা শারা ঘরে বসেই শুরু করে।

যাহার ঘরেতে যত হাড়ি পাতিল ছিল।
হাগিয়া মুতিয়া সব ভরিয়া ফেলিল ॥

ব্রাহ্মণা নগরের প্রজাকুল পড়ল মহাবিপদে। উপায়ন্তর না দেখে রাজা রাজগোসাই দক্ষিনা রায়কে পূজো দিয়ে তুষ্ট করে গাজীর বাঘ সৈন্যের সাথে যুদ্ধে পাঠালেন। কাতারে কাতারে বাঘ দেখে দক্ষিণা রায় ভাবে—

এক বাঘ মারি যদি গদা উঠাইয়া।
দশে বিশে একেবারে ধরিবে আসিয়া ॥

দক্ষিণা রায় যুদ্ধ না করে সোজা নদীর ধারে চলে গেলেন। গিয়ে গঙ্গা মাকে ডাকা শুরু করলেন। গোসাই-এর ডাকে গঙ্গা 'ভাসিয়া উঠিল', দক্ষিনা রায় তার কাছে কুম্ভিরের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে গঙ্গা রাজি হয় না, কারণ—

গাজী মোর ভগ্নি পুত্র আমি তার মাসী।
কার্তিক গণেশ হৈতে তারে ভালবাসি ॥

দক্ষিণা রায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে গঙ্গা মাসী তাকে কুম্ভির সৈন্য দিল। গাজী তা টের পায়। বলে—

ভাল ভাল মাসী শুধু মুখেতে কেবল।
কাটিয়া বৃক্ষের মূল পত্রে ঢালে জল ॥

যুদ্ধ বাধে কুম্ভিরের সাথে বাঘ সৈন্যের। কুম্ভিরের শরীর ভারি শক্ত। বাঘ সৈন্য তাদের কাবু করতে পারে না।

কুম্ভিরের অঙ্গ শক্ত লোহার আকার।
হেরে দেখ দাঁত মুখ ভাঙ্গিল সবার।

গাজীর দোয়ায় প্রচণ্ড রোদ ওঠে। গরমে তিষ্টিতে না পেরে কুম্ভির সকল সাগরে পালিয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে দক্ষিনা রায় কৈলাস থেকে ডাকিনী-যোগীনি আনে। তারা অলক্ষ্যে থেকে বাঘের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। পুনরায় কাবু হয়ে পড়ে বাঘ সৈন্য। গাজীর দোয়ায় ফের আকাশে আগুন লাগে। ঈষান কোনে একটু ফাঁকা পেয়ে সেই পথে সব ডাকিনী যোগীনীরা পালিয়ে যায়। দক্ষিণা রায় পড়েন একা। তিনি রাগে এমন জোরে এক হাঁক মারেন যে হাঁকের শব্দে সব বাঘ সৈন্য বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এই সুযোগে দক্ষিণা রায় গাজীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। গাজী প্রথমে নিজ 'আসা' এবং পরে পায়ের খড়ম দিয়ে দক্ষিণা রায়ের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। খড়মের ঠাস ঠাস আঘাত সইতে না পেরে 'ভূমিতে পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়'।

আসক্তি হইয়া রায় পড়িল ভূমেতে।
হেন সমে শাহা গাজী অসি লয়ে হাতে ॥
বুকে বসি দুই কান কাটিল টানিয়া।
রাম রাম বলে বীর কানে হাত দিয়া ॥

গাজী দক্ষিণা রায়কে বেধে রাখেন পালংকের খুঁটির সাথে। দক্ষিণা রায়ের পরাজয়ে রাজা ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েন।

দক্ষিণা রায়ের জন্যে, ভাবে রাজা মনে মনে, হেট শিরে গালে হাত দিয়া।
আছিল এমন বীর, ধরিয়া হাতীর শির, দিছে হাতী ছুরেতে ফেলিয়া ॥
তাহাকে যবনে ধরে, কেবা যুদ্ধে আর পারে, কোথা যাব ঠেকিলাম দায়।
জাতিকূল সব যাবে, বাঘে আর ধরে খাবে, হায় হায় কি করি উপায় ॥
পাত্রমিত্র সব কয়, নাহি ভাব মহাশয়, কি করিবে একাকী ফকির
সেনাগণ এত এত, তিন কোটী সাত শত, সার লক্ষ তোপ আর তীর ॥
তোপ আর তীরে তার, বাঘ সব ছারখার, করে মোরা দিব নিমিশেতে। ...
তবে রাজা শান্ত হইয়া, বলে সবে ডাক দিযা, বিলম্বের কাজ নাই আর।
শিঘ্র শিঘ্র চল সাজি, রণস্থলে গিয়া আজি, বাঘ সব করিয়া সংহার ॥...
ধরে সেই ফকিরেরে, আনিয়া চণ্ডির ঘরে বলি দিব ছাগলের মত।

সৈন্য সামন্ত তোপতীরসহ রাজা যুদ্ধে গেলেন। সব তোপতীর এক সাথে দাগানো হলো। ধূয়ায় সারাদেশ অন্ধকার। সাত দিন পরে আলো হলে রাজা দেখল বাঘ সমেত গাজী বহাল তবিয়তে বসে রয়েছে। ভারি চিন্তিত হলেন রাজা। ফাঁক পেয়ে বাঘ সৈন্য রাজার সেনা বাহিনীতে ঢুকে রাজসৈন্য হত্যা করতে শুরু করে। রক্তের স্রোতে বাঘের সাঁতার প্রায়। এরপর দিবাবসান। রাজবাড়িতে 'মৃত্যুজীব' কুপ ছিল। রাত্রি বেলায় সেই কোয়া থেকে জল ছিটিয়ে আবার সব সৈন্য জীবিত করল রাজা। এইভাবে মানুষ মারতে মারতে বাঘের দাঁতে-মুখে ঘা হয়ে গেল। ধ্যানযোগে গাজী 'মৃত্যুজীব' কুয়া দেখতে পেলেন। ইত্যবসরে পরীগণও এসে হাজির। এক পরী একটি গরু মেরে তার গোস্‌ত কুয়াতে ফেলে আসে। এতে মৃত্যু জীব কুপ নষ্ট হয়ে যায়। হারিয়ে যায় তার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি। রাজার মাথায় হাত। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'শিতল মন্দিরে' কপাট লাগিয়ে পালায়। বাঘ সকল অনেক খোঁজাখোঁজি করে রাজাকে গাজীর কাছে ধরে আনে। ভাবি শ্বশুরকে দেখতে গাজী দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখায়। রাজার আদেশ মতো কালুকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে মহা ধুমধামের সাথে গাজীর সাথে চাম্পার বিয়ে হয়। দীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটে। আমোদে

-আহ্লাদে এইভাবে কিছুদিন গত হয়। কালুর কথায় একদিন গাজীর সম্বিৎ ফিরে আসে। তাই তো! আল্লার রাহে ফকিরেরা তো সংসারী হয় না। স্থীর হয়, চাম্পাকে না জানিয়ে তারা চুপিসারে রাতের অন্ধকারে চলে যাবে। চাম্পাবতী তা টের পেয়ে যায়। সে ও সাথী হয় তাদের। রূপসী মেয়ে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরতে তাদের খারাপ লাগে। পথে তারা চাম্পাবতকে 'শেহড়া' গাছ বানিয়ে আগ বাড়ে। এক নদীর ধারে গিয়ে দেখে কয়েকজন যোগী গঙ্গা দেবীর তপস্যা করছে। গাজী তাদেরকে বলে, গঙ্গাকে যদি তাদের সামনে এনে দেখাতে পারে তবে তারা মুসলমান হবে কিনা। যোগীরা গাজীর কথায় রাজী হয়। গাজীর 'মাসী মাসী' ডাকে গঙ্গা পদ্ম পাতায় উঠে বসলেন। যুগীরা প্রাণ ভরে তাঁকে দেখল। তারা ভাবল, যার কথায় আমাদের আরাধ্য দেবী দরশন দেয় নিশ্চয়ই সেই ধর্ম সবচেয়ে বড়। কথামত তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। রাস্তায় গাজীর সাথে এক গোদ রোগীর সাক্ষাৎ হয়। গাজী সেই গোদ রোগীর গোদ টিপে টিপে রস বের করে বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে তা ছুড়ে ফেলে। যে সকল অঞ্চলে সেই গোদের রস পড়েছে সেই সকল অঞ্চলে এখনও গোদ রোগ আছে বলে পুঁথিকার উল্লেখ করেন। গাজী কালু আরও সামনে চলে। তারা পাতাল নগরে গিয়ে ভাই জুলহাস ও ভ্রাতৃবধূ পাঁচতোলাকে নিয়ে আবার মর্তে আসে। 'শেহড়া' গাছ থেকে চাম্পাবতীকে মানবী রূপে পরিণত করে সবাই একত্রে বৈরাট নগরে ফির আসে। রাজ্যময় আনন্দ আর আনন্দ।

সংক্ষেপে এই হলো 'গাজী কালু চাম্পাবতী' পুঁথির কাহিনী। এটি একটি পাঁচালি শ্রেণীর কাব্য। এবং একই সাথে একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানও বটে। তবে হিন্দু দেব-দেবীর সাথে মুসলমান ফকিরের বিজয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে একে পাঁচালি শ্রেণীর কাব্য বলাই অধিকতর যোগ্য হবে। পুঁথিটিতে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। হাসিয়া, মুতিয়া, নিবগো, হৈলে, কৈরে, কৈয়া, বাঙ্গি, মাথাৎ, দেউক প্রভৃতি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার শব্দ প্রয়োগ পুঁথিটিকে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা দান করেছে।

এই কাব্যের ভাষা সহজ, সরল শ্রুতিমধুর। অনেক জায়গাতেই কবিত্বের লক্ষণ স্পষ্ট। অতীতকালে মুসলিম মানসের পরিচয়বাহী এ কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্য শেষে গাজীর মাজার সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুঁথিকার সিলেটের নামকরণের ওপর আলোকপাত করেছেন। গাজীর কবরস্থান প্রসঙ্গে সিলেটের অত্যাচারী গোবিন্দ রাজার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এটি মূল কাহিনীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে মুসলিম মাহাত্ম্য প্রকাশে প্রসঙ্গটি অবশ্যই অর্থবোধক।

'গাজী কালু ও চাম্পাবতী'-র কাহিনীতে আরেকটি অনৈতিহাসিক কাহিনীর রূপান্তর ড. আনিসুজ্জামান দেখিয়েছেন। উপাখ্যানটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের। শাহ সফিউদ্দিন নামক পীরের সঙ্গে পান্ডুয়ার রাজার এক বিরাট যুদ্ধ হয়। পান্ডুয়ার রাজার বাড়িতে ছিল এক মৃত্যুজীব পুকুর। ঐ পুকুরের পানি স্পর্শে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠত। পীর সফিউদ্দিন তা টের পেয়ে একটি গরু কোরবানি করে কিছু গোসত সেই পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করেন। ফলে পুকুরের পানির মৃত সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধে পান্ডুয়ার রাজার পরাজয় ঘটে। এই উপাখ্যানের সাথে 'গাজী কালু চাম্পাবতী'র কাহিনীর অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রার্থক্য শুধু পান্ডুয়ার রাজার পরিবর্তে ব্রাহ্মণা নগরের রাজা মুকুট রায়, পুকুরের পরিবর্তে মৃত্যু-জীব কুয়া, শাহ সফিউদ্দিনের পরিবর্তে গাজী জিন্দাপীর এবং মানব সৈন্যের পরিবর্তে বাঘের দল, কুম্ভিরের দল, পরীগণ ও ডাকিনী যোগীনি। এই পুঁথির রচনাকাল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ।

দেল দেওানা–'দোল দেওনা' ফকিরী বা আধ্যাত্মিক বর্ণনায় সমৃদ্ধকাব্য। শরিয়ত,

হকিকত, তরিকত ও এলমে মারেফাতের বিস্তৃত পরিচয় এতে বিধৃত। পৃথিবী সৃষ্টির আগের অবস্থা, পৃথিবী সৃষ্টি, জল-স্থল-অন্তরিক্ষের সব কিছু সৃষ্টি, আদম হাওয়ার সৃষ্টি প্রভৃতি কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে এই পুঁথিটিতে। মুন্সী আবদুর রহিম এই পুঁথিটিতে আল্লাহ্ ও তার রাসূল (দঃ)-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাদের সকল হুকুম আহকাম মেনে চললে মানবাত্মার কল্যাণপ্রাপ্ত হবে বলে উল্লেখ করেছেন। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সকল প্রকারের মঙ্গল সাধনের জন্য সহজ-সরল পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এই পুঁথিতে। পুঁথিটি ১৮৬৭ বাংলা ১২৭৪ সনে রচিত হয়েছে বলে পুঁথিকার স্বয়ং জানিয়েছেন। এই পুঁথির প্রকাশক ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি, সন ১৯৬৩, সংস্করণ সংখ্যা এতে উল্লেখ নাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২, দাম ১/- টাকা মাত্র। মুদ্রাকর এম আজিজুর রহমান চৌধুরী, ৫০, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা-২। রচনাকাল ১২৭৪ বঙ্গাব্দ। প্রাপ্ত পুঁথিটি ১৯৬৩ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, এর আগে সম্ভবত ১৮৮৭ সনে পুঁথিকার স্বয়ং কোলকাতার তার নিজস্ব ছাপাখানা থেকে পুঁথিটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমানে কোথাও সেই সংস্করণ ও ১৯৬৩ সনের আগে অন্যান্য সংস্করণ পাওয়া যায় না। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে পুঁথিকার বলেন—

ধ্যায়ান করিয়া কহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
দম ছাড়িবার কালে মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ্ ॥
এহি রূপে কতদিন কহিতে কহিতে।
হইবে যে এই জ্ঞান তখন দেলেতে ॥
আমি নহি পীর নহি জমি ও আসমান।
কেবল আছেন সেই পাক সোবহান ॥
এরূপ খেয়াল হবে যখন দেলেতে।
পৌঁছিবেন গিয়া তবে নূর তজল্লিতে ॥

যারা পয়গম্বর, নবী কিংবা রাসুল তারা বেগুনাহ্। বিনা হিসাবে তারা বেহেস্ত যাবেন,

পয়গাম্বর হৈল যত ছনদে আল্লার।
বেগর পুরশিসে যাবে বেহেশত মাঝার ॥
হিসাব তাদের নাহি হইবেক দিতে।
বড় মেহেরবান আল্লা তাদের উপরেতে ॥

নিজের কর্ম সম্পর্কেও পুঁথিকারের বড় আফসোস। হেলায় হেলায় জিন্দেগি কাটালেন তিনি। আল্লাহর দরবারে কি নিয়া হাজির হবেন? তাই তার মনের আফসোস ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে—

কত কত নবী লোক গেছে অন্ধ হইয়া।
মুখে নাহি স্বরে বাত কি কহিবে গিয়া ॥
মিছা কাজে দিন গেল কিছু কবি নাই।
কি নিয়া হইব খাড়া হুজুরে আল্লার ॥

দোভাষী রীতির আদিকালের কবিদের শাস্ত্র বিষয়ক অনুকৃতি আলোচ্য পুঁথিটিতে লক্ষ করার মতো। পুঁথির শেষাংশে 'মউতের বয়ান', 'হজরত মুসা নবীর বয়ান', 'হজরত ইসা নবীর বয়ান' প্রভৃতিতে ইসলাম ধর্ম সম্পৃক্ত আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ্যের বোধগম্য ভাষায়। এ সকল আলোচনা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শাস্ত্রের সত্যতা রক্ষায় অবিচলিত। 'গাজী কালু চাম্পাবতী'র মত এই পুঁথিটিতে পুঁথিকার ময়মনসিংহের অনেক আঞ্চলিক ভাষার সার্থক

ব্যবহার করেছেন। এ সকল আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার পুঁথিটির কাব্যগুণ খাটো করেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে তা কাব্যটির কাব্যগুন বর্ধিত করেছে। ভুক, রৈনু, কারে, দিছে ইত্যাদি শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে পুঁথিটিতে। আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত 'দেন দেওানা' মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হওয়ার দাবি রাখে। এক কথায় আবদুর রহিম বিরচিত 'দেল দেওানা' পুঁথিটি একটি মধ্যম শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বিষয়সমৃদ্ধ পুঁথি।

ছহি সেখ ফরিদের পুঁথি–'ছহি শেখ ফরিদের পুথী' মুন্সী আবদুর রহিমের একটি বহুল পঠিত পুঁথি। এটি একটি পীর পাঁচালি শ্রেণীর কাব্য। 'পুঁথি' শব্দটি পুঁথিকার স্বয়ং এখানে 'পুথী' বানানে লিখেছেন এবং 'শেখ' বানানটি লিখেছেন 'স' দিয়ে। এটি একটি ছোট কলেবরের পুঁথি পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বিশ। শেষ সংস্করণ প্রকাশের সময় ১৯৭৬। ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরী এর প্রকাশক। সংস্করণ সংখ্যা উল্লেখ নাই। দাম ১/৫০ টাকা মাত্র। পুঁথিকার স্বয়ং ঢাকার নিজস্ব ইসলামিয়া প্রকাশনী থেকে ১৮৯৩ সনে পুঁথিটির প্রথম সংস্করণ বের করেন। বাজারে বর্তমানে হামিদিয়া লাইব্রেরীর ১৯৭৬ সনের সংস্করণটি প্রচলিত। এই পুঁথিতে আউলিয়াকুল শিরমণি শেখ ফরিদগঞ্জে শাকর (রঃ)-এর আউলিয়া বা কামেল হওয়ার বৃত্তান্ত বর্নিত হয়েছে। শেখ ফরিদ (রঃ)-এর 'গঞ্জে শাকর' বা 'শাকর গঞ্জ' নামটি প্রচলিত হওয়ার পিছনে একটি কাহিনী সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ।

বাল্যকাল থেকেই শেখ ফরিদ মিষ্টি দ্রব্য বা চিনির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মা নামাজ পড়েন দেখে বালক ফরিদ একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেন মা, নামাজ পড়লে কি হয়? মা জানেন তার ছেলেটি চিনি খুবই পছন্দ' করে। তাই মা বললেন, বাবা ফরিদ, নামাজ পড়লে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে চিনি দান করেন। বালক ফরিদ বলল, ঠিক আছে মা, আমি আজ থেকে নামাজ পড়বো। নামাজ পড়া শুরু করলেন বালক ফরিদ। মা চালাকি করে নামাজের আগেই জায়নামাজের নিচে এক টুকরা চিনি বা মিসরি রেখে আসতেন। বালক ফরিদ নামাজ শেষ করে জায়নামাজ উলটিয়ে সেই চিনি বা মিসরির টুকরা পেয়ে খুবই খুশি হতেন। বহুদিন যায়। একদিন মা চিনি দিতে ভুলে গেলেন। বালক ফরিদ নামাজ শেষ করে যথারীতি জায়নামাজ উল্টালেন। দেখলেন একটি বড় মিসরির টুকরা। ঐ মিসরির গন্ধে সারা ঘর আমোদিত। বালক মাকে বললেন, মা, আজ তোমার আল্লাহ তোমার ছেলের প্রতি বড়ই মেহেরবানী করেছেন। মা তো অবাক! বালক কয় কি!! তিনি তো আজ জায়নামাজের নিচে ভুলে চিনিই দেননি। মার বুঝতে বাকি রইল না শেখ ফরিদ কামালিয়তের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ছেলেকে বললেন, বাবা, তুমি বড় হয়ে সারা বিশ্বজুড়ে চিনি বিলাবে। কখনও তোমার চিনির অভাব হবে না। এ জন্য শেখ ফরিদের নাম হয়েছে 'গঞ্জে শাকর' কিংবা 'শাকর গঞ্জ' যার অর্থ হলো 'চিনির শহর'। বাস্তবিকই এই ছেলে বড় হয়ে ইসলাম রূপ চিনির মস্ত বড় সওদাগর হয়েছিলেন, মায়ের আশির্বাদতো বৃথা যাবার নয়।

মুন্সী আবদুর রহিম 'ছহি শেখ ফরিদে'র পুঁথি এই ভাবে শুরু করেছেন—

হজরত ফরিদ শেখ পিয়ারা আল্লার।
কিরূপে কামেল হৈল শুন সমাচার॥

শেখ ফরিদের তিন বছর বয়ঃকাল থেকে পূর্ণাংগ কামেল হওয়ার যাবতীয় ইতিবৃত্ত এতে বর্নিত হয়েছে। মা সফরা বিবির আদেশে ছয়ত্রিশ বছর বনে-জঙ্গলে থেকে কঠোর ধ্যান অনুশীলনে রত হন। অনিদ্রায়-অনাহারে থেকে তিনি হাড্ডিসার হয়ে পড়েন। চামড়া ছাড়া তার শরীরে হাড্ডির ওপর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন গাছের ডালের সাথে পা বেঁধে

উপুড় হয়ে ধ্যানানুশীলন করেন। এমতাবস্থায় একদিন একটি কাক তাকে মৃত ভেবে তার শরীরের ওপর বসল। সারা শরীর ঠোকড়িয়ে কোথাও কোন মাংসের অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে তার চোখের ওপর ঠোকড় দিল। শেখ ফরিদের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। তিনি কাককে বললেন—

সারা অঙ্গ খেয়োরে কাক না রাখি ও বাকী।
শুধু তুমি খেয়োনা কাক আমার দুটি আঁখি ॥

কিন্তু কাক খাবে কি? সারা শরীরের চামড়া হাড্ডি তো শুকিয়ে একেবারে কাঠ। অবশেষে কাকের অনুরোধে নিজের চক্ষু কাককে বিলিয়ে দিলেন। তিনি মোরাকাবায় বসলে প্রার্থিব সকল কিছু ভুলে যেতেন। এইভাবে ছত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। এই সময়ে তিনি এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে—

পায়ের তলাতে বাসা ভেঙ্গে বানাইল।
চোখে আর কানে আণ্ডা টিকটিকি পাড়িল ॥

এইভাবে তিনি দিব্যজ্ঞানের দেখা পেলেন। অন্তরাত্মা আলোময় হয়ে গেল তার। তিনি 'বাকা বিল্লাহ্‌র' স্তরে পৌঁছলেন। সারা দুনিয়ার সব রহস্য তার নিকট প্রতিভাত হয়ে গেল—

রওশন হইল দেল ঘুচে অন্ধকার।
এক ঠাঁই বসে দেখে তামাম সংসার ॥
আল্লার শোকরানা শেখ অনেক করিয়া
আপনা মোকামে চলে বিছমিল্লা বলিয়া ॥

এভাবে কঠোর সাধনায় তিনি কামালিয়াত হাসিল করে মায়ের উদ্দেশ্যে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন। মা জানেন মুরিদ হওয়া ভিন্ন কারও কামালিয়াত পূর্ণতা পায় না। তাই মা শেখ ফরিদকে হুকুম দিলেন—

আর এক কাম বাবা বাকী তেরা আছে।
মুরিদ হইয়া এস গিয়া পীরের কাছে ॥

মাতৃআজ্ঞা পালনে শেখ ফরিদ হজরত বোয়ালী কলন্দরের কাছে যেতে মনস্থ করেন। শেখ ফরিদ নৌকাযোগে রওয়ানা হন। বোয়ালী কলন্দর দেখেন তার কাছে এমন একজন আসছেন যিনি আধ্যাত্মিকতায় একজন পরিপূর্ণ মানব। তিনি ধ্যানযোগে তা দেখতে পান। তিনি জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখেন যে শেখ ফরিদ নৌকাযোগে তার কাছে আসছেন। তিনি মনে মনে তাকে সমীহ করতেন। ভাবলেন, এ মুহূর্তে যদি শেখ ফরিদের নৌকাটি বালুচড়ে আটকা পড়তো! আর হলোও তাই। শেখ ফরিদের নৌকা মাঝনদীত বালুচড়ে আটকা পড়ে। শেখ ফরিদ এ কাজ বুয়ালী কলন্দরের তা বুঝতে পারলেন। তিনি মনে মনে বললেন, বুয়ালী কলন্দরের যদি দুটি লম্বা শিং গজাতো তবে তিনি জানালার গরাদ থেকে মাথা আর ঘরের ভিতর নিতে পারলেন না। শেখ ফরিদের কথা মত বুয়ালী-কলন্দরের মাথায় গজাল শিং। ইয়া লম্বা লম্বা শিং! তারা উভয়ে উভয়ের কারামতির কথা টের পেয়ে গেল। শেষে দুইজনই তাদের কথা উঠিয়ে নিলেন। বালুচড় থেকে তার নৌকা ছুটে গেল। আর বুয়ালীর মাথার শিংও গেল মিলিয়ে। শেখ ফরিদ বুয়ালী কলন্দরের কাছে এলেন। বুয়ালী কলন্দর তাকে মুরিদ না করিয়ে পাঠিয়ে দেন দিল্লীতে হজরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতীর সুযোগ্য খলিফা হজরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর কাছে। তিনি সেখানে দীর্ঘ পীরসেবার পর তার খিলাফতপ্রাপ্ত হন এবং দিল্লি থেকে রওয়ানা দেন। পথে নিজামউদ্দিন নামক এক দুর্ধর্ষ ডাকাত তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। শেখ ফরিদ তাকে পাপের কথা

স্মরণ করিয়ে দেন এবং কেউ এই হত্যাজনিত পাপের জন্য দায়ী হবে না বলেও জানান। প্রথমে নিজাম ডাকাত এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন না কিন্তু পরে তিনি তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হন। নিজাম ডাকাত তার হাতে বায়াত হন। শেখ ফরিদ তখন বলেন—

কতদিন নিজামেরে রাখিয়া সাথেতে।
বসাইল মরা এক গাছের তলাতে ॥
বসাইয়া কহে পরে শুনহ নিজাম।
এখানে বসিয়া লেহ ইলাহির নাম ॥
এই মরা গাছ জিন্দা হইবেক যবে।
তোমার মতলব সেই দিন পুরা হবে ॥

নিজাম মরা গাছের নিচে আল্লার ইবাদতে মশগুল। একদিন দেখেন এক যুবক একটি নুতন কবর থেকে এক মৃতা রমণীকে তুলে তার সাথে রতি কর্ম করতে উদ্যত। নিজামের সহ্য হলো না। তিনি সেই যুবকের কোদাল দিয়েই খুন করেন সেই যুবককে। এটিই তার সর্বশেষ খুন। মরা গাছের নিচে এসে তিনি তাজ্জব হয়ে যান—

আউলিয়া হইলেন এই খুন করিয়া।
মরা গাছ জিন্দা হইল ডালপালা লিয়া ॥

কালে এই নিজামউদ্দিন খুব বড় কামেল হয়েছিলেন। ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুর থানাধীন বোকাইনগরে এখনও তার মাজার বিদ্যমান। প্রতি বছর মাঘ-ফাল্গুন মাসে এখানে এক মাসব্যপী ওরস হয় এবং মেলা বসে। ডাকাত নিজাম ছাড়াও হজরত নিজামউদ্দিন মাহবুবে এলাহী তার নিকট মুরিদ হন এবং তার খিলাফতপ্রাপ্ত হন।

ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে আরও কিছু প্রসঙ্গ পুঁথির শেষাংশে বর্নিত হয়েছে। স্বামী ভক্তিতে স্ত্রীর মুক্তি— এই মতবাদটিও পুঁথিতে স্বল্প পরিসরে ব্যক্ষা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে আজম শহরের বিশিষ্ট আবেদ হাবীব শাহার বন্দেগির কথাও একেবারে পুঁথির সর্বশেষ পৃষ্ঠায়।

শেখ ফরিদের এই কাহিনী আমাদের বহুল শ্রুত। এই কাহিনীটিতে অপেক্ষাকৃত কম অবাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। মূল কাহিনীর সাথে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা খুবই সুসংহত হয়েছে। পড়তে গেলে বিড়ম্বনা মনে হয় না। সাধারণ বর্ণনায় বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব প্রকাশিত। পুঁথিটিতে ভুক, খাই, আণ্ডা, চোক্ষেতে ইত্যাদি বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা কখনও দৃষ্টিকটু ঠেকেনি। কামালিয়াত অর্জন ও কামালিয়াতের মাহাত্ম্য বর্ণনা পুঁথিটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত—'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' পুঁথিটি তৎকালীন একটি সামাজিক চিত্রপট। মুন্সী আবদুর রহিম তার কোলকাতার বন্ধু জয়নাথ কর্মকারের অনুরোধে এই কাব্যটি রচনা করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের বিবাহ আন্দোলন শুরু করেন। 'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সৃষ্টি। কাব্যটি তিনি ১৮৮১ সনে প্রকাশ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এই পুঁথির ওপর। ব্রিটিশ সরকার এই সময় তার নিজস্ব ছাপাখানাও জোর করে বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, সরকার গ্রন্থ প্রকাশের দায়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুইশত টাকা জরিমানা ধার্য করেন এবং জরিমানা অনাদায়ে এক বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন। মুন্সী আবদুর রহিমের হিন্দু বন্ধুরা জরিমানার টাকা

পরিশোধ করে দিলে তাকে কারাবরন করতে হয়নি। রাগে দুঃখে তিনি কোলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সেই বছরই ঢাকায় চলে আসেন এবং 'ইসলামীয়া প্রকাশনী' নামে একটি ছাপাখানাও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তার বাকী বেশ কটি পুঁথি এই প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' হিন্দু সমাজের অকাল বৈধব্য বরণকারী রমণীদের দুঃখগাথা বর্নিত হয়েছে যা হিন্দু সমাজে রমণীদের পুনঃবিবাহ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। এটি একটি সামাজিকধর্মী পুঁথিকাব্য।

লাঙা তলোয়ার–'লাঙা তলোয়ার' মুন্সী আবদুর রহিমের শেষ বয়সের রচনা। রচনা ও প্রকাশকাল ১৮৯৬। তিনি ঢাকায় বসে এই পুঁথিটি রচনা করেন এবং তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা 'ইসলামীয়া প্রকাশনী' থেকে এটি প্রকাশ করেন। পুঁথিটি রচিত হওয়ার পর তিনি গ্রামের বাড়ি আসেন এবং মুন্সী আজিমউদ্দিনের সহায়তায় পুঁথিটির ভুলত্রুটি ঠিক করেন। মুন্সী আজিম তার প্রতিবেশী। পার্শ্ববর্তী গ্রাম দাপুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন এই মুন্সী আজিম উদ্দিন। আবদুর রহিম তার পুঁথির অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি পাঠ মুন্সী আজিম উদ্দিনকে দিয়েই করাতেন। পুঁথিটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি, রইস উদ্দিনের সহায়তায় এটুকু জানা গিয়াছে বলে অধ্যাপক আজিম উদ্দিন তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আবদুর রহিম কিছু কিছু মারফতী তত্ত্ব বিষয়ক পুঁথি রচনা করেছেন। তবে ওগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা কিংবা পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় সংরক্ষিত আছে তা জানা যায়নি। পাণ্ডুলিপি কিংবা গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়ায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা গেল না।

আবদুর রহিমের বিভিন্ন পুঁথির আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে তিনি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী পুঁথিকার ছিলেন। তার পুঁথিতে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার রয়েছে কিন্তু তা গরিবুল্লাহ্ বা হামজার মতো সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে ওঠেনি। এর কারণ হিসাবে বিদেশী ভাষায় তার স্পষ্ট ধারণার অভাবকেই দায়ী করা যায়। 'গাজী কালু চাম্পাবতী'তে দোভাষী রীতির ব্যবহার ততটা প্রকট না থাকলেও তার 'দেল দেওানা'য় মোটামোটি অনেক আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম বিষয়ে রচিত উপাখ্যান বলেই হয়তো 'দেল দেওানা'তে এরূপ হয়ে থাকবে। হামদ, নাত, বন্দনা ইত্যাদি প্রারম্ভিক নিয়মসহ অন্যান্য রীতির সকল ব্যবহার তাকে বাংলাভাষী অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁথিকারের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। পুঁথি সমূহে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দসহ অপরাপর ছন্দের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ও সুসংহত হয়েছে। 'গাজী কালু চাম্পাবতী' পুঁথি কাব্যের মাঝে ধুয়া, গীতের ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার। গীতগুলিতে বিভিন্ন রাগিনীর কথাও উল্লেখ আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি গীত ও বাদ্যযন্ত্র, তান, মান, তাল ও লয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। দোভাষী রীতিতে আঞ্চলিক ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার তার পুঁথিসমূহে মোটামোটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সত্যি তিনি কৃতিত্বের দাবীদার।

অলসতা মুন্সী আবদুর রহিমের চরিত্রে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। নিজে 'কমপোজ' করতে পারতেন। শোনা যায় তার গ্রামের বাড়ি গলাচিপাতেও একটি কাঠের ছাপাখানা ছিল এবং তিনি অনেক সময়ই তা নিজেই ব্যবহার ও মেরামত করেছেন।

মুন্সী আবদুর রহিম ব্যক্তিগত জীবনে খুবই রসিক ছিলেন। ছিলেন সুবক্তা ও ধার্মিক। ধর্ম বিষয়ে তিনি খুবই সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন এবং অনেক ওয়াজ মাহফিলে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করতেন। ধর্ম বিষয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে লোকেরা দলে দলে তার কাছে ছুটে আসতো। যদিও আরবি ভাষায় তিনি খুব একটা ব্যুৎপত্তি অর্জন

করতে পারেননি। তার রসিকতা সর্বজন বিদিত। তার সম্বন্ধে একটি রসিকতা কিংবদন্তির মতো তার গ্রামাঞ্চলে চালু আছে : তা হলো, একদিন তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক আগন্তুক তাকে জিজ্ঞাস করলো, আপনার গ্রাম কোথায়? তিনি থেমে বললেন 'ছাতার নিচে'। এ শুনে আগন্তুক হেসে দিলেন। ছাতার নিচে গ্রাম থাকে নাকি? তিনি বললেন, কি থাকে? আগন্তুক : মাথা থাকে আবদুর রহিম : তার নিচে কি থাকে? আগন্তুক : গলা; আবদুর রহিম : মার চিপা। এমনিভাবে 'গলাচিপা' গ্রামের পরিচয় দিয়ে কি রসিকতাই না তিনি করেছিলেন। সদা হাস্যরসের আধার মুন্সী আবদুর রহিম আমাদের পুঁথি সাহিত্যে নানা গুনে এক অবিস্মরনীয় নাম।

আজিম উদ্দিন মুন্সী : আজিম উদ্দিন মুন্সী বর্তমান কিশোরগঞ্জ জিলার করিমগঞ্জ থানাধীন দেহন্দা বা গোজারিয়া গ্রামে ১৮১০ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আসরাবেস সালাত' ও 'রেসালে আজিম উদ্দিন হানাফী' নামে দুটি উর্দু পুঁথিসহ ১০/১২টি পুঁথি রচনা করেছেন। তিনি মুন্সী আবদুর রহিমের সমসাময়িক ছিলেন। তথ্যের অপ্রতুলতাহেতু তার পরিচয় ও রচিত পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পেল না।

বর্তমান শতকের পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখন আর ঠিক পুঁথি রচিত হচ্ছে না, 'কবিতা' নামীয় পুঁথির অজস্র ছোট ছোট প্রকাশ বা সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। পুঁথিকারদের মতোই গ্রামের কিংবা শহরের অল্প শিক্ষিত লোকেরা এর রচয়িতা। বর্তমানে শহর, বন্দর বা গ্রামাঞ্চলে এই সকল অল্প শিক্ষিত কবিরা সমসাময়িক কোন ঘটনা বা কাহিনীকে উপজীব্য করে এ সমস্ত 'কবিতা' রচনা করেন— আকারে একেবারে ছোট; আট, বার কিংবা ষোল পৃষ্ঠার। অনেকে একা কিংবা দলবদ্ধভাবে সুরের মাধ্যমে এ সকল 'কবিতা' কোন জনবহুল স্থানে পাঠ করে বেশ জমিয়ে তুলেন এবং এটিই তাদের পেশা হিসেবে বেছে নেন। এ সকল 'কবিতা' পুঁথিরই শেষ অনুকৃতি বা আমেজ— প্রকৃত অর্থে কবিতা নয়। পুঁথির মতো এগুলোও শুরু বন্দনার মাধ্যমে। প্রমাণ—

(১) প্রথমে আল্লা নবী, মনে ভাবি লেখা করি শুরু।
নিদানের ভরসা আল্লা দোয়া দিবেন গুরু ॥
পরে বলে যাই, শুনেন ভাই হিন্দু-মুসলমান।
কিভাবেতে হৈল মিল যোগী আর ব্রাহ্মণ ॥
জিলা ময়মনসিংহে, অল্প দূরে ভাবখালী গ্রাম
সেই গ্রামেতে বসত করে মথুরা বাবু নাম ॥
মথুরা চক্রবর্তী, বুদ্ধি অতি নিজের বুদ্ধি সার।
টাকা পয়সা মধ্যম রকম টিনের দুইটি ঘর।
করে জোতদারী.......... ।

(২) প্রথমে আল্লা নবী, মনে ভাবি লেখা করি শুরু।
অকুলে ভরসা আমার দয়া কর গুরু ॥
আমি লিখতে বসে, চোখে ভাসে কত দুঃখের কথা।
কেমন করে লিখব আমি মনে লাগে ব্যথা ॥

(৩) প্রথমে আল্লা নবী, মনে ভাবি লেখা করি শুরু।
প্রাণ খুলিয়া দোয়া করেন আছেন যত গুরু ॥
আমি বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন না জানি সাধনা।

দুঃখের কবিতা একটি লিখিতে বাসনা ॥

(৪) প্রথমে বন্দনা করি চন্দ্র সূর্য বায়ু।
যার কৃপায় পাইলাম জীবন আর আয়ু ॥

এভাবে পুঁথি সাহিত্যের মতোই বন্দনা দিয়ে বা হামদ নাত দিয়ে কবিতা শুরু হয়। তবে এ বন্দনা বা হামদ নাত একান্ত ছোট ছোট হয় এবং অনেক খেত্রেই মাত্র দুই/তিন লাইনে শেষ করেই মূল বক্তব্য শুরু হয়।

যত মোমিন গন দিয়া মন শুনেন আজব কথা।
গুরু—শিষ্য প্রেম করিল সাক্ষী বসুমাতা ॥
...
ছায়া দেবী বাড়িতে থাইকা পড়িত তখন ॥
মাষ্টার মায়না করা, লেখাপড়া করে সর্বদায়।
মাষ্টারের নামটি ছিল অনিল চন্দ্র রায় ॥
বয়স হবে কুড়ি, দেখতে নারি রূপের চমক।
বিয়া সাদী নাহি করে হইয়াছে যুবক ॥

তৎপর যৌবনের বর্ণনা। ঠিক প্রণয়োপাখ্যানের পুঁথির মতোই—

এদিকে ছায়া দেবী, রূপের ছবি বাড়ে দিনে দিন,
কমল বুকে দেখা দিল যৌবনের চিন ॥
ফুটলো যৌবন কলি, গন্ধে অলি গুন গুন রবে গায়।
নবীন ফুলের মধু খাইতে অন্তরে ডরায় ॥

মাস্টার বাবু সাহস করে ছায়াদেবীকে প্রেম নিবেদন করতে পারে না। ছায়া দেবী যদি কিছু মনে করে—

মাষ্টার সাহস করে, কয় না তারে অন্তরের কথা।
ছায়া দেবী শুনে যদি মনে পাইবে ব্যথা ॥
একদিন সতী ছায়া, বলে গিয়া অনিল বাবুর কাছে।
খুলে বলেন মনের কথা যত কিছু আছে।

মাস্টার তখন ছায়া দেবীর প্রতি প্রেম নিবেদন করেন—

তখন মাস্টার বাবু, হইয়া কাবু বলে দেবীর তরে।
মনের কথা এতদিন কই না আমি ডরে ॥
যদি তুমি ছায়া, কর দয়া আমার দিকে চাইয়া।
শান্তিতে করিতাম বাস তোমাকে পাইয়া ॥

মাষ্টারের প্রেম নিবেদনে ছায়া বলে—

তখন ছায়া বলে, জ্বালাইলে অন্তরে আগুন।
কেমন করে তোমার আশা করিব পূরণ ॥
পিতা আছে ঘরে, পরস্পরে যদি শুনতে পায়।
লেখাপড়া দূরে থাকুক প্রাণে বাঁচা দায় ॥
মাষ্টার ইহা শুনে, মনে মনে চিন্তা করে বসে।
ছায়াদেবীর রূপমাধুরী পান করিব কিসে ॥

এরপর দয়ীতার রূপের বর্ণনা—

শাড়ী বানারসী, পিনছে কষি একশ টাকা দাম।
মেঘনা নদীতে নৌকায় যেমন উড়াইছে বাদাম ॥
গায়ে ব্লাউজ পরা, পাগল করা হাতে করা কাম।
তার উপরে লাগাইয়াছে সোনালী বোতাম ॥
নাকে মরিচ ফুল, কানে দুল দেখিতে সুন্দর।
হাটতে গেলে বুকের কমল কাঁপে থরে থর॥
যেমন ডালিম গাছে, ধরিয়াছে ডালিমের ফল।
ছাতকের কমলা যেমন রসে টলমল ॥

এইভাবে অনিল মাষ্টার ও তার ছাত্রীর মধ্যে প্রেম-পিরিতি এগিয়ে চলে। বাপ-মাকে না জানিয়ে ভেগে যায় তারা নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে। সাথে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা। ছায়া দেবীর বাবা কোর্টে মামলা করেন। দীর্ঘ শুনানির পর মামলা ডিসমিস হয়। ছায়া-দেবীকে ফেরত পায় অনিল বাবু। কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। এইরূপ শত শত কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠে কবিতা। কোন কোন সময় প্রেম উপাখ্যান ছাড়াও কোন জনপ্রিয় সমসাময়িক কাহিনীকে নিয়ে 'কবিতা' রচিত হয়। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এইরূপ একটি কাহিনী দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কবিতাটির নাম 'ছয় দফার কারণে গেল সাধের পাকিস্তান'। কবিতাটির মাঝখানের দুইটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি—

ছয় দফার কারণে গেল সাধের পাকিস্তান।
মুন্সী মোল্লা হাফেজ ক্বারী, ছদকা খাইত বাড়ি বাড়ি
নব্বই টাকা পাইয়া বেতন হাতে লইল মেশিন গান ॥

...ঐ এর অব্যবহিত পরপরই 'চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন গরীব হয়' নামের একটি কবিতা ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বেশ। আজ আকাশ সংস্কৃতির সর্বনাশা প্রভাবে এ সকল পুঁথি সাহিত্য কিংবা কবিতা সাহিত্যের প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে একেবারে এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় এনে আমরা দেখতে পাব যে পুঁথি সাহিত্য একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে যায়নি। আমাদের দেশে বেতার কিংবা টেলিভিশনেও মাঝে মাঝে পুঁথি পাঠ হয়। পুঁথি পাঠকালে বেতার কিংবা টেলিভিশনের পাশে মুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যাও নেহায়েত কম পরিদৃষ্ট হয় না। পুঁথি সাহিত্যের এই জনপ্রিয়তার ক্রমহ্রাসমানতায় আরেকটি বিষয়ও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। তা হলো বিষয় বিন্যাস ও বক্তব্যে কিংবা উপস্থাপনায় ও আঙ্গিকে পুঁথি সাহিত্য খুব শক্তিশালী নয়। শিল্প বিচারে পুঁথি সাহিত্য দুর্বল। তথাপি স্বীকার করতে হয় যে সাহিত্যের প্রাচীন ধারার প্রবহমানতা, সমাজ জীবনের চিত্র বৈকল্প বিনির্মাণ, সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের পুঁথি এক অমূল্য সম্পদ এবং রক্ষাকবচ। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় হলো পুঁথি সাহিত্য নানা গুরুত্বে ভাস্বর হয়েও যথাযথ দৃষ্টিদানের অভাবহেতু ক্রমবিলীয়মান। বর্তমানের সমস্যামুখীন পৃথিবী, আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় ও পুঁথির ভাষা বিষয়ক আমাদের পুঁথিকারদের অজ্ঞতা এই সাহিত্যের জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ। এ গুলো যথাযথভাবে ঢেলে সাজিয়ে নতুন আঙ্গিকে পুনঃবিন্যাস এখনই প্রয়োজন। নবেৎ পুঁথির সাহিত্য কালের অতলে তলিয়ে যাবে ॥

কবিগান ও কবিয়াল

ধীমান মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে 'কবি সঙ্গীত' নামে একটি প্রবন্ধে কবিগানের ওপর আলোচনা করেছেন দীর্ঘ অধ্যায়ে। এ আলোচনাটি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নামক প্রাচীন কবিগানের সংকলন গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি গুরু বলেন : "বাংলার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নতুন সামগ্রী। এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প একদিন হঠাৎ গোধূলীর সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায় এই কবিগানও সেইরূপ এক সময় বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্প ক্ষণস্থায়ী গোধূলী আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বে তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।" রবীন্দ্রনাথ কোনো উৎকর্ষ খুঁজে পাননি কবিগানের ভাব ও ভাষাবৈচিত্র্যেও। তাঁর কথায়, "উপস্থিত মত সাধারনের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল মূলত উপন্যাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া গিয়াছে; ভাবের কবিত্ব লইয়া তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।" কবিগানের অনুরাগী, অনুসন্ধানকারী কিংবা গবেষকগণ সর্বৈব মেনে নিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতকে। 'উনবিংশ শতাব্দির কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে নিরঞ্জন চক্রবর্তী আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "কবি গানের প্রতি শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রবাবু যেরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অনেকেরই নিকট পীড়াদায়ক হইবে।" পরে আরো দু'কদম অগ্রসর হয়ে উপসংহারে তিনি বলেন, "কবি সম্রাটের এই আদেশবাণী আমরা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলাম না। এই অপরাধে যে দণ্ডের ব্যবস্থা হয় তাহা তিনি করিবেন।"

দীনেশচন্দ্র সেনের বিনীত ও প্রত্যয়দীপ্ত বক্তব্যের পরেও কবিগান সম্পর্কে কবিগুরুর অভিমতটি অদ্যাবধি বিদগ্ধ সমাজের অভিমত হিসেবে টিকে রয়েছে। উল্লেখ্য যে কবিগান সম্পর্কে এ মন্তব্য কবিগুরু করেছিলেন কোলকাতাকেন্দ্রিক তথা পশ্চিমবঙ্গীয় কবিওয়ালাদের সম্পর্কে। তাদের গবেষণা গোঁজলা গুঁই, লালু-নন্দলাল, হরুঠাকুর, রামবসু ভোলা ময়রা, এন্টনী ফিরিঙ্গী প্রমুখ কোলকাতাকেন্দ্রিক কবিয়ালদের সম্পর্কে একদেশদর্শী ছিল। বাংলাদেশের অপর অংশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তখন তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন। অথচ পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের কবিয়াল গানের প্রতিভাও কীর্তি তাদের সমগোত্রীয়দের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে বর্তমান বাংলাদেশের কবিগান অনেক দিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্য ও ভাবগাম্ভির্য মণ্ডিত ছিল। ১৯৭৮ সনের মার্চ মাসে জেলা বোর্ড ময়মনসিংহ প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পুস্তকের 'কবিগান ও কবিয়াল' অংশে স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গবেষক যতীন সরকার পূর্ব বাংলার কবিগানের এই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাববৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছেন এইভাবে, "অনেক পরে

একাডেমিক আলোচনা ও গবেষণায় কবিগান ও কবিয়ালদের যথার্থ ভূমিকা নির্দেশের একটা প্রয়াস দেখা দেয় বটে কিন্তু সেখানেও একদেশদর্শীতার অবসান ঘটে না। গবেষকগণ কলকাতাকেন্দ্রিক বা পশ্চিমবঙ্গীয় কবিয়ালদের সম্পর্কেই তাদের গবেষণাকে সীমিত রাখেন। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের কবিয়ালদের সম্পর্কে উল্লেখমাত্রও তাদের গবেষণাকর্মে লক্ষিত হয় না। অথচ পূর্ব বঙ্গে কবিগানের ধারা বহুদিন ধরে প্রবহমান, এ-অঞ্চলের কবিয়ালগণের প্রতিভা ও কৃতী তাঁদের পশ্চিমবঙ্গীয় সমগোত্রীয়দের তুলনায় কোনো অংশেই নতুন নয়। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) কবিগান অনেক দিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত; এ অঞ্চলের কবিগানের ধারাটি মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে এলেও একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি তখনও। বরং এ অঞ্চলের কবিগানই প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন নতুন পথ কেটে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে, শাস্ত্র বা পৌরাণিক উপাখ্যানের ধূসর জগতের বদলে আশ্রয় করেছে সমকালীন জগত ও জীবনে। চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীলের আবির্ভাবে কবিগানের ক্ষেত্রে এক তীব্র সমাজ-চেতন বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজিত, রমেশ শীল এর শিষ্য ও উত্তর সূরীদের হাতে লোক সাহিত্যের এ মাধ্যমটির নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রম-উন্মোচিত।"

পূর্ববঙ্গের কবিগানের প্রতি সাহিত্য গবেষকগণ উদাসীন থাকার প্রধান কারণ সম্ভবত কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংকলিত কবিয়ালদের জীবনী সংগ্রহ পাঠ করলে এমন একটা প্রতীতি জন্মে যায় যে কবিগান মূলত পশ্চিম বাংলার নদীয়া শান্তিপুরের এবং এর উৎকর্ষের স্থল হচ্ছে পলাশী যুদ্ধোত্তর কোলকাতা। কোলকাতাকেন্দ্রিক কবিগানের উৎকর্ষতার সময় নির্দেশ করতে গিয়ে ডক্টর সুশীল কুমার দে তার 'Bengali Literature in the 19th Centiry' গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা হলো : "The existance of Kabisongs may be traced to the begining of the 18th Century or even beyond it to the 17th but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760-1830." ১৮৩০-এর পর বড়জোর ত্রিশ বছর সময়েই কবিগানের উৎকর্ষতার ধারাবাহিকতা কমে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে তার সুচিন্তিত মতামত : "The Kabi Poetry, there fore, covers roughly the long stretch of a century from 1760 to 1860, although after 1830 all the greater Kabiwalas one by one had passed away and Kabi poetry had rapidly diclined in the hands of their less gifted followers." বাংলাদেশের কবিগানের বিবর্তন ধারা লক্ষ্য করলে কোন গবেষকই ডক্টর দে'র অভিমতটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবেন না। ড. দে কিংবা তার উত্তরসুরিরা বাংলাদেশের কবিওয়ালাদের উৎকর্ষতা ও কবিগানের সুবিশাল ভাণ্ডারের প্রতি একেবারে মুদিতদৃষ্টি ছিলেন। তাই কোলকাতাকেন্দ্রিক গবেষকরা বাংলাদেশের কবিগানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বা এর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব করে তুলতে পারেননি। 'ঊনবিংশ শতাব্দির কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে নিরজন চক্রবর্তীর কবিগান সম্পর্কে যে আলোচনা তাও ত্রুটিপূর্ণ ও খণ্ডিত রূপ। তবে বিদগ্ধ গবেষকগণ যে যা-ই করুন, একাডেমিক পরিমন্ডলের বাইরে অবস্থান নিয়েও বাংলাদেশের কবিওয়ালা ও কবিগান রসিক অনেকেই এ অঞ্চলের কবিগানের পরিচয় তুলে ধরার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হরিচরণ আচার্যের 'বঙ্গের কবির লড়াই' গ্রন্থে তার জীবদ্দশায় যেসব কবির লড়াইয়ে নিজে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন বা উপভোক্তা হিসবে রসাস্বাদন করেছেন

সেসবের খন্ডকালীন বিবরন তুলে ধরেছেন। তার 'কবির ঝংকার' নামক দুই খণ্ডের একটি বইয়েও তিনি অনেকগুলো কবিগান প্রকাশ করেছেন। তার উভয় গ্রন্থেই পূর্ববঙ্গের প্রসঙ্গই উত্থাপিত। কোলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের সাথে এ অঞ্চলের কবিয়ালদের প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্রের উল্লেখ নাই। এ দেশের কবিগানের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষীণ ও পরোক্ষ যোগসূত্র থাকলেও পূর্ববঙ্গে কবিগানের একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ধারা বিদ্যমান ছিল। কেদার নাথ মজুমদার সম্পাদিত ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় ১৩২১ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বিজয় নারায়ণ আচার্য কবিগান ও কবিয়াল সম্পর্কে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। এ লেখাগুলো থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিগান ও কবিয়াল সম্পর্কে একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে মনোরঞ্জন চৌধুরী ও চন্দ্র কুমার দেও 'সৌরভ' পত্রিকাতে প্রকাশিত দু'একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এই এলাকার কবিওয়ালাদের সম্পর্কে। চন্দ্রকুমার দে'র দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপেন্দ্র কিশোর সেনও কবিগান সংগ্রহ করে তা সৌরভ পত্রিকায় ছাপিয়েছেন এই একই সময়ে অর্থাৎ ১৩২১-১৩২৩ বঙ্গাব্দে। সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশিত এ প্রবন্ধগুলো হচ্ছে :

(১) চন্দ্রকুমার দে— মালীর যোগান—সৌরভ, বৈশাখ ১৩২১।

[ময়মনসিংহের দাশুরায় ও রামগতি সম্পর্কে প্রবন্ধ, লেখক চন্দ্র কুমার দে, সৌরভ, ১৩২১]

(২) বিজয় নারায়ণ আচার্য —রামগতির টপ্পা—সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

(৩) বিজয় নারায়ণ আচার্য —রামু সরকার—সৌরভ, মাঘ, ১৩২১।

(৪) উপেন্দ্র কিশোর সোম— কবিগান সংগ্রহ সৌরভ, চৈত্র, ১৩২১।

(৫) বিজয় নারায়ণ আচার্য— তিনটি টপ্পা, সৌরভ, আষাঢ়, ১৩২২।

(৬) মনোরঞ্জন চৌধুরী অন্ধ কবিওয়ালা তারাচাঁদ— সৌরভ, শ্রাবণ, ১৩২২।

(৭) বিজয় নারায়ণ আচার্য—ভক্ত কবি লাল মামুদ—সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৩।

(৮) বিজয় নারায়ণ আচার্য ময়মনসিংহের কবিগান— সৌরভ, আষাঢ়, ১৩২৩।

(৯) বিজয় নারায়ণ আচার্য—ভক্ত কবি কানাই বলাই— সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

চন্দ্রকুমার দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও বিজয় নারায়ণ আচার্যের এ সকল প্রবন্ধ থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিগান ও কবিওয়ালাদের সম্পর্কে একটি তথ্য-চিত্র পাওয়া যায়। এর বহু পরে চট্টগ্রামের বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দাস দস্তিদার চট্টগ্রামের বিখ্যাত লোক কবি রমেশ শীলের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখেন ১৯৬৩ সনে। পূর্ণেন্দু দাস দস্তিদারের এই বইটিতে রমেশ শীলের মধ্যে যে পূর্ববাংলার কবিগানের বৈপ্লবিক পরিণতির রূপটি ফুটে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ও রওশন ইজদানীর গ্রন্থ 'মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য', বাংলা একাডেমী ১৯৫৭, সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরীর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের লোক সংগীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী ১৯৭৩, যতীন সরকারের প্রবন্ধ 'ময়মনসিংহের কবিগান ও কবিয়াল, 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', জেলা বোর্ড মার্চ ১৯৭৮ থেকে ময়মনসিংহের ও এর আশপাশের এলাকার কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে বিস্তৃত জানার অবকাশ রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা বাংলাদেশ অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকজ-অঞ্চল বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিগান ও কবিয়ালদের একটি চিত্র আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

বৃহত্তর ময়মনসিংহে কবিগানের প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে তা নির্ণয় করা সত্যিকার অর্থেই দুরূহ। বিষয়টি নিশ্চিত করে বলার মতো কোন প্রমাণ পঞ্জিও আমাদের

হাতে নেই। ময়মনসিংহে কবিগানের শুরু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজয় নারায়ণ আচার্য ১৩২৩ সনের আষাঢ় মাসে 'সৌরভ' পত্রিকায় বলেন: ... "অনেকে অনুমান করেন যে ময়মনসিংহের বোরগ্রাম নিবাসী প্রখ্যাত কবি নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনষার ভাসান' রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতেই এ স্থানে কবি গানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। দুই চারিটি প্রাচীন কবি গানের ভাষা ও পদ্মাপুরাণের ভাষার সাদৃশ্য দর্শনে কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, 'ময়মনসিংহের কবিগান পদ্মাপুরাণের সমবয়স্ক, সে যাহা হউক, কবিগান যে বহু পূর্বকাল হইতেই ময়মনসিংহে প্রচলিত হইয়াছে এ কথায় আর সন্দেহ নাই।" নারায়ন দেবের জীবতকাল ষোড়শ শতাব্দি। তিনি আনুমানিক ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৫৫০-৬০ খৃষ্টাব্দে পদ্মাপুরাণ ও মনষার ভাসান রচনা করেছিলেন। যদি কবিগান তার কিছু পূর্বেই শুরু হয়ে থাকে তবে বৃহত্তর ময়মনসিংহে কবিগানের প্রচলন শুরু হয়েছিল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে। সে হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা কোলকাতায় কবিগান শুরু হওয়ার অনেক আগেই এ অঞ্চলে কবির প্রচলন শুরু হয়েছিল। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বিজয় নারায়ন যখন এ প্রবন্ধ লিখেন তখন তার বয়স ষাট। তিনি আনুমানিক ১২৬৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহন করে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরন করেন। বিজয় নারায়ন ১৩২৩ সনে মন্তব্য করেন : "যখন এন্টুনী সাহেব বিলাতী গলায় কবিগানের চেতান ধরিয়াছিলেন, যখন সীতানাথ চক্রবর্তী ভোলা ময়রা, হরিদাস বৈরাগী প্রভৃতি কবিগণ কলিকাতা শহরে কবিগানের তুফান তুলিয়াছিলেন, যখন ঢাকা জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে দিবা-রাত্রি কবির আখড়াই বাজিত, তখন ময়মনসিংহের প্রায় সকল বাজার, বন্দর এবং পল্লী গ্রামের স্থানে স্থানে কবিগানের আনন্দস্রোত খুব সজোরে বহিতেছিল। আমি ছোটবেলায় প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে কবিগান সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহারা বৃদ্ধমুখে কবিকথা অনেক শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব কবিগান যে ময়মনসিংহের একটি পূর্বতন সংগীতসম্পদ এ কথার দ্বিরুক্তি নাই।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এমনকি বর্তমান বাংলাদেশে কবিগানের প্রচলন হয়েছিল এটি সত্য নয়। কোলকাতার পশ্চাদভূমি হিসাবে নয় বরং কোলকাতার পূর্বসূরি হিসাবেই এতদাঞ্চলে কবি গানের প্রচলন শুরু হয়েছিল মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কবিগানের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ এলাকায়। এ অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রা ছিল অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ । নদ-নদী হাওর-বাঁওর পরিবেষ্টিত উর্বরা কৃষিভূমি এ অঞ্চলের জনগনকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এখানে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট গড়ে ওঠেনি— গড়ে ওঠেনি আধুনিক জীবন যাপন প্রণালীও। সে হিসাবে বাইরের কোন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। নারায়ন দেব, দ্বিজবংশী দাস থেকে মনসুর বয়াতী পর্যন্ত পল্লী কবিরা তাদের চতুর্পাশ্বে একান্ত লোকজ-পরিমণ্ডল থেকেই তাদের কাব্যের উপাদান, কাহিনী, ঐতিহ্য ও কলাবিধি গ্রহণ করেছেন। এগুলো একান্তভাবে ময়মনসিংহের নিজস্ব পটভূমি। বিংশ শতকের তিন চার দশক পর্যন্ত এদের সাধনার ধারার খরস্রোত সমভাবেই প্রবহমান ছিল। এ ধারার স্বাভাবিক পরিণতিতেই এতদঅঞ্চলে কবিগান ও কবিয়ালদের উদ্ভব। হঠাৎ করেই বাইরের সাংস্কৃতিক ধারার একটি খরস্রোত এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়নি।

কবি গানের প্রাত্যহিক নিয়মাবলী আলোচনা করতে গিয়ে প্রাগোক্ত প্রবন্ধে বিজয় নারায়ন সরকার (আচার্য) বলেন, "উদ্ভব কালে বর্তমান সময়ের মত ঢোল-কাশী সংযোগে কবি গান

করা হইত না। তখন খোল, করতাল আর বেহালার প্রচলন ছিল। এখনকার মত তখন কবিগানে ছড়া পাঁচালি এত অধিক মাত্রায় হইত না। কেবল দলের বিশ্রামের জন্য দু'চার কথা বলা হইত মাত্র। এখন যেমন কথার কাটাকাটি হয়, চালাকি চাতুরি প্রদর্শন করা হয়— কৌশলপূর্ণ উত্তর করিয়া 'বাহবা' লওয়া হয় তখন তা না হইয়া কেবল গান, গানের জওয়াব, টপ্পা, টপ্পার জওয়াব হইত। ইহাতেই কবিগানের কৃতিত্ব প্রকাশের স্থল বহু-বিস্তৃত ছিল।" বিজয় নারায়ন আচার্যের এ বক্তব্য ময়মনসিংহের কবিগান সম্পর্কে ষোলআনাই ঠিক। উদ্ভব থেকে পরিণতি পর্যন্ত সব সময়ই এ অঞ্চলের কবিগান ছিল আবহমানকালের লোকজ-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই দৃঢ়মূল। তাই অধ্যাপক যতীন সরকার বলেন, "তাই রবীন্দ্রনাথ যে কবিগান সম্পর্কে বলেছেন 'ইহা এক নূতন সামগ্রী'—তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া চলে না; এবং 'বাংলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান'-এর স্থান অন্তত ময়মনসিংহের কবি গানের ক্ষেত্রে নির্দেশ করা চলে না।"

বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিগান ছিল বিশুদ্ধ কবিগান। খেউর, আখড়াই, দাঁড়া কবি, হাফ-আখড়াই ও কবি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের কবিগান পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গের অপরাপর অঞ্চলসহ ময়মনসিংহে এসব প্রকারের কোন গান হতো না। তবে 'দাঁড়া কবি গানের প্রচলন ছিল। এ তো বিশুদ্ধ কবিগানেরই আওতায় পড়ে। অনেকে 'দাঁড়া কবি' গানের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'দাঁড়িয়ে এ গান গাওয়া হয়' বলে একে 'দাঁড়া কবি' গান বলেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন, তিনি বলেন, "পাঁচালি যেমন পা-চালি থেকে হয়নি 'দাঁড়া কবি'ও তেমনি 'দাঁড়ানো' থেকে আসেনি। 'দাঁড়া' শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল আদর্শ বাঁধাধরা যা ছিল আরবি 'তরজা' শব্দের মূল অর্থ। সে গানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধরাবাঁধা পালা বা গান ছিল তাকেই বলা হতো 'দাঁড়াকবি'। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিত মতো রচনা করা হতো তাকে বলত সাধারণ কবি বা 'কবিগান'। কবিগানের প্রত্যুৎপন্ন বা Extempore পদ্ধতি চলতো বলেই পূর্বতন পদ্ধতি 'দাড়াকবি' নামে পরিচিত হয়েছিল। উত্তর-প্রত্যুত্তর কবিগানের সর্বস্ব। উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোন কোন গানে আদিরসের আধিক্য এনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করা হলে সেই গানকে বলতো 'খেউর' অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে শান্তিপুর অঞ্চলের কবিগান বিশেষ করে 'খেউর' গান বলে বিখ্যাত হয়েছিল একথা ভারত চন্দ্রের উক্তি হতে জানা যায়।" তবে ময়মনসিংহে তথা পূর্ববঙ্গে 'খেউর' নামে কোন কিছুর প্রচলন ছিল না। ডক্টর সুকুমার সেন অন্যত্র বলেন, "কবিগানের বিশেষত্ব হইতেছে দুইদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। একদল যে বিষয়ের গান (চাপান) গাহিবে সে গান শেষ হইলে অপর দল তাহার গান (উতোর) গাহিবে। শেষ পর্যন্ত গানের বাঁধুনিতে এবং গাহনাতে যে দল উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন হইবে তাহারা বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করিবে।" সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী ময়মনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গের কবি গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, "বিশুদ্ধ কবিগান পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক কিংবা সাময়িক কোন ঘটনা বা বিষয় (রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, কৃষি, ব্যক্তি বিশেষের জীবনকথা) লইয়া সভাতেই বিরচিত ও গীত হইয়া থাকে।" নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য বলেন, "বহু প্রাচীনকাল হইতে পূর্ববঙ্গের কবিগণ নিজ নিজ দল নিয়া কবি গানে প্রতিপক্ষের সহিত জবাব, টপ্পা, লহর, ও ছড়া কাটাকাটি উভয়পক্ষে হইত বলিয়া ইহার নাম 'কবির লড়াই' হইয়াছে। কবির লড়াইয়ে দুই প্রতিপক্ষ কবি দুটো ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ান। যেমন একজন 'রাম' হলে অন্যজন হবে 'রাবন'। তারা পরস্পর বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে মারবে।

এভাবে হবে দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াই।" এ ছাড়া ও রাধা-কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন, হানিফা-সোনাভান, এজিদ হোসেন ইত্যাদি পালায়ও লড়াই হতে দেখা যায়। অতি আধুনিক কালে নারী-পুরুষ সত্য-মিথ্যা, ধনী-দরিদ্র, মহাজন-খাতক, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, বুর্জোয়া সাহিত্য গণসাহিত্য এর লড়াই পর্যন্ত কবি গানের আসরে তুলে এনেছেন চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল ও তার অনুসারীবর্গ।

কবিগানের কবিয়ালকে সরকার বলা হয়। তার সাথে থাকেন সহকারী, স্মারক, গায়ক, ঢোলী, করতাল বাদক, বেহালা বাদকসহ আরোও অনেকে। বিশুদ্ধ কবিগান ছাড়া রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সখী সংবাদও কবিগানেরই অংশ। ডাক, মালসী, ভোর, গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, দর্শন, সখী সংবাদ, অভিসার, বিরহ, মিলন, সম্ভোগ, মাথুর, অভিমান ইত্যাদি হচ্ছে সখীসংবাদের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ। কবিগান নির্দিষ্ট তাল, মান, তান ও লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী সেগুলো নির্দেশ করেছেন এইভাবে : "কবিগানের নির্দিষ্ট তাল, মান, লয় ও ছন্দ আছে। ইহার পদ বিন্যাসের মাত্রা নির্দিষ্ট। প্রায় প্রত্যেক আসরেই দেখা যায় চারিটি কলিতে প্রত্যেক গান রচিত হয়। কলি চারিটি এই : ধুয়া, অন্তরা, চিতান ও পরচিতান। বিশুদ্ধ কবি গান 'কেঁকী' তালে গাওয়া হয়। সখী-সংবাদের প্রথম কিতান মাত্রই 'কেকী'। ইহার পরবর্তী সুর সরল ও সহজ।" বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপন, সুর, রাগিনী ও কলাবিধি সকল দিক দিয়েই পূর্ববঙ্গের কবিগান স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ময়মনসিংহের কবি গানও এই পূর্ববঙ্গীয় স্বাতন্ত্রকেই অঙ্গে ধারন করে বৈশিষ্টমন্ডিত হয়েছে।

কবিয়াল বিজয় নারায়ন আচার্যের উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক যতীন সরকার মহোদয় ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকের ময়মনসিংহের কতিপয় বিখ্যাত কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন : আমতলার লোচন কর্মকার, চারাগাতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাঁদপুরের চণ্ডী প্রসাদ ঘোষ, দুর্গা প্রসাদ ঘোষ, দগদগার কানাইনাথ ও বলাইনাথ, ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণনাথ, সত্রশিরের ছাড়ু নাথ, কাশিপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কাপালী। উনিশ শতকের শেষ দিকের কবিয়ালদের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিচরণের পুস্তকের ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ময়মনসিংহের বিখ্যাত কয়জন কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িককালে এদেরকে একত্রে 'পঞ্চরাম' বলে ডাকা হতো। এদের নামের আদি শব্দটি রাম বলেই এদেরকে সম্মিলিতভাবে 'পঞ্চরাম' বলা হতো। এঁরা হলেন : রামু, রামগতি, রামকানাই, 'রামজয় ও রাম সুন্দর। রামজয় ও রামসুন্দর নামে কবিয়ালদের সম্পর্কে তেমন কোন খবর সংগ্রহ করা যায়নি। তবে রামু, রামগতি ও রামকানাই— এই তিনই 'কবির সানাই'— এমন কথা পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে শুনা যেত। এদের কিছু পরে কবিয়াল হিসাবে অবতীর্ণ হন ১৮৮০-১৮৯৯ সনের মধ্যে শম্ভুজেলে, কালীচরণ দে, পরান কর্মকার, রামদয়াল নাথ, হরচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দ আচার্য, কৃষ্ণমোহন মালী, কৃষ্ণ চন্দ্র দে প্রমুখ কবিয়াল। বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশক যারা এ অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন তাদের মধ্যে বেতাটি গ্রামের কালী কুমার ধর, হাপানিয়ার সাধু শেখ, গোবিন্দপুরের ঈষান দত্ত, সিংহের বাংলা গ্রামের বিজয় নারায়ন আচার্য, বিরুনিয়ার হরিহর আচার্য, ও ভাঁট গায়ের ঈশান নাথ। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কবি গানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন ঝাউতলা গ্রামের মধু শেখ, সিংহের বাংলার মদন আচার্য, ত্রিমোহনীর ক্ষেত্রমোহন শীল, ইছাপুর বোয়ালীর কালীকুমার দাস, সাকুরাইর উপেন্দ্র সরকার, পলাশকান্দার ইন্দ্রমোহন সরকার, সূর্যমোহন সরকার, ভোলার চরের উমেদ আলী, নারায়ন

পট্টির চান কিশোর সূত্রধর। পাকিস্তানি আমলের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বেশ ক'জন বাউল শিল্পীর মধ্যে কবিগানের চর্চা করতে দেখা যায়। ও সময় কবিয়াল গানের একেবারে শেষ পর্যায়ের অন্তিম সময়। এদের মধ্যে, আলী হোসেন, প্রভাত কানা, আবেদ আলী, আবদুল খালেক, মধু শেখ, মদন আচার্য ও ফকির উমেদ আলী প্রধান। এদের অনেকেই একাধারে বাউল ও অন্যধারে কবিয়ালও ছিলেন। মধু শেখ ও মদন আচার্য অবশ্য মূলত কবি গানই গাইতেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আবুল, ফয়েজ উদ্দিন ও ব্রজেন্দ্র সরকারকে কবি গান গাইতে দেখা গেছে। তবে ভাব ও বিষয় বৈচিত্র্যে এদের কবিগান তেমন মানসম্পন্ন ছিল না।

হালখাতা, পুণ্যাহ্, পূজো পার্বণ কিংবা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরাই কবি গানের আসর বসাতেন। আর সবাই সে গানের রসাস্বাদন করতেন। হালখাতা ও পুন্যাহে মহাজনের বাকি আদায়ও হতো প্রচুর। অনেক সময় গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলেও কবি গানের আসর বসাতেন। নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার অধীন চন্দনকান্দি গ্রামের তালুকদার সূর্যকান্ত চৌধুরী ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কবি গানের বিশিষ্ট সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার মৃত্যুতে কবিয়াল তারাচাঁদ যে শোকগাথাটি লিখেছিলেন তাতে বেশ কয়েকজন নামজাদা কবিয়ালের কথা উল্লেখ আছে ঃ

এলোকে গণ্যমান্য ধন্য ছিল কবি সে রামগতি সরকার।
তারপরে ঐ রামু সরকার এই বঙ্গদেশে উড়াচ্ছে বাহার ॥
ওঁদের কবিত্ব গুণ ছিল ভারি নামজারি দেশ বিদেশে হয়।
মঙ্গল সিধের চন্দ্রনাথ চৌধুরী
হারাইল বিশ্বাস চাইরগাতিয়া বাড়ি
ছিল কবির জহুরী আইজও লোকে কয়॥
যেমন কালিদাস বরুচের প্রায় রামু রামগতি।
কেবল আছে মাত্র রামু সরকার
আইজও চলে কবির কাজ॥
বাবু সূর্যকান্তের জীবনান্তে এককালে ডুবলো কবির জাহাজ।
ছিল হরেকৃষ্ণ, ছিল রামকানাই
পরান মরেছে রামগতি ও নাই, গুধনী আর নাই।
ইচ্ছা হয় আমিও মরে যাই, ভবে রাখলে কেন ধর্মরাজ ॥
বাবু সূর্যকান্তের জীবনান্দে এককালে ডুবল কবির জাহাজ।
আপশোষে হায় মরি, কি করি, আর যাই না লোক সমাজ ॥
দেশে হয় না গুণী একটা প্রাণী, এদেশে আর গুণী হবে না।
বিজয় ঠাকুর সরকার হইল, একরকম মন্দ না ভালো।
কালি সরকার শম্ভুজালো ইহাদের সরকার বলি না।
ইহাদের সরকার বললে চামচরাকেও পাখী বলতে হয়!
এখন তারাচান্দে বইস্যা কান্দে
বাঁইচ্যা থাইক্যা হইল লাজ
বাবু সূর্যকান্তের জীবনান্তে এককালে ডুবল কবির জাহাজ ॥

কবিয়াল রামগতি সরকার নিজে ছিলেন নাপিত। তার প্রতিপক্ষ পরান কর্মকার ছিলেন

কামার। পরান কর্মকারকে বিদ্রূপ করে রামগতি গাইলেন :

আসানপুর সালুক বাড়িতে গান।
বিজয়ের সঙ্গে পাল্লায় পইড়্যা, পরানের যায় দাঁত ভাঙ্গা।
কামার কখনও ভদ্র নয় আসলে পুঙ্গা॥
কাঠের কামরা মইষের চামড়া নকশা দুই রঙ্গা ॥
তার মধ্যে দিয়া ভাঙ্গা
উপরের বিন্ধে বাতাস বান্ধে নিচের বিন্ধে দুই চোঙ্গা
কামার কখন ও ভদ্র নয় ভদ্র নয় আসলে পুঙ্গা॥

অন্ধ কবিয়াল তারাচাঁদ তার প্রতিপক্ষ কুটীশ্বর পাল তেলী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গায় :

আমের গুড়ি বেলের মুথাড়ি উপরে তার জড়ি মাকড়ি!
লম্বা তক্তা উপরে পাথর করছে ঘুরাঘুরি
পালের পুত বড়াই কর কি?
এক ছটাক তেল কম হইলে বুড়া তেলী-এ চোখ ঘুরায়।
হইল না টাক পোনের ছটাক
পালের পুত আর চারটা পাঁক ঘুইর‌্যা আয়।
ফাটা চুঙ্গির মধ্যে দিয়া ঝিরঝিরায়া তেল চূয়ায়।
হইল না টাক পোনের ছটাক
পালের পুত আর চারটা পাঁক ঘুইর‌্যা আয়॥

যুগী বা তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত রামকানাই নাথকে লক্ষ্য করে রামগতি গেয়েছিলেনঃ—

যুগী কখনও হিন্দু নয় তার সন্দেহ কি আছে ॥
মহারানীর আমলে, মিলে সব যুগীর দলে
দরখাস্ত লেখে কোম্পানীর কাছে।
পাঁচশ টাকা নজর দিয়া যুগী পোড়ার সনদ লয়
হইল না যোগীপোড়া দেশ দেশে আছে পরিচয়।
সুতার পাড়ার রামদল কাইট্যা দিল চিতাশাল
আগুন দিতে কয়।
গইর দিয়া শালা পইড়া গেল আর কি যুগী পোড়া হয়।
হইল না যুগী পোড়া দেশ জুড়িয়া আছে পরিচয়॥

ব্রাহ্মণ বংশীয় ভগবান আচার্য রামকানাই নাথকে যখন বললেন :

যুগী জাতের মরণ বড় নটখটি
এই যুগী জাত মরলে পরে তেছরা করে দেয় মাটি॥

তখন এর উত্তরে রাম কানাই সরল গদ্যে বললেন, 'ঠাকুর দুই বছরের কম বয়স্ক কোন ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেলেও তাকে দাহ না করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। তাহলে সেই ছেলের জন্মদাতা কি আমাদের যুগী জাতের লোক, না তোমাদের ব্রাহ্মণ?

রামগতি নিজে নাপিত হলেও একবার তার প্রতিপক্ষ পরান কর্মকার যিনি ছিলেন জাতে সূত্রধর তার ওপর প্রতিশোধ নিলেন :

নাপিত ধোবা সভার শোভা মর্ম কেবা জানে তার।
গোয়াল বাইন্যা কামারের নিচ্ছুন, কাঠকাটা সুতার ॥

গোয়াল বাইন্যা কামারে চাইর আনি চুরি করে ব্যক্ত ত্রিসংসারে
সুতার বাড়ি কাঠ দিলে তুলে মূলে পায়না আর ॥

জেলে সম্প্রদায়ের শম্ভু সরকারকে রামগতি আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত এক কবি গানে বলেন,

আজগুবি এক কাব্য কথা মন দিয়া শুন সে সকল।
মরি হায়রে আষাঢ়ে নতুন জলে, শিং মাগুর কই কাতলে
বেধেছে একদল।
মইন্যা পুটা খাদে ছুটা গজার আর মাগটে খায় মূলতানে।
চান্দা ছেলা ইছা মুঙ্গিয়া মলা খইলসা
আর চিতল চিতানে।
বোয়াল লাড়ী বাইম লেডি পাইব্যা, এই কয়ডা মইল ভাইব্যা
ধরবে কোন স্থানে।
দলের নাটুয়া কড়ি কাটুয়া
মরা চাটুয়া কাছিম মাঝখানে ॥

একবার এক শাখারী কবিয়াল প্রতিপক্ষ কবিয়ালকে ধুমকেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন—

বিদ্যাবুদ্ধির ধার ধারিসনে শুধুই জানিস ফছকামি।
তারা হতে ধোঁয়া বেরয় বলতো তাহার কারণ কী ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কীয় এ প্রশ্নের উত্তর না জেনে ও শাঁখারীকে উত্তর দিলেন চটপট প্রতিপক্ষ কবিয়াল :

যার রবে দেবতা তুষ্ট তারে কেটে করিস ক্ষয়
সেই পাপেতে আকাশেতে ধূম্রলোচন উদয় হয়।

কবিয়াল বিজয় নারায়ন আচার্যের বন্দনা :

সভা কইরা বইছুইন যত হিন্দু-মোছলমান।
সবার উদ্দিশ্যে আমার হাজার ছালাম ॥
ভক্তি ভাজন জমিদার নরের প্রধান।
তাঁহাদের চরনে শ্রদ্ধা হাজার সম্মান ॥

রামু মালীর রাজ বন্দনা : 'রাজাধিরাজ মহারাজ অবতার।

বড় বাঞ্ছা করে এসেছি চরণ দেখবার তরে
বর্ণিবারে সাধ্য কি আমার॥
যেমন ইন্দ্রপুরী, তেমনি মহারাজের বাড়ি
অমরাবতি সমান।
কত নৃত্য গীত গান হচ্ছে অবিরাম ॥
স্থাপিত আছেন দশভূজা বাহির বাড়ি দুর্গাপূজা
ত্রেতায় যেমন শ্রীরাম রাজা, তেমনি হয় আমার জ্ঞান।
ধর্মেতে যুধিষ্ঠির তুল্য চন্দ্র তুল্য রূপ,
আমি মূঢ়ে কি বলিব রূপে গুণে নাই তুলনা
গোলকের নাথ গোলক ছেড়ে রাজকুলেতে দুর্গা পুরে
এক অংশে জন্মিল চার জনা।

দানে বটেন মহাদানী মানে বটেন মহামানী
এ জগতে নৃপমণি আমি আর এমন হেরিনা।
পাত্রমিত্র সঙ্গে লয়ে করেন মন্ত্রণা,
আছে নহবত খানা তার দক্ষিনে নায়েবের থানা
বাগানের কাছে আনন্দ বাজার আছে
বড় পুস্করিনীর উত্তর পাড়ে আমলাপট্টি শোভা করে
বাসের দালান পশ্চিম পারে আজব কারখানা ॥

কবিয়াল অন্ধ তারাচাঁদ একবার গৌরীপুরের জমিদার বাড়ি যেতে চাইলে দারোয়ান দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপর জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সান্ধ্য ভ্রমণ কালে তাঁর কাছে গানের ভাষায় তারা চাঁদ আবেদন জানিয়েছিলেন :

দু'তালা বালাখানা দুয়ারে রাজপুরের থানা
ভিখারীর যাইতে মানা বাঘার আছে ডর।
আমি দীনহীন দরিদ্র নরের ভূপতি বৈ গতি নাই,
মহারাজ নরপতি, দয়ামতি, আমি চক্ষুহীন নরের গতি চাই ॥
আমি লক্ষ টাকা কর্জ কইরা ভবের হাটে আই।
হইল না মোর হাট বাজার আসতে পথে দিন কাবার,
বিকি কিনি নাই।
হিসাব কিতাব কইরা দেখি আসলে নব্বই হাজারই নাই।
দশ হাজারে কেমন কইরা দেনা হইতে মুক্তি পাই ॥
মহারাজ নরপতি, অধমের গতি আমি চক্ষুহীন নরের গতি চাই ॥

একবার গৌরীপুরের জমিদার বাড়ি কবিয়ালরা গাঁইতে গিয়েছিলেন, তাদের জন্য কোন বিছানা নেই। গান হবে বিজয় ঠাকুর আর রামু মালীতে। বিজয় ঠাকুর গাইলেন,

গৌরীপুরের মহারাজ, স্বনাম ধন্য তাহার কাজ।
সব ঠাঁই তিনি সম্মানিত, সকল কাজ তার গুণকৃত।
খালি মাঠে আকাশ তলে, গান গায় সদা কবির দলে
সামিয়ানার দরকার কি? বিছানা দিলে দোষ কি?
সম্মানীরা অপর লোকে, সম্মান করে অতি সুখে।
মহারাজ তো সম্মানী, বিছানা দিতে দোষ কি?

বিজয় নারায়ণের গানে মহারাজ বিছানার ব্যবস্থা করলেন। সেই থেকে কবি গানে বিছানার ব্যবহার হয়ে আসছে। বিজয়ের এ কৃতিত্বে তার প্রতিপক্ষ রামু মালী তৎক্ষনাৎ গেয়ে উঠলেন,

বাঁইচ্যা থাক বিজয় ঠাকুর চিরজীবী হইয়া।
কবি গাইলাম গৌরীপুরে বিছানাতে বইয়া॥

আরেকবার ঈশ্বর গঞ্জের নাজির মহিম বাবু কবির দলকে আমন্ত্রণ করে এনেও গান শেষে পাওনা মিটিয়ে দিতে অযথা কালক্ষেপণ করছিলেন। কবিয়াল রামগতি তখন নাজির বাবুকে শুনিয়ে দিলেন :-

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বাবুজী নাজির।
বাবুর আজ্ঞা পেয়ে কবির দল দুখানা করিয়ে সম্বল

হুজুরেতে হয়েছি হাজির ॥
এখন লভ্য করা দূরে থাকুক দায় ঠেকেছে খোরাকী।
বিদায় দিলে দুর্গা বলে বাড়ি যেয়ে হই সুখী॥

মদন থানার ব্রাহ্মণ ভূস্বামী একবার কবিয়ালদের পাওনার চাইতে কম দিতে গিয়ে কায়দা করে বললেন—দেখো আমরা ব্রাহ্মণ মানুষ। তোমরা কবিগানে যে কবিত্ব দেখাও তা তো আমাদের আশীর্বাদের ফল। কাজেই টাকাটাকে বড়ো করে দেখো না। আমরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করবো, এতেই তোমাদের লাভ হবে অনেক বেশি।' মুসলমান কবি সাধু শেখ এর উত্তরে বললেন, দেখুন, আশির্বাদ করার জন্যে তো সারা কাইট্যাইল আর বাড়রী গ্রামে শত শত ব্রাহ্মণ রয়েছেন, তাঁদের আশীর্বাদই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আপনার আশীর্বাদ আমাদের না পেলেও চলবে কিন্তু যে টাকায় আপনার বাড়ি কবি গাওয়ার চুক্তি হয়েছে, তার চেয়ে এক পয়সা কম পেলেও আমাদের চলবে না। অতএব আশির্বাদ মুলতবি রেখে হিসাবের পাওনাটা আমাদের দিয়ে দিন। আপনাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান রেখেও আমি বলছি, আমি একজন মুসলমান। আমার দরকার মৌলভী সায়েবের আশীর্বাদ।'

কোন এক কবি গানে একবার বিজয় আচার্য রামু মালীকে বৈষ্ণব বানিয়ে ঠাট্টা করে বলেন, 'জাত মায়া সব নেড়ে বৈরাগী'। রামু এর উত্তরে বলেন,

তুমি বল্লে নাকি জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী।
জাতিকুল সেতো স্থুলের দেশের গোল
কুল কি মানে প্রেমানুরাগী?
(আমরা) রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাগরে ডুবায়েছি জাতিকুল,
পাণ্ডাঠাকুর, কূল থাকতে আর অকূলেতে কেউ পাবে না কূল।
শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি জীবমাত্র তার সন্ততী
সম্প্রতি বুঝ জাতির মূল।
তুমি দেখতে ভাল মাকালের ফল
অথবা মান্দারের ফুল॥

জাতিকুল সে তো স্থুল পৃথিবীর মানুষের সৃষ্টি। কুল কি মানে প্রেমানুরাগী?—এই প্রেমানুরাগের দুকূল প্লাবী বন্যা দিয়ে জাতিকুল ভাসিয়ে দেবার অভিপ্সাই ছিল লোক-কবিদের। সামন্ততন্ত্রের উপজ জাতিকুলের বিধানের ফাঁদে নিজেরাও পা দিয়েছেন, সে বিধানের চাপে প্রতিনিয়ত পিষ্টও হয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ববঙ্গে এমন একটা মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল যে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার বা তালুকদার না হলে কিছুতেই কূলীন হওয়া যেত না। এ মানসিকতা পল্লী বাংলায় ছিল প্রবল। সমাজের উপেক্ষিত ঘৃণিত দরিদ্র ব্যক্তিরাও কোন রকমে ধারকর্জ করে মধ্যস্বত্ব ক্রয় করে জাতে ওঠার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতো। কবিয়াল রামু মালীও তা চেয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করে ধারকর্জ করে তিনি ছোট্ট একটি তালুক কিনেছিলেন। প্রতিপক্ষ কবিয়াল রামগতি তার স্বরূপ উদ্ধার করে আসরে উঠে গাইলেন :

রামু বড় ভাগ্যবান কর্তারা শুনছেন।
বল্লে আমি দোষী হই— আসল কথা কই কৈ,
একশ টাকার তালুক কিন্যা তিনশ টাকা দেন।
হাওলাত কাওয়ালা লয় নিজের নামে দলিল হয়

মাজনরে দেয় রেন্।
দখল পায়না পচা মালী, এমন তালুক কল্ল কেন?

রামগতির বিদ্রূপাত্মক অথচ নিরেট সত্য কথার কোন সদুত্তর দিতে না পেরে রামু রামগতির মুখে বসন্তের দাগ দেখে বিদ্রূপ করলেন :

তোমার মুখ খান দেখি ডায়মন কাটা।

টপ্পা গীত :

আচ্ছা ঢকের পুরুষ, নাই কোন দোষ দেখতে চমৎকার।
কবি গাই—কত দেশ বিদেশ যাই
এমন ঢকের পুরুষ দেখি নাইকো আর ॥
ঘাড়টা মোটা, চোখটি ছোট, মাথাটা বানরের হুল।
রামুমালী কেওয়া বনে, ফুটছে গোলাপের ফুল।
হাঁড়গিলার মত দুটা পাও পেটটা যেন কুন্দা নাও
কপালের দুই দিকে নাই চুল ॥
বুকটা যেমন হুক্কার খোল।

চন্দ্রকুমার দে রামগতিকে ময়মনসিংহের 'দাশু রায়' আখ্যা দিয়াছিলেন। রামু-রামগতি ছিলেন সে সময়ের দেশের সবচেয়ে নামিদামি কবিয়াল। তাদের দুজনের তুলনা করতে গিয়ে বিজয় আচার্য লিখেছেন, "ছড়া পাঁচালীর মুখ রামুর বেশী হইলেও রামগতির টপ্পার মত এমন টপ্পা রামুর শক্তিতে সকল সময় কুলাইয়া উঠিত না। রামগতির তুলনায় রামু কষ্টকবি ছিলেন... রামু-রামগতি বসন্তের কোকিল ছিলেন। তাঁহাদের কুহু কূজনে ময়মনসিংহের কাব্য কানন সর্বদাই আনন্দ-মুখরিত থাকিত।"

চন্দনকান্দির তালুকদার কবি সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী রামু-রামগতিকে নিয়ে একটি চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন। তা এরূপ :

গোবরেতে পদ্ম ফোটে সে-তো মিথ্যা কথা না,
তা-সাক্ষাতে সব সাক্ষ্য পেলাম রামু-রামগতি দুজনা।
তারা জন্মকুলের ধর্ম ছেড়ে করেছে উত্তমেরই কাজ,
বাগদেবীর কৃপা বলে অনর্গল শাস্ত্র বলে
মাথাতে দিচ্ছে তুলে সাচ্চা জরির তাজ।
যেমন, আমড়া গাছে আম ধরেছে নিম গাছে বাদাম
যেমন ফণীর মাথায় মণি আছেন, ঝিনুকেতেও মতি হয়
ঐ রামগতি নাপিত বটে নামে বই কাজে নাপিত নয়।
লয়না সে চামড়া হাতে বেড়ায়না বড় বাজারের পথে পথে দিন রাতে
আবার গৌর বচনের মতে মতে পাঁচালিতেই ছড়া কয়।
সকলে তাই জানে দুজনে দিচ্ছে পরিচয়,
যেমন ডুমুর গাছে ফুল ফোটে না কেবল কথা মাত্রই হয়।
রামু ডুমুরের গাছে ভূঁইচাপা ফুল ফুটিয়াছে
রাম গতি প্রতি পদে চন্দ্রেরই উদয়।
যেমন পাশাপাশি দুটি তারা কালিদাস বরুচ
এসে বাংলাদেশে জংলাতে ভাই করে গেল দিগ্‌বিজয়।

রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয়॥

অন্য একদিন রামু-রামগতি যখন তার বাড়িতে কবিগানের আসরে মত্ত, তখন তাঁদের লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ও একটি সুন্দর গান রচনা করেছিলেন তাদেরই পৃষ্ঠপোষক কবি সূর্যকান্ত চৌধুরী :

হায়, আমোদে প্রমাদ ঘটায়ে বসেছি দেখ দেখি রে ভাই
রামগতি ও রামুচাঁদে পাঁচালিতে ছড়াতে লড়াই।
যেমন শান দিয়ে ক্ষুর প্রাণে হানে
(নাপিত) রামগতি করছে হাল বেহাল,
রামু (মালী) তাই শান দিয়ে চলে ঝাঁঝটের কাঁটা খুলে
রামগতির মাঝ কপালে বসাবে কোদাল॥
কেমন নরসুন্দর ভূমি সুন্দরে বিবাদ
যেমন রাক্ষসে বানরে যুদ্ধে কেউ হতে কেউ নয়রে কম
রামুচাঁদ ভাবছ কিহে, রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম।
এখন ঝকমারী কাজ গেছে হয়েছে সরকারী ইনকম।
আবার দেখ না চেয়ে যাচ্ছে গেয়ে রামগতির মুখে ক্ষুরের ধার
যায় আবার ছড়া গেয়ে চামটি দেয় রয়ে রয়ে
আড় চৌতাল বাজারে উড়াচ্ছে বাহার।
এতো মাটি কাটা নয়রে রামু, এক কাটায় কাজ হয়
তুমি পড়েছ চুল কাটার হাতে খসাবে তোর খাসা লোম,
রামচাঁদ ভাবছে কিহে রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম ॥

তারাচাঁদ ছিলেন অন্ধ। তার বয়স যখন ষোল কিংবা সতের তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরকালের মতো তার চক্ষু দুটিকে হারান। তার অন্ধত্ব নিয়ে তিনি নিজে কবি গানের আসরে এভাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরতেন।

মাগো, আমারে আনিয়া ভবে করলে আমার কি সর্বনাশ।
ভবের হাটে এ সংকটে দিলে পাঠায়ে করব বলে সুখের গৃহবাস।
তাতে অন্ধ হয়ে বন্ধ থাকায় চিন্তা হইয়াছে
ধরায় সুহৃদ-কে আছে মা আমার গো,
কেবল নামে মাত্র হই তারাচাঁদ-দিবা রাত্র রাখছ সমান,
তাতে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান—মাগো প্রাণ কেমনে বাঁচে।
দিবা নিশি থাকি বসি কর্ম জানি না
নাই সুহৃদ একজন বাঁচায় এ জীবন
ঐ চিন্তায় নিদ্রা হয় না
দুর্গে গো দিলে সবারে সম্পদ
আমার দুঃখ যে মা— চক্ষু দিলে না ॥

একবার তারাচাঁদ কার্যোপলক্ষে ফরিদপুর গিয়াছিলেন। সেখানকার থানার মুন্সী ও কনষ্টেবল তার ধূলী মলিন বস্ত্রাদি দেখে তাদেরকে 'জংলী' বলে ঠাট্টা করেছিলেন। তিনি তার জবাব দেন :

বঙ্গদেশে বাড়ি আমার, আমি 'জংলী' কেমনে হই।

বলেন মুন্সী মহাশয়, কনষ্টেবলেও কয়
এই দেশে মানুষ পাই না কই?
যেমন রাম গেছিলেন বনবাসে, ঠাট্টা করছিল রাক্ষসে
সেই দশাই ঘটেছে মোর এই দেশে
থানার এক কনষ্টেবল বুদ্ধি রাখে তিন ডবল
মরি আপশোষে।
রাং কি সোনা চিনতে পারে না
চিনবেইবা কেমনে বেহুঁশে ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার কৃষক দলের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা নিয়েও তিনি জারির সুরে একটি কবিগান রচনা করেছিলেন। গানটি পল্লী কবিদের পরিপার্শ্ব চেতনা ও কাল-চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

এই সন গৃহস্থের মন হয়ে গেল কানা।
মাগী পোলার খানাপিনা সকলের চলবে না...রে ভাই
মহাজনেরে কি বুঝাইবে রাজার খাজানা,
দিনে দিনে খোদায় বুঝি উঠাইবেন দানা।...রে ভাই
এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা হইল এমন আর দেখিনা
শাইল নিল নাইল্যা নিল সঙ্গে গেল চিনা।...রে ভাই
নাইল্যা করা গৃহস্থেরা টাকার করে বড়াই
ইংরাজ জার্মানে এখন লেগেছে লড়াই।...রে ভাই
খবরের কাগজে শুনি হইল নাকি সন্ধি
ইংরাজে বাণিজ্য করবে রাস্তা করছে বন্দি।...রে ভাই
পাট কইরা কষ্ট পাইবা পড়বে বিষম ফান্দে
সময় থাকতে ধান কর ভাই বলে তারাচান্দে।... রে ভাই।

চন্দনকান্দির তালুকদারের বড় ছেলে গিরীশচন্দ্র চৌধুরীও ছিলেন পিতার মতোই কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার। একবার তিনি রামগতি, রামু বিজয় আচার্যকে দিয়ে কবিগানের আসর বসিয়েছিলেন। গানের শেষদিকে তিনি উপস্থিত তিন কবিয়ালকে দিয়ে 'পূজোতে এক ব্রাহ্মণী তার ব্রাহ্মণের কাছে একটি শাড়ি বায়না ধরেছে এর ওপর একটি কবিগান রচনা করে তা আসরে গেয়ে শুনাতে অনুরোধ করলেন। রামগতি সঙ্গে সঙ্গেই রচনা করে গাইলেন :

আশ্বিন মাসে বঙ্গদেশে এসেছে আনন্দের জোয়ার।
মরি হায়রে যত ধনী লোকে, করতেছে মনের সুখে, সাজসজ্জা বাহার।
তাই দেখে এক নতুন বামনী বামনের কাছে শাড়ী চায়
কড়ার কাঙ্গাল বামন বাঙ্গাল, জঞ্জাল ঘটালো বিধাতায়।
দিন গেল কোন্দল করে ব্রাহ্মণ তো ক্ষুধায় মরে, রাধতে কেটা যায়।
(ব্রাহ্মণ) সন্ধ্যা বেলা পাক চড়াইল বামনী জল ঢেলে সে আগুন নিভাইল।

এরপর রামু মালীর পালা :

পূজা এলো ধুম লাগিল বাঙালির ঘরে।

সকলে, যার যেমন ভাগ্যেতে মিলে
তেমনি বেশ ভূষণ করে।
ছিল মাধু ঠাকুর দক্ষিণ পাড়া ভিক্ষা করে দিন কাটায়।
বিলাসিনী, তার বামনী অমনি নতুন শাড়ী চায়।
ঠাকুরানী রাগ করে ঠাকুরের চুলে ধরে,
ঠাকুর ধরে পায়।
মাঝে পড়ে রামুমালী দুজনের বিবাদ ভাঙ্গায়॥

সবশেষে বিজয় আচার্য গাইলেন :

পূজার বেলা কূলবালা   সকলে করছে নতুন সাজ
মরি হায়রে! একটি গরীব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর শাড়ীর কারণ
পেলেন বড় লাজ।
শাড়ীর লেগে উঠছে রেগে ব্রাহ্মণী বাঘিনীর প্রায়
গরিব ব্রাহ্মণ, মরে ভাতের কারণ, বামনী ঠেকালো তারে দায়॥
(হৈল) বকাবকি কতক্ষণ, তারপরে বাধিল রণ অম্‌নি দুজনায়
(ঠাকুরের) কাছায় ধরে গায়ের জোরে, ঠাকরানে শাড়ী আদায় করতে চায় ॥

সুগুন্ধী গ্রামে গান গাইতে যেয়ে একবার রামগতির নয় পয়সা চোরে নিয়ে যায়। তা নিয়ে রামগতির গান :

পূরাকান্দায় গান করিয়া আইলাম সুগুন্ধীয়া
মোদের মনে ছিল বাসনা, এখানে কবি করবো দুজনা
বিধির কিবা ঘটনা, দিল বেগুন দিয়া ॥
আমরা এবার গেলে, কোনোকালে, ফিরে হবে না আসা।
দুঃখেতে বুক ফেটে যায় সুগুন্ধীয়া হৈল কি চোরের বাসা।
(আছেন) ব্রাহ্মণ, শূদ্র মজুমদার— তবে কেন অবিচার আজব তামাশা।
আমার নিদ্রাকালে গাট্টি খুলে, চোরে নিল নয় পয়সা ॥

অন্য একবার রামগতির এক টাকা চৌদ্দ আনা দামের জুতা চোরে নিয়ে যায়। ঘটনার স্থান বামেশ্বর পুর। রামগতি এ ঘটনা টপ্পায় বল্লেন :

কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল।
রামু মালীর সঙ্গেতে কবি-সংগীত গাইতে
এথা এসে পেয়েছে তার ফল ॥
অকস্মাতে, এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়ল কুঁড়।
এখন আর সাবেক ধরান নাই সে বামেশ্বর পুর।
ভদ্রলোক কয়েকজন, বুদ্ধে সাধ্যে বিলক্ষণ যাদের করি জোর—
সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে কয়েকশালা জুতা চোর ॥

'এখন মঠের মাথায় পড়ল কুঁড়'-কথাটির মধ্যি দিয়ে গ্রামের মঠসদৃশ তালুকদারদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের রামগতি তার টপ্পায় প্রায়ই নানা ধরনের বিদ্রূপের প্রকাশ ঘটাতেন অনায়াসে।

একবার বয়রা-উড়া গ্রামে বিজয় আচার্য ও পরান কর্মকার কবিগান গেয়ে চলছেন।

এমন সময় রামগতি সেখানে গিয়ে হাজির। তিনি বিভিন্ন ছড়ায় টপ্পায় বিজয় আচার্য আর পরান কর্মকারের দোষ বর্ণনা করছিলেন। তা শুনে বিজয় আচার্য বললেন, 'আমি আর পরান কর্মকার বায়না পেয়ে এসেছি; আপনি যদি ভালো ও যোগ্য সরকারই হতেন, তবে আপনার বায়না নাই কেন? রামগতি এর উত্তরে গাইলেন :

তুমি বল্লে নাকি বিজয় ঠাকুর আমার বায়না নাই
তুমি বিজয় ঠাকুর গুনবান করতে পার কবিগান
স্বীকার পাইলাম ধর্ম সভার ঠাঁই ॥
উকিল মুক্তার বায়না করে বারিষ্টারে বসে খায়
বিজয় ঠাকুর, সেইজন্য কি বারিষ্টারের মান যায়?
দ্বন্দ্ব করে দুই ভেড়ী ঘৃণা করে কেশরী বসে রঙ্গ চায়।
লজ্জা করে মানের তরে সাধু যায় না চোরের ন্যায় ॥

এ বিষয়ে বিজয় নারায়ন আচার্য নিজে স্বীকার করেন, "আমি নিরপেক্ষভাবে বলিতেছি, বাস্তবিক কথাটা সত্য। উকিল মোক্তার আর বারিষ্টার—মেষ আর সিংহ এবং চোর ও সাধু যতটুকু প্রভেদ পরিলক্ষিত হবে, রামু-রামগতির সঙ্গে কবিগান সম্বন্ধে আমাদের ততদূর প্রভেদ ছিল মনে করি।"

মুসলমান কবিয়াল লাল মামুদ ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রকাশ। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে কবি গান গাইতে গিয়ে যে অত্যাশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক লোক-চৈতন্য প্রকাশ করেছিলেন তা সকলকে চমৎকৃত করে। সেন বাড়ির জমিদার বিজয় সেনের বাড়িতে তিনি গাইলেন :

প্রভো, বিশ্ব মূলাধার,
অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার।
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥
কেহ তোমায় বলে কালি, কেহ বলে রনমালী
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমায় ডাকে সারংসার॥
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পর॥
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বাঁধো ভক্তি ডোরে
তোমারে টানে অনিবার,
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার।
হিন্দু কিংবা হউক মুসলমান, তোমার পক্ষে সবই সমান
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চামার ॥

উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক সংলাপে কবিগানে নাটকীয়তা অপূর্ব। একবার তারাচাঁদ ও গোবিন্দ আচার্য কুটিলা ও রাধার ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণ হন। তারাচাঁদ কুটিলার ভূমিকায় বললেন—

বউ তোমারে নিষেধ করি যাসনে যমুনায়
আজ গোপের এক পোলা, সেই কদম তলায়॥
আছে দুই বেলায় থাকে ভাঙ্গা নায়
আমি কাল শুনেছি নন্দের ছেলে, জল ছিটাইল বউ তোর গায়॥
বউ ঠাকুরুন লো এমন হলে তোরে কি আর ঘরে রাখা যায়?

আমি বললাম বউ তোরে— কলস রাখ মধ্য ঘরে
বউলো তুই ঘরে ফিরে আয়,
এমন বউ হায় কার ঘরেলো, দিনেতে তিনবার পালায় ॥

রাধারূপী গোবিন্দ আচার্য অভিমানের কণ্ঠে এর উত্তর দিলেন, "আমার নামে যদি কলংক হয় তবে আর কখনও যমুনায় যাব না— ঘরে বসে থাকবো, কোনো কাজই করবোনা, দেখি কেমন করে কাজ চলে?"

কুটিলা আবার গাইলেন,

বউ, তোমারে আন্‌ছি অবধি (তুমি) আমার কথার অবাধ্য।
যদি কর পরে ঘর কাজ করবে বরাবর, না করে কার বাপের সাধ্য ॥
নন্দের ছেলে মন মজালো মোহন বাঁশি বাজায়ে
গোকুলে কার বউ চলে এককালে ঘোমটা ফালায়ে
আমি যাই না আর পাড়া ঘরে লোকে মন্দ কয় তোরে
আসি মাথা নোয়ায়ে।
আজ অপমানী করব তোরে দাদার কাছে সব কয়ে
গোকুলে কার বউ চলে এককালে ঘোমটা ফালায়ে ॥

কোনো এক আসরে বিজয় আচার্য নিজে 'রাবন' হয়ে রামুমালীকে 'মহাদেব' বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভো, আমি আপনার দাস। আপনার কৃপায় আমার শরীরে অমিত বল, তবে মিথিলায় গিয়ে আমি আপনার ধনুখানা তুলতে পারিনি কেন? আমি সীতার লোভে হরধনু তুলতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে এসেছি। একদিন তো ধনুসহ কৈলাশ পর্বত বাম হাতে উত্তোলন করে এই বিশ্ব-সংসারে চমক সৃষ্টি করেছিলাম। তবে আজ আমার এমন দশা হলো কেন?

রামুমালী 'মহাদেব'। উত্তরে বললেন,—

বল্লে তুমি আমার কাছে রাবন মহারাজ
হরধনু তুলিতে, পারলে না কোনোমতে
মিথিলাতে পেয়ে এলে লাজ।
এসব কার্যে যেতে হলে জানতে হয় তার পূর্বাপর।
ধনু তুলতে গেলে কেন না জেনে খবর?
জনকের জানকী—তারে তুমি জান কি?
তুমি নিতান্ত বর্বর।
সেই সে ধনু তুলতে পারে, যে হয় সীতার যোগ্য বর॥

অন্য একদিন রামুমালী নিজে বিভীষণের ভূমিকা নিয়ে রামগতিকে রাবনের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা আপনি তো রাম-সীতাকে চিনতে পারেননি। রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ন আর সীতা পূর্ণলক্ষ্মী নারায়ণী। আপনি একজন বিখ্যাত রাজা, অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে সীতাহরণ কাজটা আপনার বড় অন্যায় হয়েছে। আপনি কার কথায় রামের সীতাকে আনলেন?

রাবন রূপী রামগতি উত্তর দিলেন—

তুমি বল্লে নাকি রামের সীতা আনলাম কার কথায়?
বিভীষণ, তুমি জান না কারণ, যখন ভগ্নী এসে জানালো আমায়।
তার কাটা নাকে বসন দেলে, দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে কি?
আমি সেই রাগের তরে, হরণ করে আনলাম রামের জানকী।

সূর্পনখার নাসা কান কেটে করলো অপমান
রামের ভাই লক্ষ্মণ ধানুকী—
তুমি ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ মারো—বাজারের ভাও জান কি?

পুরাণে ব্যস মাতৃ আজ্ঞায় দুই ভাতৃবধূ অম্বা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে চাইলেন। এক আসরে রামুমালী ব্যসের ভূমিকা নিয়ে এই পৌরাণিক যুক্তিটি খাড়া করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অম্বা অম্বালিকার পক্ষ থেকে রামগতি গেয়ে উঠলেন—

তুমি বললে না কি মাতৃ-আজ্ঞা রক্ষা করার দায়।
ভাতৃবধূ রমন করতে ব্যসমুনী যায়।
এমন ধর্ম ছাড়া কর্ম করলে জন্‌ম যাবে বিফলে
মাতৃ প্রায় ভাতৃবধূ, কোন চদু, ভাসুর হইয়া কু বলে?
নর-নারী রমনে, নিরয় বাস গমনে, ঘটবে কপালে—
তুমি মাতৃ-রমন করবে না কি, যদি তোমার মায় বলে॥

বিদগ্ধ রসগ্রাহী গিরীশচন্দ্র চৌধুরী একবার রামুমালী, রামগতিশীল ও বিজয় আচার্যকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দা ও কুব্‌জার ভূমিকায় কবি গান করতে আদেশ করলেন। গিরীশ বাবু শর্ত আরোপ করলেন, তোমাদের পাল্লার ভাব যেন আদ্যন্ত মানুষী ভাবের মাধুর্যামৃত মাখা থাকে। ঐশ্চর্য ভাবের সংমিশ্রণে রসভঙ্গ দোষ-দুষ্ট না হয়। অর্থাৎ তোমাদের ছড়া পাঁচালিতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর এবং রাধাকে স্বয়ং ঈশ্বরীবোধক আদ্যশক্তি হিসাবে কোন শব্দ প্রয়োগ না করা হয়। কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের পুত্র গোয়ালা, রাঁধা গোপের কন্যা গোয়ালিনী এবং কুব্‌জা কংশের দাসী সাধারণ মানবী। এই ভাব নিয়ে তোমাদের পাল্লা করতে হবে।' এই আসরের বিবরণ দিয়ে বিজয় আচার্য লিখেছেন, "এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আমি ও রামু মাধুর্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সতর্কতার আশ্রয় লইলেও অভ্যাসের অনুরোধে আমাদের ছড়া-পাঁচালির ফাঁকে ফাঁকে ঐশ্চর্যের আভাস উঁকি মারিয়া গিরীশ বাবুর বদন মণ্ডলে আনন্দ জ্যোতির অস্ফুট আলো ফুটাইয়া তুলিত। এই প্রসন্নতার কারণ, বিজয় রামু শুদ্ধ মাধুর্য রক্ষা করিতে পারিল না। রামগতির কিন্তু তা ছিল না। তিনি সহজবোধ্য ভাষায় শুদ্ধ মাধুর্য রক্ষা করিয়া যাইতে ছিলেন। রামগতির একটি কথাতে ও ঐশ্চর্যভাবের উন্মেষণা ছিল না— বা দেখা গেল না।' রামগতির এই আশ্চর্যজনক 'মানবিক ভাবকে' বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক যতীন সরকার বলেন, 'মানবিক ভাবকে সুন্দর রূপে প্রকাশ করার মধ্যেই রামগতির জনপ্রিয়তার অন্যতম হেতু নিহিত। এই মানবিকতা দিয়ে নিষিক্ত করেই কবিয়ালরা লোক-সংগীতের অন্যান্য প্রকরণেও অংশগ্রহণ করতেন। এ ধরনের একটি প্রকরণ 'হোলী গান'। হোলী রাধা কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান। গাওয়া হয় সাধারণত দোলযাত্রার সময়ে। হোলীর পাল্লাতেও সেই মানসিকতা ও তাৎক্ষণিক নাটকীয়তার প্রয়োগ ঘটিয়ে কবিয়ালরা একে একেবারে জীবন্ত করে তুলতেন, একপক্ষে রামগতি শীল ও পরান কর্মকার আর অন্যপক্ষে বিজয় আচার্য ও কালীচরণ দে একবার নেত্রকোনার হাসনপুর গ্রামে হোলীগানে পাল্লা করেছিলেন, এ খবরও বিজয় আচার্য আমাদের জানিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দির প্রথম দিক থেকেই বৃহত্তর ময়মনসিংহে হিন্দু কবিয়ালদের পাশাপাশি মুসলমান কবিয়ালদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১০ থেকে ১৯৬০ সনের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ জিলায় বেশ কজন মুসলমান কবিয়ালের কবিগানে আসা-যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে সদরের চর গোবিন্দপুরের কানা জইমত, ভোলার চরের উমেদ আলী, নেত্রকোনা

সদরের আলী হোসেন, গফরগাঁও থানার ধলা গ্রামের আবদুল খালেক জামালপুরের উকিল মুন্সী স্বনাম খ্যাত। এদের সবারই জন্ম বিংশ শতকের একেবারে গোড়াতে। এঁরা যৌবনকালে কবিগান দিয়েই শুরু করেছিলেন কিন্তু ১৯৩০ সন থেকে ময়মনসিংহে কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায় এঁরা প্রায় সবাই পরবর্তীতে বাউল গায়ক হয়েছিলেন এবং সংগত কারণেই এদের বাউল গানেও কবিগানের ঐশর্য লক্ষ্য করা যায়। এ হিসাবে বাউল গানকে কবিগানের উত্তরসূরি বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৮৬০ সনে মধুকবি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এ সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধারার সূত্রপাত ঘটে। কবিগান তখন বার্ধক্যে উপনীত। মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ও আধুনিক যুগের এ যুগ-সন্ধিক্ষণেই বাউল গানের প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়টাতেই অর্থাৎ ১৮৬০-১৯৬০ সময় কাল বাউল গানের উৎকর্ষের যুগ। পূর্বে কথিত কবিয়ালগণ তাই বাউল গানের ধারায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে বাউল গানের দিকে ঝুকে পড়েন। বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ সারা বাংলাদেশেই তখন এ ভাবটি স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং 'বাউল গান' কবিগানের উত্তরসূরি' বলা অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

'যুগ-সন্ধির কবি' ঈশ্বরগুপ্ত 'প্রাচীন যুগের ভগ্নদূত' ও 'আধুনিক যুগের অগ্রদূত' হিসাবে খ্যাত। তিনি প্রথম জীবন শুরু করেছিলেন একজন কবিয়াল হিসাবেই। তার অনেকগুলি ব্যঙ্গ কবিতায় কবিয়ালের গন্ধ পাওয়া যায়। কবিয়ালদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ছিল অপরিসীম। তাঁর পূর্বসূরি কবিয়ালদের রচিত গান ও তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত সে— শ্রদ্ধারই প্রমাণ রেখেছেন। তিনি নিজেও তার থেকে উৎড়ে যেতে পারেননি। তার রচিত কবিতা যে কবি গানের বৈশিষ্ট্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি তার প্রমাণ তার বিখ্যাত 'তপসে মাছ' কবিতায় রয়েছে। এখানে তিনি স্বভাব কবির স্বভাবজাত ভাবে উচ্চারণ করেন :

কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়
গাল ভরা গোপদাঁড়ি তপস্বির প্রায়।
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে
মোহন মুনীর প্রভা ননীর শরীরে।
...ইত্যাদি ইত্যাদি।

'সৌরভ' পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রতিভাধর ও শিক্ষিত কবি বিজয় নারায়ণ আচার্য ময়মনসিংহের কবিয়ালদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও নিজের সম্পর্কে খুব কমই উল্লেখ করেন। মার্জিত ও বিদগ্ধজন সুলভ বিনয়ই তাঁর নিজের সম্পর্কে অনুল্লেখের কারন বলে মনে হয়। তার বর্ণনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে তিনি ১২৬৩ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৮৫৬ সনের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭০/৭২ বছর বয়সে ১৩৩৩ বা ১৯২৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। 'সৌরভ' পত্রিকায় তার লেখা বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে এবার আমরা ময়মনসিংহের অপরাপর বিখ্যাত কবিয়ালদের জীবনী আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

রামু সরকার : বিজয় নারায়ণ আচার্যের ভাষায় (সৌরভ, মাঘ-১৩২১) "রামু সরকার ময়মনসিংহের একজন অনক্ষর কবি। রামু জাতিতে ভূঁইমালী ছিলেন। কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান কিশোরগঞ্জ) আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৭ সালের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহন করিয়া ১৩২০ সালের ৩০শে ফাল্গুন ৭২ বছর বয়সে পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামুর পিতার নাম রামপ্রসাদ ও মাতার নাম রায়মণি ছিল। প্রাগুক্ত আউটপাড়া

নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় রামু সরকারের শিক্ষাগুরু ছিলেন। উপাধি না থাকিলেও অমর ভট্টাচার্য একজন বহুদর্শী পণ্ডিত ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধু ছিলেন। তাহারই কৃপাশীর্বাদে রামু একজন দেশ বিখ্যাত কবির সরকার।

রামু সরকার বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত সাহিত্যের মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাহার আর লেখাপড়া শিক্ষা হইল না। বিশেষত সামাজিক হিসাবে যাহারা নীচ জাতি, তৎকালে তাঁহারা লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি বড় একটা বিশেষ মনোনিবেশ করিতনা। পূজ্যপাদ অমর ভট্টাচার্য মহাশয় বালক রামুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য ও সঙ্গীত সাধনার চেষ্টা দেখিয়া তাহাকে আগ্রহের সহিত শিষ্য করিয়া লইলেন। রামু ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহানুগ্রহ ও শক্তি সঞ্চারে অল্পদিন মধ্যেই গীতবাদ্য ও শাস্ত্র পরিজ্ঞানে মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রামু কেবল গুরুমুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন আর ভূলিতেন না। রামুর স্মরনশক্তি সংসার ছাড়া ছিল। গ্রন্থাদি বুঝিবার শক্তিও তাহার অত্যন্ত অধিক ছিল। কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে রামু শ্রবণ মাত্রই তাহার ভাবগ্রহণে সমর্থ হইতেন। মৌখিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত রামু শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে ছড়া পাঁচালি ও বলিতে শিক্ষা করিয়া লইলেন। ১৪ বৎসর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করিয়া ২০/২২ বৎসর বয়ক্রম কালে একজন বিখ্যাত কবির সরকার হইয়া বসিলেন।

রামগতি, রামানাই, শক্তিরাম বড়হবি, মিঞাজান, নবু সরকার, গোবিন্দ মালী, বিশ্বম্ভর ঠাকুর প্রভৃতি বহু স্বদেশী-বিদেশী কবিওয়ালাগণ রামু সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাহারা কবিত্ব শক্তিতে রামুর সমতুল্য হইলেও অনেক সময় বিজয়লক্ষ্মী রামুকেই স্নেহের চুম্বন দানে সুখী করিতেন।”

রামগতি শীল : রামগতি শীল রামুমালীর সমসাময়িক ছিলেন। এরা একত্রে উভয়ে বহুদিন অর্থাৎ ১৩২০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কবিগান গেয়েছেন। তাদের কুলগত উপাধি ছিল ক্ষৌরকার। চন্দ্রকুমার দে রামগতিকে ‘ময়মনসিংহের দাশু রায়’ আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি নরসুন্দর (নাপিত) কুলে জন্ম নিয়েও গোবরে পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠেছিলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে ‘সৌরভ’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজয় নারায়ন আচার্যের লিখা (সৌরভ, অগ্রহায়ণ ১৩২১) রামগতির টপ্পা প্রবন্ধে রামগতি সম্বন্ধে মোটামুটি অবগত হওয়া যায়। সেই সূত্র ধরে অধ্যাপক যতীন সরকার বলেন, “রামগতির আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ভিটেমাটি হারা হয়ে তিনি নিজের জন্মস্থান গাঙ্গাইল ত্যাগ করে সুকুলি গ্রামে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করেন। সেখানেও ঋণগ্রস্ত হয়ে কৈলাটি ফতেপুর গ্রামের ভূস্বামী দাশু বিশ্বাসের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। দাশু বিশ্বাস সামান্য অনুর্বর জমি জোতস্বত্বে দিয়ে রামগতিকে তাঁর প্রজা করে নেন। এতে গুণগ্রাহী হিসাবে দাশু বিশ্বাসের কদর বাড়লেও রামগতির অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। রামগতিকে দেয়া বিশ্বাস মহাশয়ের জমি ছিল নিতান্তই অনুর্বর। তাই ঋণগ্রস্ত হয়ে তাঁকে কৈলাটি ফতেপুরও ত্যাগ করতে হয়। তাঁর দুঃখের বিবরন জানিয়ে রামগতি আঠারবাড়ীর জমিদার মহিম বাবুকে একটি টপ্পা শুনান ও তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। মহিম বাবু রামগতিকে কেবল উপভোগ করার শর্তে (মালিকানা স্বত্ব নয়) সামান্য কিছু জমি দেন। এই জমিটুকুর ওপর নির্ভর করেই তাকে অত্যন্ত কায়ক্লেশে পরিবার প্রতিপালন করতে হতো। প্রায় সকল কবিয়ালেরই জীবন ছিল এমন বিড়ম্বনাময়। এই বিড়ম্বিত ‘জীবন মন্থন বিষ’ নিজেরা পান করে জনগণের জন্য ‘অমৃত’ পরিবেশন করেছেন

সকল কবিয়াল। কবিয়াল বিজয় নারায়ন আচার্য রামগতির কবিত্ব শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, "ছড়া পাঁচালির মুখ রামুর বেশি হইলেও রামগতির টপ্পার মতো এমন টপ্পা করিতে রামুর শক্তিতে সকল সময় কুলাইয়া উঠিত না। রামগতির তুলনায় রামু কষ্ট কবি ছিলেন। রামুকে অনেক সময় গীতের জওয়াব করিতে, রচনা করিতে, কি কোন 'ধরাট' কথার ভাব-সঙ্গত উত্তর করিতে চিন্তাযুক্ত দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের 'দাশু রায়' রামগতি কি বলিবেন, কি রচনা করিবেন তাহা পূর্বে ভাবিয়া-চিন্তিয়া গুছাইয়া লইতেন না। গানের সময় তাহাকে সর্বদাই নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিয়াছি। রামগতির জিহ্বাগ্রে স্বরসতীর অটল আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

তারাচাদ দে : বিশিষ্ট কবিয়াল পৃষ্ঠপোষক চন্দনকান্দির তালুকদার সূর্যকান্ত চৌধুরীর নাতি মনোরঞ্জন চৌধুরী সৌরভ পত্রিকার ১৩২২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'অন্ধ কবিওয়ালা তাঁরাচাদ' প্রবন্ধে তাঁরাচাদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "অনুমান বঙ্গাব্দে ১২৪৭ কি ১২৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ নন্দীবংশীয় পরলোকগত গোলক চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে তারাচাদের জন্ম হয়; তাহার পিতার নাম বলরাম দে। সামান্য অক্ষর পরিচয় ম.ত্র করিয়াই তাঁহার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল। তাহার বয়স যখন ১৬ কি ১৭ বৎসর তখন দারুন বসন্ত রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মৃত্যুর দ্বার হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু 'নব্বই হাজার মুদ্রা' (যা তিনি নিজের রচিত ও গীত একটি কবি গানে বলেছেন) মূল্যের দুইটি চক্ষুরত্নই তিনি চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলিলেন।...যৌবনের প্রারম্ভেই অন্ধ হইয়া জীবনের সকল সুখ হইতেই কবি বঞ্চিত হইলেন।...চন্দনকান্দি গ্রামের শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর চক্রবর্তী মহাশয় ও ভবানীপুর নিবাসী পরলোকগত জীবন মজুমদার মহাশয়গনের কবিগান শুনিয়াই কবি তাঁরাচাদের কবিগানের প্রতি আসক্তি ও কবিগান শিক্ষায় আগ্রহ জন্মে। চন্দনকান্দি গ্রামে সূর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে কবি তাঁরাচাদ আশ্রয় লাভ করেন। ...তাঁরাচাদ প্রথম যৌবনে ব্যবসার সাথে সুসঙ্গরাজের বংশগণের পূর্বধলাস্থ রাজবাড়িতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে উপর্যুপরি সাত বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন কবি সরকারের সঙ্গে গান গাহিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামু সরকার ও রামগতি সরকারের সঙ্গেও আমাদের এই অন্ধ কবিওয়ালার প্রতিযোগিতা ছিল।" '১৩২২ সনে মনোরঞ্জন চৌধুরীর প্রবন্ধ রচনার কালেও তাঁরাচাদ জীবিত ছিলেন। তখন তার বয়স পচাত্তর সম্ভবত আরও কয়েক বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। এ হিসাবে তার মৃত্যু হয় সম্ভবত ১৩২৫ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কোন এক সময়।

লাল মামুদ : লাল মামুদ 'ভক্ত কবি লাল মামুদ' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি নেত্রকোনা মহকুমার নারায়নডহরের সন্নিকট বাওইডহর গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১৩০৪ সনের মাঘ মাসে তিনি একেবারে তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় যৎসামান্য বাংলা লেখাপড়া শিখেন। আর্থিক অনটনে পড়ে তিনি লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলেও তিনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় কোরআন, হাদিস, ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারত ও গীতায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তিনি কিশোর বয়সে 'গাইনের গীত' বা 'গাজীর গীত' গায়ক ছিলেন। পরে তিনি বিভিন্ন কবির কবিগানে মুগ্ধ হয়ে কবি গানের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তার গানে অসাম্প্রদায়িক

মনোভাব স্বার্থক হয়ে উঠতো। অচিরেই তিনি বিখ্যাত কবিয়াল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা সৌরভ পত্রিকায় কবিয়াল বিজয় আচার্য লিখেন 'লালু আমার সঙ্গে দুই তিনবার কবিগান করিয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক অতি সুমধুর ছড়া পাঁচালি বলিতে পারিতেন। কণ্ঠস্বর ও অতি মিষ্ট ছিল। কবিগানে প্রবিষ্ট হইয়া লালু গাজীর কীর্তন ছাড়িয়া দিলেন। দুঃখের বিষয় এই লালু যৌবনেই জীবন লীলা সংবরণ করাতে অধিক দিন কবিগান করিয়া যাইতে পারেন নাই। অদ্য পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় লালু ময়মনসিংহের একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইতেন সন্দেহ নাই।"

কানা জইমত : কানা জইমত বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার চর গোবিন্দপুর গ্রামে ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। নামে কানা হইলেও তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তার বোধশক্তি ছিল প্রখর, গলার সুর ছিল ভারি মিষ্টি। সাকুয়াইর গ্রামের উপেন্দ্র সরকার তার গুরু ছিল। তিনি গুরুর কাছে শুনে শুনে ধর্মীয় তত্ত্বগতভাবে বুৎপত্তি লাভ করেন। কিছুদিন পরেই তার গুরু উপেন্দ্র সরকার মারা যান। প্রথম জীবনে তিনি কবিয়াল ছিলেন। ১৯৪৯ সনে মারা যাওয়ার দুতিন বছর আগে তিনি কবিগান ছেড়ে বাউলের আসরে অবতীর্ণ হন। তিনি ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সাধারণত সম-সাময়িক ঘটনা বা চিত্র তুলে ধরে কবিগান গাইতেন। তার গানে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের বড় বেশি একটা উপাত্ত থাকত না। বলতে গেলে তার সময়টাতে (১৯১০-১৯৫০) কবিগানে একেবারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ গৃহস্থালী বিষয় তখন কবি গানে স্থান করে নিয়েছিল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে ময়মনসিংহের জেলখানা ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি তা নিয়ে একটি চমৎকার কবিগান গেয়েছিলেন গানটি এইরূপ :

ঘটলো আজবলীলা ময়মনসিংহ জিলা
সোমবারে বৈকাল বেলা ভাঙ্গলো জেলখানা।
১৩৩৯ সনে বৈশাখেরই ছাব্বিশ দিনে
আসিয়া দারুণ তুফানে লাগায় লাঞ্ছনা।।
দালানকোঠা ভাইঙ্গা পড়ে কত কয়দী পইড়্যা মরে
কত কয়দী ভাগে ডরে নিষেধ শুনে না॥
তুফান আইসা মারে ঠেলা সবাই বলে আল্লা আল্লা
ভাঙ্গলা দালানের মাল্লা বাকি রাখলা না॥
তুফান আইসা জোর করে সব বাবুরা চিৎকার পারে
হরি যদি উদ্ধার করে বায়োস্কোপ দেখব না॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের দুর্ভিক্ষকে উপলক্ষ করেও কানা দুইমত একটি অসাধারণ কবিগান বেঁধে ছিলেন :

পাপের জন্য লক্ষ্মী শূন্য জমিনেতে হয় না ধান্য
দেশেতে আইল দারুণ দুর্ভিক্ষী।
পাপেরই কারণে লক্ষ্মী গেল অন্তর্ধানে
অলক্ষ্মী আসিয়া দেশে করে রাজত্বী॥
জমিনেতে ধান্য হয়না গাভীর বানে দুধ মিলে না
মায়ের বুকে দুধ আসেনা ছেলে খাইবে কি?

বিশ টাকা চাউলের মণ একআনা হৈল লবণ
বার আনা কাপড়ের গজ পাঁচ টাকায় ঘি॥

ফকির উমেদ আলী : বর্তমান ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার অধীন ভোলার আলগী (ভোলার চর) গ্রামে তিনি ১৯০১ ইংরাজি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানতেন। কিশোর বয়সেই তিনি কবি গানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি তার গুরু কেনা ফকিরের কাছে পরবর্তীকালে বাউল গান শিখে সারা বাংলাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। তার সময়ে সারা বাংলাদেশে তার চেয়ে জনপ্রিয় বাউল গায়ক খুবই কম দেখা যায়। প্রথম জীবন তিনি কবি গান গেয়ে শুরু করেন। তার কবিত্ব শক্তি ও বাকপটুতা ছিল অসাধারণ। মুসলমানশাস্ত্রের চেয়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্রে বেশি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি যৌবনকালে ধলা, সেনবাড়ি, আঠার বাড়ি, গৌরীপুর ও মুক্তাগাছা জমিদার বাড়িতে কবিগান গেয়ে প্রচুর সুনাম কামিয়েছিলেন। এসব গানে তার প্রতিপক্ষ হিসাবে থাকতো কানা জইমত ধলার আবদুল খালেক, নেত্রকোনার প্রভাত কানা ও সিলেটের অমীয় চক্রবর্তী। একবার সেন বাড়িতে বিজয় সেনের আমন্ত্রণে তিনি সিলেটের অমীয় চক্রবর্তীর সাথে কবিগান গাইতে গিয়ে খুবই সুনাম করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র জ্ঞানে তিনি ব্রাহ্মণ কবিয়াল অমীয় চক্রবর্তীর চেযে উত্তম ছিলেন। তার বাচনভঙ্গি রসিকতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সেখানে গাওয়া তার একটি কবি গানের কিয়দংশ :

অষ্টমী নবমী দশমী তিন দিন গেল।
তিন দিন সেন বাড়ি কবি গান হইল।
অমিত ঠাকুর প্রতিপক্ষ বড় ভাগ্যবান।
সিলেট থাইক্যা আসছেন হেথা গাইতে কবিগান।
আমি জাতে মুসলমান তিনি হন ব্রাহ্মণ।
বাতুলতা তার সাথে গাওয়া রামায়ণ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯৩০ সন থেকে তিনি (কবি গানের বাজারে মন্দাভাব দেখায়) বাউল গান শুরু করেন এবং কালে একজন উঁচুদরের যশ্বশী বাউল হিসাবে ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ৩/৪ দিন পর পরলোক গমন করেন। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহে একজন কিংবদন্তীতুল্য গায়ক ছিলেন।

কবিগান লোকসাহিত্যের অন্য সব প্রকরণের সাথে সম্পর্কবিহীন কোন বিচ্ছিন্ন প্রকরন বা অধ্যায় নয়। এটি লোক সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ন অধ্যায়। লোক সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে এদের বিভিন্ন প্রকরণ অতি ঘনিষ্ঠ। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করার উপায় নেই। কবিগান অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে বর্তমানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যদিও কবিগানের উৎকর্ষতার সময়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই তা বৈশিষ্ট্যায়িত ছিল। বর্তমানে বৃহত্তর ময়মনসিংহে কবিগানের প্রচলন একেবারেই নেই। যা আছে তা হলো কবিগানের প্রকরণেই বাউল গান। অন্যান্য লোকজ সংগীতের সাথে কবিগানের সম্পর্ক বর্তমানে কিরূপ তা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক যতীন বাবুর একটি লম্বা উদ্ধৃতি এখানে একান্তই প্রণিধানযোগ্য। বিস্তৃত পরিসরে কবিগান আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সন্দেহ নেই কবিগান লোক সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকরণ। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সাহিত্যের অন্য সব প্রকরণের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এর অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্য ও সংগীতের বিভিন্ন প্রকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, অন্যান্য প্রকরণের

পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রকরণই প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। উত্তর-প্রত্যুত্তর সমন্বিত কবিত্বের লড়াইয়ের যে রীতি কবিগানে প্রচলিত, বাউল গানেও তার পরিচয় মেলে। কবিগানের মতোই আসরে উঠে এক বাউল তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গানের মাধ্যমে তার প্রতিপক্ষের প্রতি নানা কূট প্রশ্নের বান নিক্ষেপ করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী তার জবাব দিয়ে আবার তার প্রতিপক্ষের প্রতি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন। বাউল গানে এভাবে যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াই চলে ময়মনসিংহে তাকে 'ধরাট' বা 'পাল্লা' বলা হয়। কোনো কোনো স্থানে এ ধরনের বাউল গানকে বিচার-গান ও বলে। স্পষ্টতই এ গান কবিগানের রীতি দ্বারা প্রভাবিত। কবিগানের সাথে তার প্রধান পার্থক্য এই যে; কবিগানে প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালরা দুইটি পৌরানিক বা সামাজিক চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন এবং তাতে একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নাটকীয়তা ফুটে-ওঠে ; কিন্তু 'ধরাট' 'পাল্লা' বা 'বিচারের' বাউল গানে অন্য কোন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে লড়াইয়ে নামেন।

ময়মনসিংহের বিশ্ববিখ্যাত পালা গীতির সঙ্গেও কবি গানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। শুধু ময়মনসিংহ গীতিকায় সংকলিত পালা গীতিগুলো দিয়েই ময়মনসিংহের এ-শ্রেণীর শিল্প প্রকরণের বিচার চলে না। ময়মনসিংহে বিভিন্ন কাহিনী ও আখ্যান নিয়ে অজস্র পালা প্রচলিত : বিশিষ্ট লোকরীতিতে এগুলো অভিনীতও হয়। লোকযাত্রায় যেসব পালার অভিনয় বহুল প্রচলিত, তার মধ্যে প্রধানও বিশিষ্ট হচ্ছে 'ভাসান' যাত্রা। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী নিয়ে ভাসান যাত্রার আখ্যান রচিত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের নিজস্ব কাহিনী নিয়ে যেমন আছে বাইদ্যানীর পালা' তেমনি বরিশালের 'গুনাই বিবি'ও ময়মনসিংহের গীতাভিনয়ে স্থান করে নিয়েছে। গাজীকালুর কাহিনী তো একটা বিশিষ্ট লৌকিক ধর্ম বিশ্বাসেরই পোষক রূপে 'গাইনের গীত' নামে আলাদা এক গীতাভিনয় প্রকরণেরই জন্ম দিয়েছে। ... যাত্রাগানে বা অন্য যে কোন অভিনয়ে পাত্র-পাত্রীদের বক্তব্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। আসরে অভিনেতারা গানে বা সংলাপে সেগুলো পরিবেশন করেন মাত্র, তাদের কোনো স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা সেখানে থাকে না। অথচ কবি গানের আসরে কবিয়াল অভিনেতা হয়ে অবতীর্ণ হন বটে, একটি চরিত্রের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু তার বক্তব্য বা সংলাপ পূর্ব নির্দিষ্ট থাকে না, তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গানে ছড়ায় ও টপ্পায় সংলাপ রচনা করে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হয়। তাই কবি গানে নাটকীয়তার এক বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত, অভিনয়ে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত।...কবিয়ালকে যেমন স্বভাব কবিত্বের অধিকারী হতে হয়, তেমনি হতে হয় প্রত্যুৎপন্ন সম্পন্ন, শাস্ত্র ও বিষয়ভিত্তিক পৌরাণিক ঐতিহ্যের তথা সমাজ বিধানের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত এবং লোক মনস্তত্ত্বের রসগ্রাহী বোদ্ধা।...লিখিত সাহিত্যে টিচার বিতর্কমূলক প্রবন্ধ বা Polimics গুলো যে কাজ করে লোকসাহিত্যে কবিগানের ভূমিকা ঠিক সেই রকম। যাত্রার ঐতিহ্য কবিগানে একটা মননের উচ্চতা পায় বলেই এক সময় যাত্রার চেয়ে কবিগান মর্যাদাশীল হয়ে উঠেছিল। 'যাত্রা শোনে ফাত্রা লোকে, কবি শোনে ভদ্রলোকে'— ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এ প্রবাদই কবিগানের উচ্চ মর্যাদার পরিচয়বাহী।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কবি গানের সাথে বঙ্গদেশের সকল লোকসংগীত ও ঐতিহ্যই কমবেশি জড়িত। আজকালের সর্বনাশা স্রোতে কবিগান হয়তো সরাসরিভাবে নেই কিন্তু অন্যান্য লোকসংগীতে তার ভাব-বৈচিত্র অজান্তেই রক্ষিত হচ্ছে। সে হিসাবে লোক-সংগীতের এই ঐতিহ্যবাহী ধারাটিকে নবমূল্যায়নে মূল্যায়িত করা উচিত।

বাংলার এই লোকসাহিত্যের সকল শাখার উপাদানগ্রাহী আর সকল শাখার জন্য উপাদান

সরবরাহক হয়ে কবিগান নিজ মহিমায় নিজস্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কবিগানের এই বিশাল সম্পদকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে পন্ডিত অমূল্য চরন বিদ্যাভূষনের অভিমত একান্ত মূল্যবান। তাঁর রচিত 'ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা' গ্রন্থের ৭৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "এই কবিগানে সম্পূর্ন স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ গান দেখা যায় না।" এই পন্ডিত মহাশয় পৃথিবীর বহুপ্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিরল পান্ডিত্যে সমুজ্জ্বল ছিলেন। বিদ্যাভূষনের এ মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। পৃথিবীর বা ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতীর মধ্যে যদি কবি গানের মত কোনো গানের অস্তিত্বই না থেকে থাকে তবে কবিগান বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকৃতই একটি গর্বের বিষয়। তাই আমাদের উচিত আমাদের বিরল সম্পদটির যথাযথ পরিচয় তুলে ধরে বিশ্বের সকল অংশে ছড়িয়ে দেয়া। এটি আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। যদি বিশ্বের অন্য কোন জাতির মধ্যে এ জাতীয় গানের অন্যরূপ কোন শিল্প প্রকরণের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলেও তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদের এই সম্পদটির বৈশিষ্ট্য নিরুপণে চেষ্টা করা উচিত। এদেশের অনেক বিদ্বান বিদূষী দেশের বাইরে গিয়ে লোক সাহিত্যের গবেষণায় রত। তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোক-ঐতিহ্যের মূল্যায়নে ব্রতী। অবিলম্বে তাদের উচিত এই কবিগানের ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও নবমূল্যায়নের প্রয়াস পাওয়া। এতে করে সারা বিশ্বে আমাদের এই লোকজ-ঐতিহ্য পঠন-পাঠন হবে ও নুতন করে বিশ্বভিত্তিক গবেষণা শুরু হবে।

সংগঠন বাদী নৃতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ক্লদ লেভি স্ট্রস সংগঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের (Structure linguistics) বক্তব্যকে নৃতত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। সংগঠনবাদী নৃতত্ত্ব (Structure Anthropology) সংগঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগে অভূতপূর্ব বলীয়ান হয়েছে। তার অনুসরণে সংগঠনবাদী ভাষাতত্ত্বকে এই লোক সাহিত্যের বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়ে আশানুরূপ ফল পাবেন বলে অনেকে আশা করেন। লোকজ-ঐতিহ্যের সংগঠনবাদী বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি বিশেষত: আবদুল হাফিজ পাঁচটি প্রস্তাব রেখেছেন। প্রস্তাবগুলো হলো :

(১) লোক-ঐতিহ্য বা Flok-lore-এর প্রতিটি বিষয়ের বাহ্যত প্রতীয়মান এবং সুগুপ্ত বা unconseious দিকের বিশ্লেষণ,

(২) লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে কোনটা signified বা চিহ্নিত এবং কোনটা signi fying বা নির্দেষক তা বের করা,

(৩) লোক-ঐতিহ্য যখন যেভাবে উদ্ধারকৃতি হয়, সেভাবেই তার পঠন-পাঠন করা বা Synchronic বিশ্লেষণ করা,

(৪) একই ভাবে যে কোন লোক-ঐতিহ্যের Diachronic বা ঐতিহাসিক পঠন-পাঠন করা

(৫) লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে Binary Opposition বা Opposition pains বা পরস্পর বিরোধী জোড় খুঁজে বের করা।

আমাদের বিশ্বাস আবদুল হাফিজ প্রস্তাবিত এ প্রস্তাবগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিস্ময়কর ফল লাভ হবে। কবিগানে সমগ্র লোক-ঐতিহ্যের ধারাটি সংযুক্ত বলেই এর যথাযথ বিশ্লেষনে লোক-ঐতিহ্যের সামগ্রিক বা ব্যাষ্টিক অর্থ ব্যঞ্জিত হতে পারে। পরস্পর বিরোধী জোড় বা Opposition Pair এর উপর সংগঠন বাদীরা বিশেষ করে জোর দেন।

তার ওপর ভিত্তি করেই কবিগানের মূল পদ্ধতি বা Structure টি গঠিত। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কবির পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যই কবিগানের আত্মা। 'বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়' দর্শনের এই বিজ্ঞানসম্মত সূত্র যেন কবিগানে আক্ষরিক ভাবেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শুধু সত্য নয় বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই কবিগান সজীবতা বজায় রাখে। কবিগানের মধ্যে সত্য আর সুন্দরের ডায়ালেকটিকই বা দ্বান্দ্বিকতা অতি চমৎকার পরিস্ফুটিত হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বা Dialetical Meterilistic বিশ্লেষক কবিগানকে বিশ্লেষণ করে সাহিত্য, সমাজ ও সমাজ মনস্ততত্ত্বের অনেক অজানা রহস্যের দিক উদঘাটনে সমর্থ হবেন। বিষয়টির জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্যানুসন্ধান। তথ্যের ভিত্তি ছাড়া তত্ত্ব আলোচনা বাতুলতা মাত্র। ময়মনসিংহের (বৃহত্তর ময়মনসিংহের) কবিগানের অনেক তথ্যই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আলোচিত হল। গেল শতাব্দির ২য় দশকে সৌরভ পত্রিকায় ময়মনসিংহের কবিগানের তথ্যানুসন্ধানের যে ব্যাপক প্রয়াস চলেছিল— অদ্যাবধি তা চালু থাকলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিগানের একটি সার্বিক রূপরেখা পাওয়া যেত কিন্তু গেল শতকের দ্বিতীয় দশকের পর আর কেউ এদিকে মোটেই অগ্রসর হননি। পরবর্তীকালে এ এলাকায় কবিগান গতি-প্রকৃতি নিয়ে কেউই গবেষণা বা তথ্যানুসন্ধানের বড় একটা চেষ্টা করেননি। সে কারণে অনেক তথ্যই বর্তমানে লুপ্তই বলা চলে। আমরা তথ্যের এই অপ্রতুলতা ও দুষ্প্রাপ্তির কথা স্বীকার করছি অকপটে। নিবন্ধের অনেক জায়গায়ই আমরা অনেক কবিয়ালের নাম ও তাদের গান তুলে ধরেছি কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা কবিগান সম্ভার উল্লেখ করতে পারিনি। এ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। তবে আশা করা যায় গবেষকগণ সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে এলে এখনও 'গুপ্তরত্নোদ্ধারের' মতো অনেক রত্নই উদ্ধার হতে পারে।

আমাদের মতে সারা বাংলাদেশ বিশেষ করে ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল কবিগানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বৃহত্তর ময়মনসিংহের তো কথাই আলাদা যেখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ লোক-সাহিত্যে-সংগীতে সারা বাংলাদেশেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল— সঙ্গত কারণেই লোক-সংগীতের এ ধারাটিতে এ জায়গাটি চরম উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ ছিল এখানে তা বলাই বাহুল্য। এ মুহূর্তে আমাদের উত্তম করণীয়টি হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালানো। আশা করি প্রত্যেকটি জেলা বোর্ড এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। আর এ কাজে উদ্যোক্তা বা সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবে বাংলা একাডেমীর মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রতিষ্ঠান। গভীর পরিতাপের সাথে আমরা লক্ষ করছি যে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে লোক-সাহিত্যের সকল ধারায় যে রূপ তথ্যানুসন্ধান বা মূল্যায়নের প্রয়াস হয়েছে সে ক্ষেত্রে কবিগানের ক্ষেত্রে তার এক-দশমাংশও চেষ্টা হয়নি। যা হয়েছে তা আনুপাতিক হারে একান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ স্বল্পতা দূর করে আমাদের দেশের এ কবিগানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব কোনো দায়িত্বশীল মহল গ্রহণ করবেন কি?

জারী গান : এক সময়ের লোক জীবনের প্রাণস্পন্দন

এক সময় গ্রামবাংলার লোক জীবনের প্রাণস্পন্দন ছিল জারী গান। বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে জারী গান অত্যন্ত সার্বজনীন। মুসলমান, হিন্দু, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষের মাঝে জারী গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আধুনিক নগরায়নের বিস্তৃতির আগ পর্যন্ত। মুসলিম ইতিহাসে ১০ই মহরম একটি অবিস্মরণীয় দিন। ইতিহাস অনুযায়ী ঐ দিন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) সপরিবারে পৈশাচিক শক্তির হাতে শাহাদত বরণ করেন। ১০ই মহরমের এই বিয়োগান্তক কাহিনী জারী গানের মূল বিষয়বস্তু। প্রাক ইসলামী যুগেও ১০ই মহরম উদযাপিত হতো কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ দিনই দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়, ঐদিনই দুনিয়া ধ্বংস হবে। আদি মানব মানবী আদম ও হাওয়ার দীর্ঘ বিরহের পর ঐ দিনই অর্থাৎ ১০ই মহরম আরাফাতের ময়দানে তাদের পূনর্মিলন হয়েছিল। অনেক স্মরণীয়-বরণীয় ঘটনার মর্যাদায় অভিষিক্ত ১০ই মহরম। জারী গানের উৎস ১০ই মহরম কারবালায় ইমাম হোসেনের বিয়োগান্তক পরিণতির ইতিহাস হলেও ঐতিহাসিক আল-বেরুনীর মতে, ইমাম হোসেনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ দিনটিতে আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপিত হতো। তবে তা বিয়োগান্তক দিন হিসাবে নয় বরং আনন্দ-উৎসবের দিন হিসাবেই।

হিজরী ৩৫২ অব্দে বাদশাহ্ খইজউদ্দিনের রাজত্বকালে প্রথম ইমাম হোসেনের বিয়োগান্তক কাহিনী নিয়ে বাগদাদে মহরমের দশম দিবস নিয়ে শোক তাপ বিরহ গাথার আনুষ্ঠানিক উদযাপন ঘটে। এদেশে জারী গানের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানগনই প্রথম বঙ্গদেশে জারী গানের প্রবর্তন করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়ে থাকে যে ষোড়শ শতাব্দির প্রথম দিকেই জারী গানের প্রচলন হয়েছে। ষোড়শ শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'জয়নবের চৌতিশা' নামে একটি বাংলা কাব্য রচনা করেন। গবেষণায় জানা যায় 'জয়নবের চৌতিশা' এবং অজ্ঞাতনামা কবিগণের রচিত 'সখিনার চৌতিশা', 'সখিনার বিলাপ', 'জয়নবের বিলাপ' ইত্যাদি ছোট ছোট পুঁথিকাব্যগুলো মধ্যযুগের পাঁচালির আঙ্গিকে বিভিন্ন আসরে নাচ ও সুরসহ গাওয়া হতো। এর ধারাবাহিকতায় কবি মুহম্মদ খান রচিত 'মোক্তার হোসেন', কবি হামিদ রচিত 'সংগ্রাম হুসন' ও হায়াত মাহমুদ রচিত 'জঙ্গনামা' পাঁচালির আঙ্গিকে রচিত হয়েও জারী গান হিসাবে বিভিন্ন আসরে পরিবেশিত হতো। কবি গানে উল্লেখিত 'ধুয়া', 'খোষা', 'রাগ রাগিনী' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে।

কোলকাতা সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস সম্পাদিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে জারী গান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "জারী হচ্ছে পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রাম্য গানের সুর। কারবালায় নিহত (শহীদ)দেরকে অবলম্বন করিয়া রচিত করুণ রসাত্মক গীত মহরমের সময় বহু স্থানে গীত গান।" ঐ অভিধানে জারী (জারি) শব্দটির পাঁচটি সমার্থক শব্দ দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো, প্রচলিত, জাহির, সূত্রপাত, প্রচার ও কার্যে পরিণত। নয়া দিল্লির সাহিত্য আকাদেমী প্রকাশিত শ্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ' যার ভূমিকা লিখেছেন ধীমান মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উক্ত গ্রন্থে 'জারী' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'মহরম পর্বের শোকের যাত্রা'। বহু ভাষাবিদ

পণ্ডিত ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে 'জারী' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'বিলাপ' ও 'গান বিশেষ' হিসাবে। 'ফার্সি বাংলা-ইংরেজি' অভিধান যার প্রকাশক হচ্ছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, এ 'জারী' শব্দটির অর্থ দেয়া হয়েছে ক্রন্দন, বিলাপ, মিনতি বা প্রার্থনা। যা'রী শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ এবং এর ক্রিয়াপদ হলো যা'রী দান। কাছাকাছি আরেকটি শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে শোচনীয় দুঃখজনক, তিক্ত বিলাপ ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যে কাতরানি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'জারী' শব্দটি অন্যান্য অনেক ফার্সি শব্দের মতোই বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং মূল ফার্সি বানান রীতি অনুযায়ী 'জারী' শব্দটি বাংলায় 'য' দিয়ে লেখা অধিকতর মূলানুগ হলেও 'জ' দিয়েই 'জারী' শব্দটি আমাদের ভাষায় প্রচলিত ও উচ্চারিত হচ্ছে।

নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রিন বুক হাউজ লিমিটেড, ঢাকা'র যৌথ প্রযোজনায় প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষে' জারী গান বিষয়ে লেখা হয়েছে, "...মুসলমানগণ মহরম মাসের ১০ তারিখে দেশব্যাপী শোকসভা পালন করিয়া থাকেন। সাধারণত এই মহরম মাসে কারবালার করুন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে সব গান করা হয় তাহা জারী গান নামে পরিচিত। জারী শব্দটি 'জার' যার অর্থ শোক শব্দ হইতে আসিয়াছে। নানা অঞ্চলে নানা ভাবে এই গানগুলি গাওয়া হয়, কোন কোন স্থানে শুধু মূল গায়েন গানগুলি গাহিয়া যায় একদল দোহার হাতে গামছা লইয়া পায়ে নূপুর পরিয়া বৃত্তাকারে নৃত্যের তালে তালে ঘুরিতে থাকে। যাহারা জারী গায় তাহাদিগকে 'জারীয়াল' বলা হয়। জারী গান সাধারণত বিভিন্নভাবে বিভক্ত; 'ইমাম চুরি' 'শহীদে কারবালা' 'সখিনার বিবাহ' এবং 'হানিফার লড়াই' প্রভৃতি। বিভিন্ন লোকগীতির ভিতর জারী গানের মধ্যেই কিছুটা হলেও পৌরুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, করুণ রসের স্রবণের মধ্যে বীর রসের মিশাল এত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে যে শ্রোতৃমন্ডলী গানগুলির মধ্য হইতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি প্রেরণা পায়"। 'বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য' গ্রন্থে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আবদুল হাফিজ জারী গান সম্পর্কে লিখেছেন, "মুসলিমদের জারী গান সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রচলিত।" ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে প্রাবন্ধিক আবদুর রাজ্জাক রচিত 'ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "জারী গানের বিষয়বস্তুতে রয়েছে কারবালার নির্মম কাহিনী। বীরত্ব সেখানে ষড়যন্ত্রের শিকার অমানবিকতার হিংস্র থাবায় সেখানে শিশু, নর-নারীর জীবন বিপন্ন। সেই আর্তির সঙ্গে ঐকত্ববোধ, সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণার জাগরণ"। প্রখ্যাত লোক সংস্কৃতি গবেষক নেত্রকোনার কৃতি সন্তান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত সমার্থক আরেকটি গ্রন্থে সিরাজ উদ্দিন কাশিমপুরী (১৯০১-১৯৭৯) 'বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত পরিচিতি' নামক গ্রন্থে জারী গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে উচ্চারণ করেন, "আমাদের সত্তা চেতনার নির্ভেজাল উদ্দীপনা-সঞ্চার এই জারী গানের লক্ষ্য। ইহাতে আছে সত্য-ন্যায়-ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতর মানবিক গুণের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য স্বভাবত বীররসের সংযত প্লাবন আত্মবিসর্জনের উদাত্ত আহবান।" অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী তার 'ময়মনসিংহের লোকগীতি ও লোকসঙ্গীত' নিবন্ধে লিখেছেন, "ময়মনসিংহের লোকসঙ্গীতে জারী গানের একটি উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে"।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম কবিদের রচিত পুঁথিকাব্য ও তার প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণে জারীয়ালগণ কতকগুলো পালার নামকরণ করেছিল শহীদে কারবালা, ইমাম চুরি, সখিনার বিলাপ, জয়নাল উদ্ধার ও হানিফার যুদ্ধ। এ ছাড়াও নবী, পীর, দরবেশ, বীর

এদেরকে উপজীব্য করেও জারী গান গাওয়া হয়। যেমন, সোহরাব রুস্তমের জারী, সোলায়মান নবীর জারী, নমরুদের জারী, মাদার পীরের জারী, বন্যার জারী, অসতী নারীর জারী, স্বাধীনতার জারী ইত্যাদি। আবার জারী গানের আসরে উপস্থিত হিন্দু শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য লোক কবিরা 'নিমাই সন্ন্যাস', 'চণ্ডিদাস রজকিনী' ইত্যাদি জারী পরিবেশন করে অনুরাগী শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী কিংবা বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনী নিয়েও জারী গান পরিবেশন করা হতো বলে শোনা যায়। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান, নৌকা বাইচ, শিল্প-কৃষি প্রদর্শনী এবং অঞ্চল বিশেষের অনুষ্ঠানে ও সমসাময়িককালে অঞ্চল, অনুষ্ঠান ও মেলার পরিচিতি মূলক উদ্বোধনী জারী গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে যার সাথে মূল মহরম পর্বের মিল থাকে না—ইদানীং বিভিন্ন নির্বাচনেও দলের কিংবা প্রতিযোগীর পক্ষ হয়ে জারী গান পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। বিগত নির্বাচনে ময়মনসিংহ সদর আসনের জনৈক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কদ্দুছ বয়াতীকে ময়মনসিংহ শহরের আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম্য বাজারে জারী গান পরিবেশন করতে দেখা গেছে। তবে তা সম্মিলিত জারী গান নয় বরং একক পর্যায়ে জারী গান।

ষোড়শ শতকে জারী গান শুরু হলেও এই গানের উৎকর্ষতা লাভ করে উনবিংশ শতকের মধ্যপাদ থেকে বিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, খুলনা, বরিশাল চব্বিশ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক জারী গানের দল ছিল। এ সকল জেলার মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী ও ময়মনসিংহ গীতিকার দেশ বৃহত্তর ময়মনসিংহে জারী গানের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। লোকজ সংস্কৃতিতে ময়মনসিংহ অঞ্চল বরাবরই সমগ্র বাংলাদেশে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ যুগ যুগ ধরে লোকজ সংস্কৃতিতে দেশের সকল এলাকা থেকে এগিয়ে ছিল। জারী গানেও এই জেলা বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। বিংশ শতাব্দির শুরুতে এ জেলায় এমন একটি গ্রামও ছিল না যেখানে কেউ না কেউ জারী দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

জারী গান সাধারণত দুই ভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ জারী গানের আসরে গায়েনবৃন্দ নৃত্যের তালে তালে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে গান গায় দ্বিতীয়ত মর্শিয়া বা শোকগাথা গাওয়ার সময় দলের সবাই বসে বসে ব্যথা-বিহ্বল অনুভবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে এই গান পরিবেশন করে। দলপতি দলের অন্য সবাইকে একটি 'ধুয়া' বা 'দিশা' ধরিয়ে দেয়। কোন কাহিনী বর্ণনা বা তার কিছু অংশ বলার পর দলপতি দলের অন্য সবাইকে গানের 'দিশা' ধরিয়ে দিয়ে খানিক বিশ্রাম নেয় তারপর আবার গান শুরু করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে গান এগিয়ে চলে।

বন্দনা গেয়ে এই গান শুরু হয়। বন্দনা সংক্ষিপ্ত ও হতে পারে আবার দীর্ঘও হতে পারে। পরে বয়াতী আসরে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের দর্শকশ্রোতাগণকে সালাম-আদাব জানিয়ে মূল কাহিনী শুরু করেন। সাধারণত তরুণ ও কিশোর বয়সীরা জারী গানে দোহার কিংবা নাচনেওয়ালা হিসাবে অংশগ্রহণ করে। জারী গানের দলপতি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন ময়মনসিংহে 'বয়াতী', রংপুরে 'হাদি', রাজশাহীতে 'ওস্তাদ'। আবার দলের মধ্যে যারা নাচে ও গানে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে ময়মনসিংহে 'দোহার' ও উত্তরবঙ্গে 'পাইল' বলা হয়ে থাকে। (বাংলার লোক-সংস্কৃতি ডক্টর ওয়াকিল আহমদ) বর্তমান ময়মনসিংহে দলপতিকে 'বয়াতী', কিশোরগঞ্জে 'সরকার' ও নেত্রকোনায় 'বয়াতী' বলা হয়। আর দলের অন্য সকল সদস্য যারা গানে অংশ নেয় তাদেরকে বর্তমান

ময়মনসিংহে 'পাইল', কিশোরগঞ্জে 'দোহার', নেত্রকোনায় 'জোগালী' ও টাঙ্গাইলে 'বাহারী' বলা হয়। জারী গানের সূচনাকারী অর্থাৎ যিনি প্রথম গান শুরু করবেন তিনি হলেন প্রধান দোহার। বৃহত্তর ময়মনসিংহে তাকে বলা হয় 'খেরোয়াল'। কোন একটি দলে সাধারণত বয়াতী একজন, খেরোয়াল একজন ও দোহারের সংখ্যা দশ থেকে পনের জন হয়। জারীয়ালরা পাতলা হাফ পেন্ট, হাতাকাটা রঙিন গেঞ্জি, মাথায় শালু কাপড়ের হালকা পাগড়ি (ফিতার মতো) ও হাতে লাল রুমাল ব্যবহার করে। পায়ে নূপুর বেঁধে হাতের লাল রুমাল ঘুরিয়ে ওরা বাহার দেয় ও নাচে। তবে বয়াতী সাধারণত পায়জামা পাঞ্জাবি কিংবা ধূতি-পাঞ্জাবি ব্যবহার করেন এবং বৃত্তের চারদিক ঘুরে ঘুরে নিজের হাতে রক্ষিত পুঁথি থেকে কাহিনী শুরু করেন। ময়মনসিংহে দোহাররা চটি ব্যবহার করে কিংবা হাততালী সহ মুখে 'আহা বেশ বেশ' বলে বাহার দেয়। মুর্শিদাবাদে সরু বাঁশ থেকে তৈরী দুটি ঝারন ব্যবহার করে প্রত্যেক জারীয়াল। ক্ষেত্র বিশেষে করতাল বা খঞ্জুরীও ব্যবহার করা হয় জারী গানে।

সাধারণত মহরম মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জারী গান গাওয়া হয়। তবে ১০ই মহরমই আসর সবচেয়ে জমজমাট হয়। অনেক দলকে আবার সারা বছরই জারী গেয়ে বেড়াতে দেখা যায়। উৎসবের দিন (১০ই মহরম) এই জারীয়াল দলকে ময়মনসিংহে দই চিড়া দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো এবং উত্তরবঙ্গে খাওয়ানো হতো খিচুরি।

জারী গানের উৎস মুসলিম ঐতিহ্য হলেও এর আবেদন সার্বজনীন। গ্রাম বাংলায় এক সময় এই জারীগান ছিল লোকজ জীবনের প্রাণস্পন্দন। এই জারী গান বহু যুগ ধরে বাংলার গ্রামীণ সমাজে গণমানুষের চেতনা বিকাশের অনন্য শিল্পরূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্পরূপের প্রয়োজনে অনেক সময় জারী গানের ভিতর ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায় থেকে যুৎসই উপমা টানা হয়েছে অবলীলায়। যেমন— মনসুর উদ্দিনের 'হারামনিতে' সংকলিত জারী গানের একটি কলিতে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, "রাম লক্ষ্মণ গেছেরে দুই ভাই অযোধ্যা ছেড়ে/ঐ রকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে" (হানিফার বিলাপ)।

১৩৭১ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ও চিত্তরঞ্জন দেব সংকলিত 'বাংলার লোকগীত কথা'য় সখিনা বিবির পালাটিতে মহরম পর্বকে একান্ত গৌণ করে দেখানো হয়েছে। এ পালাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে কাশেম সখিনার প্রেম-বিরহ ও পরিণতি। মহরমের জারী গানের আবেগ, মানবিক আবেদনের চিত্র ও আর্তি, অন্যদিকে করুণ ও বীর রসের প্রস্রবণ এখানে খাটো করে দেখানো হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দেব এই পালাটি সংগ্রহ করেছিলেন ইউসুফ মির্জা নামক জনৈক ফকিরের কাছ থেকে আর ফকির সেটি সংগ্রহ করেছিলেন ময়মনসিংহে তাঁর গ্রামের জনৈক জোলা মীনজুদ্দির কাছ থেকে। গীতিকাটি যেভাবে রচিত তাতে অনুমেয় হয় যে এটি জারী গানেরই সংকলন।

গ্রাম বাংলার অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতি যেমন সারি গান, কবি গান, একদিল গান, বাউল গানের মতো জারী গানও আজ শহুরে সংস্কৃতির সর্বনাশা প্রভাবে অবলুপ্ত প্রায়। কৃষি মেলা কিংবা শিল্প মেলায়ও বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রদর্শনীতে এক সময় জারী দলকে আনা হতো। ইদানীং তা-ও দেখা যায় না। আজ আর মহরমের বিষাদগাথা নিয়ে জারীয়াল দল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে না, আসর বসে না চাঁদনী রাতে নৌকায় কিংবা হেজাক বাতি জ্বালিয়ে কোন লোকালয়ে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে। বাড়ির বউ-ঝিরা কিংবা মুরুব্বিরা আর অপেক্ষা করেন না জারীয়াল দলকে আপ্যায়ন করবেন বলে। আকাশ আর শহুরে সংস্কৃতির সর্বনাশা আগ্রাসনে গ্রাম-বাংলার এই ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে প্রায়। বাংলার লোক-সংস্কৃতির এই ধারাটিকে জাগিয়ে

তুলে সুস্থ-সুন্দর মানসিকতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে গ্রামে-গঞ্জে কিংবা শহরে। অপসংস্কৃতির কড়াল গ্রাস থেকে বিশেষত গ্রামীণ সমাজকে বাঁচাতে জারি গান মোক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে আমরা বৃহত্তর ময়মনসিংহে গাওয়া কয়েকটি জারি গানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। জারি গানে অনেক সময় প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে। প্রশ্নোত্তর সহ একটি জারী গান :—

প্রশ্ন : হাতে আসা, গলায় তসবি, সবুজ পিরান গায়।
এই ব্যক্তি কোন সে জনা বলগো আমায়॥

উত্তর : হাতে আসা, গলায় তসবি সবুজ পিরান গায়।
জয়নাবের স্বামী আবদুল জব্বার বলি যে তোমায়॥
...(দোহার গন) আহা বেশ বেশ!!

প্রশ্নোত্তর ছাড়া জারী গান বন্দনা, এমনকি প্রশ্নোত্তরসহ জারী গান বন্দনা গেয়ে শুরু হয়। বন্দনা:—

পূর্বেতে বন্দনা করিগো পুবের ভানুশ্বর।
একদিগে উদয়গো ভানু চৌদিগে পশর॥
উত্তরে বন্দনা করিগো হিমালী পর্বত।
যাহার মধ্যে লইল জনম মালমের পাথর॥
হাত উঠাইয়া মারে পাথ্থর বুক পাতিয়া লয়।
বুকেতে পড়িয়া পাথ্থর খণ্ড খণ্ড হয়॥
...(দোহার গন) আহা বেশ বেশ...।
অথবা হায় হায়রে...।
পশ্চিমে বন্দনা করিগো মক্কা মদিস্তান।
যাহার মধ্যে লইল জনম কিতাব আর কোরান॥
দক্ষিণে বন্দনা করিগো ক্ষীর নদী সাগর।
যাহার মধ্যে বাণিজ করে সাহু সওদাগর॥
চারকোণা পৃথ্মিমী বর্ন্দি মধ্যে করলাম থীর।
শিরের আগায় তুইল্যা থইলাম আশি হাজার পীর॥
আশি হাজার পীর নারে সোয়া লাখ পয়গম্বর।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সবারই উপর॥
...(দোহার গন) আহা বেশ বেশ॥...ঐ।

অন্য একটি বন্দনা :—

আল্লা আমিন বল যত ও মমিন ভাই।
অসার ভবে দিন যায়রে সাধুনীরে ভাই॥
আল্লা নবীর নাম ভাইরে যার দিলে নাই।
সেই বান্দা দোযকে যাইব ভেস্তে জাগা নাই॥
নবী আতাব, নবী মাতাব, নবী ভেস্তের ফুল।
(দোহারগণ) হায় হায় নবী ভেস্তের ফুল॥
নবী নামে পাড়ি দিবাম পুলছেরাতের পুল॥
হায় হায়রে—দোযক হাছা, দোযক মিছা দোযক নৈরাকার।
এই দোযকে পুইড়্যা মরব বান্ধা গোনাগার॥

ভাই বল বন্ধু বল পথের পরিচয়।
মইলে নি কেউ সঙ্গে যাইব, কেউ কারও নয়॥

এবারে জারীর মূল গান আরম্ভ :
হায় হোছেন (অথবা হায় হায়রে...)
মায়ের আদরের দুলাল কাছুম কাঞ্চা সোনা।
জেহাদে যাইতে তারে মায় করে মানা॥
এজিদার সাথে রণে কাছুম না ফিরিব।
পূন্নিমাসীর চান্দোর হায় আবে যে ঘিরিব॥
...হায় হায়রে...দিশা।
কারবালায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে :
মায়ে রাঁড়ী, ঝিয়ে রাঁড়ী, রাঁড়ী বিবি সখিনা।
একই ঘরে তিন জনগো রাঁড়ী, খালি সোনার মদিনা॥

কারবালার যুদ্ধের ভয়াবহ পরিনতিতে মদিনায় মা ফাতেমার (যদিও তখন জান্নাত বাসিনী) কাছে কবুতরের মাধ্যমে খবর পাঠানো সংক্রান্ত জারী :
ওরে ও কবুতর, উইড়া চল মদিনার শহর।
মায়ের কাছে গিয়া কওগা আমরারই খবর
হাছেন হোছেন শহীদ অইল কারবালার শহররে
কবুতরের...দিশা।

ওখানে মদীনায় মা ফাতেমা হানিফাকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন :
'হানিফারে কোলে গো লইয়া কানছে ফাতেমা।
সব গেরামের লোক ও দেখি ইমাম দেখি না॥
ইমাম মোকে আন্ধাইর অইল সোনার মদিনা॥
হানিফারে কোলে গো লইয়া কানছে ফাতেমায়...দিশা

অন্য একটি জারী গান। গজলের সুরে শুধুমাত্র বয়াতী গায় :
আল্লায় বলে ও জিবরাইল যাওনা তুমি মদিনায়।
পুত্র শোকে কানছেন গো মায়ে বাতাস দেও তাহারই গায়॥
ফাতেমা কয় ও জিবরাইল বাতাস কেন করছো গায়।
পুত্র শোকে জ্বলছে গো আগুন বাতাসে কি নিভান যায়॥
জয়নাল এজিদের জেলখানায় বন্দি। তার জারী—

দিশা—কান্দে জয়নাল বন্ধন খানা ঘরে
হায় দুঃখু যায়না অন্তরে॥

বয়াতী—(হায় হোছেন) পত্র লেখে জয়নাল হায়রে আইংখে ঝুরে পানি।
পত্র ভইরা লেখে যত দুঃখের কাহিনী॥
পত্র লইয়া যাওরে কাছিদ মেওয়া জানির শ'র।
হানিফারে জানাও গিয়া দুঃখেরই খবর॥
বিছমিল্লা বলিয়া কাছিদ পন্থে মেলা দিল।
হরণ্য জঙ্গলার বাঘে মুড়ি যে ধরিল॥
আমারে খাইবারে বাঘ ও বাঘ ডরাই না যে তায়।

জয়নালের পত্র সাথে কি অইব উপায়॥
খাইতা চাও খাওরে বাঘ আমারে ধরিয়া।
জয়নালের পত্রখানি তারে আইস্যো দিয়া॥
এই কথা শুনিয়া বাঘরে কাইন্দ্যা জারে জার।
(দোহারগণ) হায়রে কাইন্দ্যা জারে জার।
জয়নালের উদ্দেশ্যে ছালাম জানায় বারে বার॥
আল্লারই কুদরতে বাঘের জবান খুইল্যা গেল।
বারে বারে কাছিদের ঠাঁই মাফ কছুরি চাইল॥
দৌড়িতে দৌড়িতে কাছিদ পন্থে মেলা দিল।
এমন সময় আল্লার কুদরত কোনবা কাম অইল॥
বালুর চরে দইর‍্যা একখান উডিল ভাসিয়া
দইর‍্যার পানি দেইখ্যা কাছিদ কান্দে পাড়ে বইয়া॥
দইর‍্যার ও না ঢেউ দেখিয়া কাছিদ কান্দে বইয়া।
কি করিবাম হায়গো আল্লা সময় যায় যে গইয়া॥
পার করলো আল্লা-রছুল পার কর আমারে।
তা নইলে কেমনে পত্র দিবাম হানিফারে।
আল্লার কুদরতে ভাইরে কোনবা কাম অইল।
আচম্বিতে নাও একখান পাড়েতে লাগিল॥
বাতাসে ইলায়া নাও রে পার করিয়া দিল।
এই মতে কাছিদ ভাইরে রওয়ানা অইল॥

কোন কোন জারী গানের আসরে দুতিন দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এ সময় বয়াতীগণ একে অন্যকে আক্রমনাত্মক মনোভাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে থাকে। দিশার মধ্যে প্রথমেই এই মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বয়াতীও সুবিধামত সেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকে। এ কারণে জারির দিশা দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি মূল ঘটনা সম্পর্কিত ও অন্যটি ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক যাতে মূল ঘটনার কোন সংশ্রবই থাকে না। ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই রূপ একটি দিশাঃ—

কান্দে বাচ্চা পানির লাগিয়ারে
হায়, পানি কে দিব আনিয়া রে॥
হায় হায় কাছিদ ভালা— হায় হায়রে কাছিদ ভালা।
মায় যদি না ভজে তারে
ভজিবে এজিদ কি-রে—
হায় হায় কাছিদ ভালা— হায় হায়রে কাছিদ ভালা॥

প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন দিশাগুলো গাওয়া হয়। শ্রোতামণ্ডলী এই জাতীয় দিশাগুলি বিশেষ ভাবে উপভোগ করে থাকেন।

এরূপ দিশার একটি উদাহরণ :

আ-কাডা মান্দারের নাও কে দিল সাজায়ারে—
(হায় হায়) এইডার ভিতরে বালু ভরারে॥
হগ্গল মাথা কামাইয়া মধ্যে রাখে চুল।
বাতাসে নাচায় ভাইরে শয়তানের লেঙ্গুর॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বারমাসী বা বার মাস্যা গান

'বারমাসী' একটি নিরেট পল্লী অঞ্চলের গান। এর বয়স মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সমসাময়িক বলে ধারণা করা হয়। লক্ষণীয় যে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারায় বারমাসীর একটি উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। এ সকল গানে বিদেশে বা ঘরের বাইরে অবস্থিত স্বামী বা প্রেমিকের জীবন ও মনের অসহনীয় ব্যথাকে প্রকাশ করা হয়। বারমাসীর প্রতিটি পঙ্ক্তিতে বিরহ-বেদনাজনিত মর্মপীড়া বেদনা মথিত হৃদয়ের অন্ত:স্থল থেকে অতি করুন রসে অভিষিক্ত হয়ে ফুটে ওঠে। প্রোষিতভতৃকা রমনীর স্বামী বিরহের অথবা নায়কের বিরহে নায়িকার যাতনা বারমাসী গানে মূর্ত হয়ে থাকে। এ গানে বাংলা বারমাসের প্রতি মাসের কোন বিখ্যাত রসনা তৃপ্তিদায়ক ফলমূল, শাকসব্জি ও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন পরিচিত ঘটনার বর্ণনা থাকে। স্ত্রী বা নায়িকার বিরহ-বিধোরা দৃশ্য ও স্বামী বা প্রেমিকের জন্য আহাজারি এ গানের মূল সুর।

এক সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহের সকল এলাকাতেই এই বারমাসী গান প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহ গীতিকার পালা গানগুলিতে এই বারমাসী গানের বর্ণনা রয়েছে। পালাগুলোর মধ্যে 'মদিনা' বা 'কমলা'র পালা দুটির বারমাসী বিশেষভাবে করুণ-রসাত্মক। বারমাসী প্রকৃত অর্থে বিচ্ছেদ গান। পল্লী কবিগণ এর রচয়িতা। অনেক সময় পল্লী কবিগণ 'লম্বা কিচ্ছায়' ও বারমাসী গান গেয়ে থাকেন। জারি, সারি, বাউল ও একদিল গানেও বারমাসী খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কোথাও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকাকে বারমাসী গান গাইতে দেখা যায়। তবে সর্বক্ষেত্রে যে বারমাসী বিরহ-বেদনাজনিত তা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। অনেক সময় বছরের পুবা দুঃখ কাহিনীও এতে গীত হয়। মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ফুল্লরার বারমাসীতে ছদ্মবেশ ধারিণী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার বর্ষব্যাপী দুঃখময় সংসার জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অন্য সব বারমাসী থেকে ভাব বৈচিত্র্যে এটি সম্পূর্ণভাবে অন্য ধাচে রচিত। বাংলা বারমাসের প্রতিটি মাসেই প্রবাসী স্বামী বা নায়কের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর বা নায়িকার অসহ মর্মপীড়াকে কবি সমব্যথী রূপে প্রকাশ করেন। নিম্নে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কয়েকটি বারমাসী গানের উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

(১) আমার প্রাণ বন্ধুয়া দেশে আইল না। ৮
কত মাইনষের আনিগুনি গো আমার বন্ধুর মত কেউরে দেখি না॥
সইগো, বৈশাখ গেল জষ্ঠি আইল আম কাডল পাইক্যা রইল গো
কত জনায় খাইয়া গেল আমার বন্ধে খাইল না॥
সইগো, আষাঢ় মাসে আইল পানি— শাওন মাসে নাও দৌড়ানী গো।
কত লোকে দেখল গিয়া আমার বন্ধে দেখল না॥
সইগো, ভাদ্দর আশিন সেও গেল— কাত্তি মাসে সামনে রইল গো।
গুয়া গাছে ছড়ি অইল বন্ধে আমার দেখল না॥
সইগো, আগুন মাসে দাওয়া মারি খাইতে মজা পিডা মুড়ি গো
আমার খেতের ধান কাটবো কে, পিডা মুড়ি অইলোনা॥

সইগো, পোষ-মাঘ আইল শেষে বন্ধু আমার নাইরে দেশে গো।
বিরথাই বিছাইলাম আমি লেপ তোষকের বিছানা॥
সইগো, ফালগুন মাসে গাছে গাছে কত ফুল ফুইট্যা রইছে গো।
আমার যৈবন অইল মিছে ভমরতো ফিরা্যা আইলোনা॥

(২) আইল না আইল না গো পতি-আইল না গো দেশে।
বৈশাখে কাডল মিডা জইষ্ঠে মিডা আম।
আষাঢ় মাসে ফুরায়া গেল লেচু আর জাম॥
শাওন মাসে শশা মিডা ভাদ্দর মাসে তালের পিডা।
আশিন মাসে জলপাই অইল-কাত্তি মাসে উল॥
কার লাগিয়া রান্ধিব আর খইলসা মাসে ঝুল॥
পোষ মাসে কাঞ্জি গো সই মাঘে মিডা তেল।
ফালগুনে গুড় আদা মিডা চৈতে মিডা বেল॥

উপরের বারমাসী গান দুটোর প্রথমটি নেত্রকোনা থেকে আর দ্বিতীয়টি কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকা থেকে সংগৃহীত। বারমাসী গানের সমঝদার শ্রোতা হলেন গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতজন। এ গানগুলোতে বিরহ-বিচ্ছেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিরহ-বিচ্ছেদ ছাড়া ও মনসিংহ জিলার (সম্ভবত সারা বাংলাদেশেই) পল্লী এলাকায় আরো একটি সাধারণ বারমাসীর খোঁজ পাওয়া যায়। এটি বাংলা বারমাসের কোন মাসে কোন ফল বা সবজিটি কিংবা বস্তুটি খেতে মজা তার আনুভোমিক বর্ণনা রয়েছে। অনেকে একে প্রবচন বা 'খনার বচন' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাইবেন কিন্তু আসলে এটি প্রবচন বা 'খনার বচন' নয় একটি নিরেট বারমাসী। পল্লী অঞ্চলের কোন কবিই এর রচয়িতা। বারমাসীটি এরূপ :

চৈতে চাইলতা—বৈশাখে নাইলতা
জৈষ্ঠে আম খই-আষাঢ়ে কাঁঠাল দই
শ্রাবণে বাসি পান্তা-ভাদ্দরে তালের পিঠা
আশ্বিনে শশা মিঠা।
কার্তিকেতে উল—অগ্রহায়ণে খইলসা মাছের ঝোল।
পৌষে কাঞ্জি-মাঘে তেল।
ফালগুনে গুড় আদা বেল॥

এ ছাড়া বিচ্ছেদ বাউল গানেও আংশিক বারমাসী গানের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন :

বিরহ-বিধোরা বধু গাইছে রায় ধারায় গান–
'আমি ঘুইরা ফিরি তার তালাশে বন্ধু নাইরে দেশে
জৈষ্ঠ না আষাঢ় গাঙে ভরা জোয়ার
মাঝি চলে মনের উল্লাসে।
ভরা নদী পাইয়া কত রসিক নাইয়া
নাও বাইয়া যায় দেশ বিদেশে॥
শাওন আর ভাদ্দরে গাছে পাকা তাল ধরে
আমার বন্ধু নাইরে এখন দেশে।

বন্ধু যদি আসিত তালের পিডা খাইত
মন মজাইতো আমার কাছে বসে॥

বাংলা একাডেমী একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বারমাসী গান সংগ্রহ করেছে কিশোরগঞ্জের পাগড়া গ্রাম নিবাসী করম আলী ফকিরের কাছ থেকে। সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার কলজের টুকরা নয়নের মনি ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর দাস্তে কারবালায় অসম যুদ্ধে শাহাদত বরণের করুণ রসাত্মক দৃশ্যের পর পুত্র-শোকাতুরা মা ফাতেমা পরপারে বেহেস্তে বসে সারাটি বছর ধরে কত যে বেদনায় কালাতিপাত করেছেন-এই বারমাসীটিতে সেই করুন চিত্র মর্মস্পর্শী রূপে বর্নিত হয়েছে। বিষয়, বৈচিত্র ও ভাব গাম্ভির্যে এটিকে একটি 'জারী' গানের মর্সিয়া অংশ হিসেবে ধরে নিলেও মোটেই অসংগত হবে না। এ গানটিতে নবী-নন্দিনী মা ফাতেমা যেন পুত্র-শোকাতুর বাংলার এক আবহমান জননী রূপে এসেছেন। এতে বাঙালি মাতৃসত্বার সার্বজনীন ও চিরন্তন বেদনায় সুর অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের মতে এই বারমাসীটি বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগত কারনে বাংলা সাহিত্যের লোক-সংগীতের ধারায় একটি অনন্য সংযোজন। এখানে স্বামী-বিরহে নয় পুত্র-বিরহে শোকাতুরা বাঙালি মায়ের শাশ্বত রূপটি ফুটে উঠেছে। বর্ণনার আতিশয্যে বাংলার কোন নাম না জানা কবি ধূসর আরবের মরুময় বুকে বাংলার চিরন্তন সুস্বাদু ফল ফলিয়েছেন, সেই ফল গাছে পেকে পচে যাচ্ছে পুত্রের চাঁদ মুখে তুলে দেয়ার ভাগ্য মায়ের হলো না। একটিবার যদি পুত্রের চাঁদ মুখের দেখা পেতেন, একটি বার যদি পুত্রকে কুলে নিয়ে মুখে চুমো দিতে পারতেন তবে কতইনা প্রশান্তি পেতেন মা! এ তো নবীর দুলালী বিশ্বমাতা নন। বাংলার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা এক চিরন্তন জননী। ছোট ছোট পংক্তির ভিতর দিয়ে শোকের যে গভীর ব্যঞ্জনা এতে মূর্ত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোন Tragedy-তে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। বারমাসীটি দীর্ঘ। তবু তা পাঠককূলের কৌতূহল নিবারনার্থ তুলে ধরা হলো :

হায় হায় ফাতেমা কান্দে আরশে ধরিয়া,
ইমাম উছেন শহীদ অইছে কারবালাতে গিয়া।
ফাতেমার বলন্ত ইমাম দুইন্যাই ছাইড়াছে,
চান্দ মুখে জোয়াব নাই মা মলিব কে?
আল্লা পরথম কার্তিক গো মাসে যাদু যায়গো রণে,
আসিব কি না আসিব অরসিত মনে।
সোনার পালঙ জোড়-মন্দির খালি রইল পড়িয়া,
কোথায় গেল ইমাম উছেন জননী ছাড়িয়া।
হায় হায়রে— আগুন মাসে ফাতেমা গো সবে খায় ন'য়া
দৈ-দুধ সব-লনী সবে খায় মেওয়া।
রান্ধিয়া বাড়িয়া অনাথ কারবা পাতে ঢালি,
কে বলিব মা বলিয়া এই না দুঃখে মরি।
হায় হায়রে—পোষ মাসে ফাতেমা গো ইন্নছ স্থানের ভাও,
কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোন স্থানে যাও।

কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোলের লইল মণি,
দেখিলে প্রাণ জোরাজুরি না দেখিলে মরি।
হায় হায়রে—মাঘ মাসে ফাতেমা গো জারে কম্পমান,
অন্তরে আগুন গো জ্বলে তলে বড় টান।
সূতার কাপড় তুলার বালিশ তুইল্যা লইল কোলে,
দারুণ শিমুলের বালিশ মুখে রাও না করে।

হায় হায়রে— ফাগুন মাসে কোকিল বলে দুলা মিয়া কই,
চলিলাইন গো ফাতেমা সিন্নি লইয়া অই।
মদিনা বিছড়াইয়া মাগো শা মূর্তজা আলী,
মালখানা ঘরেতে দেখে জোরে পালং খালি।

হায় হায়রে— চৈর্তিক মাসে ফাতেমা গো মক্কা হইল ছাড়া,
সারা দুইন্যাই খুঁইজ্যা মাগো অইয়া গেল সারা।
হোসেন-শা মূর্তজা আলী যদি অইত আমরার বাপ
তে কেনে এজিদার পালে দিত এত তাপ।
বরকত জননী যদি অইত আমার মা
তে কেনে মরণ কালে পানি পাইলাম না।
হায় হায়রে— বৈশাখ মাসে ফাতেমা গো কি করুইন বসিয়া,
তোমার যাদু কান্দন করে কাড়া শির লইয়া।
ডাইন হস্তে কঙ্কেনা বান্ধা বাম হস্তে কপাল,
আড়াই দিনে আইছলাইন মাগো ইল্লাল্লার দরবার।
হায় হায়রে— ফাতেমা যে বলে জিবরিল তুমি আমার ভাই,
আজকা আন্ত ইমাম উছেন রইল কোন ঠাঁই।
আইন্যা দেও আইন্যা ভাইরে বলি যে তোমারে,
নয়নের পুতলী আমার আইন্যা দেও আমারে।
হায় হায়রে— জৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল গাছে নাই যে পাকে,
গাছের ফল পরিধন ডাইলে পাইকা থাকে।
গাছের ফল গাছে রইল না অইল ভক্ষণ,
মিরগ শীগারে গেল ভাই দুনুজন।
হায় হায়রে-আষাঢ় মাসে ফাতেমা গো করুইন বড় আশা,
দুই পুত্র দিয়াছে আল্লা খেলিতাইন পাশা
দিন ত গেল অবশেষে বেইল ত বেশি নাই,
আজকা অন্তে ইমাম উছেন কোথায় রইল দুই ভাই।
হায় হায়রে— আয়রে ও আয়রে উছেন আয় আয় মায়েরই কোলে,
আইছরে আঙ্গিনার মাঝে তুইল্যা লইব কোলে,
তোর মা ফইরাদী আইল অই আল্লার দরবারে।

হায় হায়রে-শাউন মাসে ফাতেমা গো ফজরে জাগিলাইন,
ইলহিদার ইলহিদার পানি দেও মাগো অজু করিবাইন।
অজু করিয়া মাগো ডাইনে-বাঁয়ে চায়,
আগুনেরই ধুয়া জ্বলে ফাতেমারই গায়।
হায় হায়রে— ভাদ্দর মাসে সকলে যে তালের পিডা খাইল,
সেই মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখলাইন।
ছাওয়াল ছাওয়াল বইলা মাগো স্বপনে জাগিল,
কোথায় রইলে বুকের ছাওয়াল বুকে দুঃখু দিল।
হায় হায়রে— আশ্বিন মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখিয়া,
কান্দিয়া উঠিল মাগো দুই পুতের লাগিয়া।
শিশুকালে পুত্র-শোগ দিলা যে আমারে,
সেই শোগ বাইট্যা দিলাম সগল ঘরে ঘরে॥

এই দীর্ঘ 'জারী গানের মর্সীয়া' জাতীয় বারমাসীটি কার রচনা বহু অনুসন্ধান করেও তা জানা সম্ভব হলো না। কিশোরগঞ্জের করম আলী গানটি মুখস্থ গেয়েছেন। তিনি গানটি শিখেছেন সম্ভবত কোন জারী গানের বয়াতীর মুখ থেকে যা বাংলা একাডেমীর সংগ্রাহক মহোদয় সংগ্রহ করেছেন।

গাইনের গীত

লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে ময়মনসিংহের অবদান এক কথায় বিস্ময়কর। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশের পর এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই বললেই চলে। গেল শতকের গোঁড়ার দিকেই প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহের গ্রাম্য সাহিত্য সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে বাংলাভাষী সকল জনগণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে যেমন হিন্দু গবেষকগণ যেমন চন্দ্রকুমার দে, কেদারনাথ মজুমদার, ডঃ কামিনী কুমার রায় দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার ঠিক তেমনই মুসলমান গবেষকগণ যেমন ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, সিরাজউদ্দীন কাশিমপুরী, রওশন ইজদানী ও মোহাম্মদ সায়েদুর রহমান, অধ্যাপক আজিমউদ্দিন পর্যন্ত ময়মনসিংহের লোকজ ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও ধারাটি যে বিস্ময়করভাবে জীবিত রেখেছেন তাতে আমরা সবাই গর্বিত। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছড়া, ধাঁধা, সংগীত, গীতিকা, লোকগাথা, লোকনাট্য, লোক-কাহিনী এসব অনেক বিষয়েই বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। লোক-সংগীতের সকল ধারা নিয়েই আমাদের গবেষক পণ্ডিতগণ বিস্তৃত অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তবে লোক সংগীতের একটি মানস-সম্পদ 'গাইনের গীত' সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আলোচনা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। চলতি প্রবন্ধে লোক সংগীতের এই অবহেলিত ধারাটি সম্পর্কে বিস্তৃত একটি ধারণা পাবার প্রয়াস চালাবো।

'গাইনের গীত' বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এককালে ব্যাপক প্রচলন ছিল। বর্তমান গাজীপুর, ঢাকা, নরসিংদী হয়ে ভৈরব, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা অঞ্চলে এটি উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ ছিল এর উৎকৃষ্ট চারণভূমি। ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত এর যৌবনকাল। ময়মনসিংহের কোন অঞ্চলে এখনও 'দানরী' ও 'সাপের ঝাড় ফুঁকে'র সাথে এ কালেও গাইনের গানের অংশ বিশেষ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ময়মনসিংহের পল্লী অঞ্চলের গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা উপস্থিত কোন বালা-মুসিবত থেকে রেহাই পাবার জন্য 'একপালা গাইনের গীত' মানসিক করতো। পরে সুযোগ বুঝে নিজেদের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে এই গাইনের গানের আসরের আয়োজন করতো। এটি মূলত একটি মুসলিম আচার। কালেভদ্রে হিন্দু বাড়িতেও এই গাইনের গীত অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। 'গাইনের গীত' পুঁথির বিষয়কে অবলম্বন করে গীত হয়ে থাকে। মূলত 'গাজী কালু চম্পাবতী' পুঁথির কাহিনীই এর উপজীব্য। তবে কোন কোন সময় 'সোনাভান', 'গুলে বাকাউলী' ও 'সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল' কেচ্ছা বা পুঁথি অনুসারেই এর বিস্তৃতি হতো। গাজী কালু চম্পাবতীর কাহিনী ব্যাপক জনপ্রিয় বলে ও বহুল গীত বলে গাইনের গীতের 'গাইন'কে 'গাজীর গাইন' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতজনের মতে গাজী, কালু ব্যাপক ক্ষমতাধর আধ্যাত্মিক ও কেরামতী শক্তিতে বলীয়ান। বিপদ আপদ বা বালা মুসিবত থেকে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কেরামতি দ্বারা অদৃশ্যভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ কারণেই পল্লী অঞ্চলে 'গাইনের গীত' মানত করা হয়ে থাকে।

কবিগানে যেমন 'কবিয়াল', জারী গানে যেমন 'বয়াতী' ঘাটু গানে যেমন 'সখীন' থাকে ঠিক তেমনই গাইনের গীতে থাকে একজন 'গাইন'। গাইন গাইনের গীত গায় বলে 'গাইন' নামে অভিহিত হয়ে থাকে, 'গাইতে গাইতে গায়েন, আর বাজাইতে বাজাইতে বায়েন' গাইনের গীতে 'গাইন' তদ্রূপই। তার সঙ্গীয় বাদক দলকে 'বাইন' এবং তার প্রধান সহকারী হচ্ছে 'পাইল'। প্রয়াত লোক সাহিত্য গবেষক সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরীর ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের লোক-সংগীত পরিচিতি'তে 'গাইনে'র চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রওশন ইজদানী তার গ্রন্থ 'মোমেনশাহীর লোক সাহিত্যে'ও 'গাইনের গীত' অংশে গাইনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গাইনের পোশাক সম্পর্কে বলেছেন, 'গেরুয়া রঙের পোশাক এদের পরিধেয়'। আমরা ছোটবেলায় ময়মনসিংহের নানা জায়গায় যে গাইনের গীত অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি তাতে কখনও কোন গাইনকে 'গেরুয়া রঙের পোশাক' পড়তে দেখিনি। দেখেছি লাল সালু কাপড়ের ঘাগরি ও লাল কাপড়েরই 'ফতুয়া' গায়ে দিয়ে গান গাইতে। আমাদের মুরুব্বিরা যারা এখন অশিতীপর তাদের সাথে আলাপ করলেও আমার বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। মার্চ ১৯৭৮ সনে ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আজীজুল হক চৌধুরী তাঁর 'লোক সংগীত' প্রবন্ধের 'গাইনের গীত' অংশে গাইনের পোশাক সম্পর্কে রওশন ইজদানীর বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, 'গাইন আসরে উঠার আগে পোশাক পরিবর্তন করে।' রওশন ইজদানী সাহেব এই পোশাক সম্পর্কে লিখেছেন 'গেরুয়া রঙের পোশাক এদের পরিধেয়'; কিন্তু আমি ময়মনসিংহের নানা স্থানে যে গাইনের গীত শুনেছি, সেখানে কোন গাইনকেই গেরুয়া রঙের পোশাক পরতে দেখিনি। অধিকাংশ গাইনই গান গাইবার সময় লাল রঙের ঘাগরি (ছায়া) এবং ব্লাউজ পরিধান করে।" প্রত্যেক গাইনের সঙ্গেই উপরে অর্ধচন্দ্র স্থাপিত একটি লৌহ দণ্ড থাকে। এটিকে তারা 'আশা' বলে থাকে। গ্রামীণ লোকদের বিশ্বাস এটি গাজী জিন্দাপীরের 'আশা'রই প্রতিকৃতি। যা দিয়ে যুদ্ধ করে গাজী জিন্দাপীর 'দক্ষিণা রায়কে' পরাস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এই 'আশা'টির অপূর্ব ক্ষমতা আছে বলেই তাদের বিশ্বাস। এছাড়াও গাইনের হাতে থাকে প্রায় আধহাত লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড যার মাথায় আবার এক গুচ্ছ কালো চুল ঝুলানো থাকে। গাইন গান গাইবার আগে তার আশাটি মাটিতে পুঁতে এবং কাষ্ঠদণ্ডের চুলগুলি পানিতে ভিজিয়ে নিজের গায়ে ও শ্রোতাদের গায়ে পানি ছিটা দিয়ে ভেজা চুলসমেত কাষ্ঠটি আশার ওপর স্থাপন করে আশাটিকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে গান শুরু করে। গাইনের গীতে সাধারণ বাদ্যযন্ত্র হলো খঞ্জরী, মন্দিরা ও চটি। কোথাও কোথাও গাইনেরা একতারা, দোতারা, খমক ও মৃদঙ্গ অর্থাৎ ঢোলক ব্যবহার করে। অতি সাম্প্রতিক একটি গাইন দলকে অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রের সাথে মূল গাইনকে গলায় ছোট্ট হারমোনিয়াম বেঁধে গান গাইতে দেখা গেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল গাইনকে নৃত্যের সাথে খঞ্জরী বাজাতে দেখা যায়। অপরাপর বাদকগণ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায়। গান শুরু করার আগে সহশিল্পীবৃন্দ প্রথমে একবার বাদ্যযন্ত্র বাজায় যাকে তাদের ভাষায় কনসার্ট বাজনা বলা হয়। এটি যাত্রা দলের গান শুরু হওয়ার আগে যে বাজনা দেয়া হয় সেই রূপ একটি কনসার্ট। এরপর গাইন আসরে অবতীর্ণ হয়। শুরু হয় বন্দনা। বন্দনাতে আল্লা-রসূলের প্রশস্তি গেয়ে গাজী জিন্দাপীরের প্রশস্তি গাওয়া হয়। বন্দনায় কোন পুঁথির হামদ-নাতের প্রথমাংশ গাওয়া হয়। যেমন :

'আল্লা আল্লা বল ভাইগো নবী কর সার।
নবীর কলিমা পড় হৈয়া যাবে পাড়॥
আল্লা আল্লা বল ভাই গো যত মমিনগণ।
গাজী জিন্দাপীরের কথা শোন দিয়া মন॥
সোয়া লাখ নবী বন্দি আশি হাজার পীর।
সুন্দর বন মোকামে বন্দি গাজী জিন্দাপীর॥

তৎপর গাইনের দল নিজ পরিচয় দেয়, সালাম আদাব জানায় :

সভা করে বইছুন যত হিন্দু মুসলমান।
সবারই চরণে আমি অধমের সালাম॥
আমি অতি মূর্খমতি বিদ্যা বুদ্ধি নাই।
গীত গাইয়া শান্তি দিবার আমার সাধ্য নাই॥
বাড়ী মোর ভোলার চর নাম উমেদ আলী।
আপনাদের এইখানে আইয়া বিরক্ত করবাম খালি॥

এরপর শুরু হয় মূল পালা। গাজী কালুর বিভিন্ন কারামতী, যুদ্ধ ও চাম্পাবতী কন্যার কিচ্ছা বর্ণনা করা হয়। গাজী কালু চম্পাবতী পুঁথি থেকেই মুখস্থ করে তা গীত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে রঙ্গ রস :

গাজী বলে কালু ভাইগো আমার শল্যা লও।
আলের দুইডা বলদ বেইচ্যা মূরগী কিন্যা লও॥
মুরগী নাচে মুরগী নাচে চলে দুই ঠ্যাং থুয়া।
হউড়ী বউ এ কাইজ্যা লাগজে চেপা ভত্তা লইয়া॥

গ্রাম বা পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ গানের শ্রোতা। তবে নারীগণের প্রতি থাকে গাইনের বিশেষ নজর। কারণ নারীদের মানসিক করার কারণেই তারা এ গান গাইতে এখানে এসেছে। নারীদের প্রতি গাইনের কেমন নজর তা নিম্নে উদ্ধৃত একটি গাইনের গীত থেকে স্পষ্টতর হবে। এ গানে পুরনারীদের উত্তম ও অধম উভয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে :

নারী হাসি নারী খুশী নারী লক্ষ্মীর মূল।
নারী দুইন্যাই নারী আখের নারী ভেস্তের ফুল॥
মুখ আন্ধাইর‍্যা বেজার নারী-নারী মহাপাপ।
দুষী নারী গলার ফাঁসী দুজকেরই তাপ॥
পদ্মিনী নারীর সইল্লে পদ্মের ঘেরান।
আপন পতি বির্দুমানে নাইকা পরের টান॥
শঙ্খনীয়া নারী ভাইরে উড়া-উড়া মন।
দিবানিশি তার খালি সাজন আর পিন্ধন॥
হস্তিনীয়া নারী ভাইরে পায়ের গোছা মোটা।
সেইনা নারী রাইখ্যা যায় বংশের লাগি খোঁটা॥
নাগিনী যে নারী আছে গেলে তার পাশে।
ছয়না মাসের আয়ু কমে আইঞ্চলের বাতাসে॥

চিন্তনীয়া নারী ভাল্লা চিন্তায় থাকে মন।
দিবানিশি করে কেবল সোয়ামীর ভজন॥
থুম-থুমায়া হাঁটে নারী চোখ পাকায়া চায়।
রাক্ষসিনী সেই নারী খসম আগে খায়॥
উচকাপালী চিরল দাঁতী পিংলা মাথার দেশ।
সেই নারী করলে বিয়া ভরমে নানান দেশ॥
এক জাত্যা নারী আছে পাড়ায় পাড়ায় যায়।
এর কথা ওরে কইয়া পান সুবারী খায়॥
ঝেংড়া দিয়া কয় কথা দপদপায়া চলে।
সেই নারীর খসমের সংসার যায় রসাতলে॥
লাম্বা কাঁইকে চলে নারী, কথা ভাংগা সুরে।
সেই নারী করলে বিয়া অসুখ যায় না দূরে॥
ঢেসা মাইরা কথা কয় মিছা ঠমক মারে।
সেই নারী করলে বিয়া লক্ষ্মী পালায় দূরে॥
চিক্কন পায়ের গোছা ভাইরে মাথায় পাতলা চুল।
সেই নারী করলে বিয়া রয়না জাতি-কুল॥
আরেক জাত্যা নারী সদায় গাল ফুলায়া রয়।
ঘরের শান্তি নষ্ট করে খসমের দুখ অয়॥
হরিণ চৌখ্যিয়া জুড়া ভুরু সদায় হাসি মুখ।
সেই নারী করলে বিয়া সংসারে অয় সুখ॥
সইন্ধা বেলা যেবা নারী হলদি বিলায়।
হানজু বছর বেওয়া অইয়া বাপের বাড়ি যায়॥
সইন্ধ্যা বেলা যে নারী গিরহে দেয় না বাত্তি।
লক্ষ্মী তারে উইঠ্যা কয় এর কপালে লাত্তি॥
উডান ফুইর‍্যা যেবা নারী দক্ষিণে যায় ঝারা।
লক্ষ্মী আইবার চাইলে থাকে সীমানায় খাড়া॥
উগারে না উইঠ্যা নারী জোরে রাও করে।
লক্ষ্মী কয় ছেল মারছে আমার অন্তরে॥
দুপুর বেলা যেই নারী জুইড়া দেয় বারা।
লক্ষ্মী কয় হায় হায়রে ছাইড়া দিলাম পাড়া॥
সইন্দ্যা বেলা যেই নারী ঢেকিত ধান ভানে।
ষাইট দিনের রুজি তার কমে একদিনে॥
যেই নারী সইন্দ্যা বেলায় আছড়ায় মাথার চুল।
তার সংসারে ঝগড়া বিবাদ সদায় গণ্ডগোল॥
চুল ছাইড়্যা পাও মেলাইয়া যে বয় বিছানায়।
লক্ষ্মী তো ভাই দূরের কথা অলক্ষ্মীও ভয় পায়॥
রান্দিয়া-বাড়িয়া নারী সোয়ামীর আগে খায়।

তার স্বামী বাইরে গেলে জুতার বারি খায়॥
গোছুল কইর‍্যা যেইবা নারী কাপড় চিপে পায়।
হাতে দইর‍্যা চৌদ্দ পুরুষ দোযকে ডুবায়॥
গোছুল কইর‍্যা যেবা নারী মুখে দেয় পান।
লক্ষ্মী-মায়ে উইঠ্যা কয় সে আমারই সমান॥
সতী নারীর পতি ভাইরে মজিদেরই চূড়া।
অসতী নারীর সোয়ামী ভাঙ্গা নায়ের গোড়া॥
(অথবা) অসতী নারীর স্বামী ভাইরে শয়তানের ঘোড়া।

এখানে উল্লেখ্য যে রতিশাস্ত্র অনুযায়ী নারী জাতি চার প্রকারের হয়ে থাকে। এরা হলো পদ্মিনী চিত্রানী, শংকিনী এবং হস্তিনী। এই শাস্ত্র অনুসারে আবার পুরুষও চার প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন—মৃগয়া, শশক, বৃষ এবং অশ্ব। নারীর দিক থেকে পদ্মিনী এবং চিত্রালী প্রথম ও দ্বিতীয় এবং মৃগয়া ও শশক পুরুষকুলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পদ্মিনী নারী ও মৃগয়া জাতের পুরুষ সাধারণত: রাজকুলে জন্ম নেয়। এরা উভয়েই অত্যন্ত সুন্দর চেহারার, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা, যুক্ত ভ্রূ এবং জ্ঞানী-গুণী হয়ে থাকে। কোন জাতি পুরুষের সাথে কোন জাতি রমনীর মিল বা বিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নিয়ে একটি গাইনের গীতের উদ্ধৃতি :—

পুরুষ ও রমণীরে চারি জাতি জানি।
হস্তিনী শংকিনী নারী চিত্রানী ও পদ্মিনী॥
অশ্ব বৃষ পুরুষ জাতি, শশক আর মৃগয়া।
ভিন্ন জাতের চারি রঙের পুরুষ গেল হইয়া।
কোন জাতি পুরুষের সনে মিলে কোনবা রমণী॥
হস্তিনী শংকিনী...॥
অশ্ব জাতি পুরুষের সনে মিলে নারী হস্তিনী।
বৃষ জাতি পুরুষের সনে মিলে নারী শংকিনী।
শশকে চিত্রানী মিলে মৃগয়াতে পদ্মিনী॥
হস্তিনী শংকিনী...।
কি বলবো ভাই নারীর কথা পদ্মিনী নারীর লক্ষণ,
রাজকুলে জন্মে নারী বিদ্যা বুদ্ধি সদায় মন।
রূপেতে যে লক্ষ্মী বটে গুণেতে বীনাপাণি
...ঐ॥
চিত্রানী ও সেইরূপ চটে রূপ ধরেনা অঙ্গেতে,
হাঁটে নারী হংসির মত মুখ ভরা ভঙ্গিতে।
চিরল দাঁত নাক খাড়া কাল তার মাথার বেণী॥
...ঐ॥
কি বলব ভাই নারীর কথা শংকিনী নারীর লক্ষণ,
দেখিতে সে কৃষকায়া টেরা তার চৌক্ষের গঠন।
যে হইয়াছে এমন নারী সে জগতে কলংকিনী॥

কি বলবো ভাই নারীর কথা নামে সে যে হস্তিনী,
বুক উঁচা পাছা মোটা দেখিতে হস্তির মতন।
মতি তার রতি কর্মে বাঁকা চোখের চাহনি॥
...ঐ॥

নেচে নেচে বাজনার তালে অপূর্ব শারীরিক ভঙ্গিতে গাইন গেয়ে চলে তার কিচ্ছা। তার বর্ণনার রকম-সকম বড় মজাদার, উপাদেয়। মজাকে আরও মজাদার করতে হয়তো সে গেয়ে উঠবে একটি অপ্রাসঙ্গিক গান যেমন:

পিন্ধনে পাটের গো শাড়ী, অঙ্গ দেখা যায়।
শাহজাদা উইট্যা বলে যৈবন দেখা যায় গো...

এখানে পাইল তখন দিশা ধরবে, যেমনঃ—

ওরে আমার মন-চোর, চুরি কইর্যা নিলে আমার মনডারে

অথবা [ঘুরিয়া বেড়াই দুনিয়ার মাঝে, মনের মানুষ পাইলাম না॥
শ্রোতা মন্ডলীর মধ্যে কোন বুড়িকে দেখে গাইন গায় :
ওগো আদরের নানী, গৌরীপুরের ভাইছাব আইছে
নাইওর যাইবানি॥]

যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্য করে গাইনের গান :

ওলো ভিন দেশী ছেরি তুমি বড়ই সুন্দরী
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া লো॥
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া।
মাঁজা চিকন বাঁকা নয়ন সোনার নূপুর পায়।
সন্দ্যা বেলা ঘাটে আইলে জলের ছলনায়
জ্বালা কি দিয়া নিভাই ও ছেড়ি বল কোথায় যাই
পাগল করলে তোমার রূপ দেখাইয়া লো॥
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া।

গাইনের গীতে 'পাইল' বড়ই রসিক হয়। তার ভূমিকাও বড় আনন্দদায়ক। সে মাঝে মাঝে এমন মজার কৌতুকময় গান পরিবেশন করে তাতে সকল শ্রোতার মনোরঞ্জন হয়। এতে প্রচুর রঙ্গরস ও হাস্য-কৌতুক থাকে। যেমন গাইন বাইরে হয়তোবা তামাক-বিড়ি খেতে গেছে এই সুযোগে পাইল শুরু করলো রঙ্গরসের গান :

গাইন গেছে উক্কা খাইত, আমি কিছু কই
হিয়ালে যে বড়ই খাইছিল্, লবণ পাইছিল্ কই?
কথার নাই মাথা বেঙে চিড়া খায়
বাপে বিয়া করবার আগে পুত হওড় বাইত যায়॥
ছাগল পালে পাগলে নিত্যি ছিড়ে দড়ি।
হাজার টেহার বাগান খাইয়া লেদায় বড়ি বড়ি॥
মইন্যার মায় গইন্যা খাইল সাত কাডলের কুশ।
নানার দাঁড়িত কষ লাগছে আমার কিবা দুষ॥
ছুইত্যার বউ হুইত্যা রইছে খেতা মুড়ি দিয়া।

উইল্যা বিলাই চাইয়া রইছে ভাঙ্গা বেড়া দিয়া॥
উত্‌মা কয় উতমীরে রাইত পোয়াইয়া গেল।
তাড়াতাড়ি লইয়া আইও কেরাসিনের তেল॥
সারা-রাইত গীত গাইলাম মড়ল সায়বের বাড়িত।
খালি মুখে তুইল্যা দিল ভাঙ্গা গরুর গাড়িত॥ ইত্যাদি।

এরই মধ্যে গাইন এসে হাজির হয় আবার আসরে। শুরু হয় নতুন দিশা :

পান দিলে সুবারী লাগে আরও লাগে চুন।
নাইলে—মুষিয়া মুষিয়া জ্বলে পীরিতের আগুন॥
পানেতো মুখ লাল না অয়, লাল অয় চুনে।
রূপ দেইখ্যা না পাগল অইছি, পাগল অইছি গুণে॥

এবার গাইনের গীত শেষ। দলের বিদায় নেয়ার পালা। শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে গাইন গাইছে :

ভুল তিরুডি মাপ করবাইন সভার গুণীজন।
বিদ্যা-বুদ্ধি নাইগ্যা আমরার মূর্খ অভাজন॥
ভালা-মন্দ যাই গাইলাম বাড়ি-অলা ভাই।
পান-সুবারী দেউহাইন আমরা বিদায় অইয়া যাই॥
বাড়ি-অলা গাইনের দলের লউহাইন ছেলাম।
পান-তামুক না খাওয়াইলে করিবাম বদনাম॥

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় গাইনের গীত একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনও নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে এর কম-বেশি প্রচলন দেখা যায়। কোন ও কোন সময় নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ থেকে গাইন ও পাইল এসে বর্তমান ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল জেলায় পল্লী অঞ্চলে গাইনের গীত গেয়ে থাকে। ময়মনসিংহ সদরের গ্রাম অঞ্চলে 'কলতার রোগী' ঝাড়ফুঁকেও এ সকল গাইনের গীতের কম-বেশি প্রচলন দেখা যায়।

সারি গান

সারি গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া ঐতিহ্যবাহী গান। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস অবধি এ গান গাওয়া হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে যেখানে বর্ষাকালে হাওড়-বাউড় পানিতে কানায় কানায় ভর্তি হয় তখনই অনুষ্ঠিত হয় এ জাতীয় গান। বিশেষ কোন দিনে 'নৌকা দৌড়' প্রতিযোগিতায় নৌকার চালকরা সম্মিলিত কণ্ঠে এই গান গেয়ে থাকেন। এটি নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতার প্রাণ স্পন্দন। এই গানের সুর, তাল ও লয় প্রতিযোগীদের মনে অশেষ উৎসাহ যোগায় যা তাদেরকে জয়ী করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উৎসব আর গান এ দুয়ের এক অপূর্ব মিত্রতা দেখা যায় ময়মনসিংহের নৌকা বাইচে। স্থানীয় ভাষায় দৌড়ের নৌকাকে বলা হয় 'দৌড়ের নাও', যারা বৈঠা বায় তাদেরকে বলা হয় 'বাইচাল', নৌকার দু'কিনারাকে বলা হয় 'বাতা' এবং তাদের গাওয়া গানকে বলা হয় 'হাইর'। যে স্থানে নৌকা দৌড় অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় 'আরঙ্গ'। সাজানো গোছানো দৌড়ের নাও'র সৌন্দর্য এবং তার বাইচালদের বিচিত্র সুর, একই সাথে একই নৌকার বাইচালদের একই তালে বৈঠা চালানো, পানির 'ছপাছপ' আওয়াজ অগণিত দর্শকের প্রাণে এক অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি করে। নৌকা বাইচ পশ্চিম বাংলাসহ সারাদেশে একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান। এবারে আমরা সারি গানের 'দৌড়ের নাও'-এর পরিচয় প্রদান করছি। এটি অন্য সব সাধারণ নৌকার মতো নয়। দ্রুত গতির উদ্দেশ্যে এ ধরনের নৌকা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে। সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকার নৌকা-বাইচের নাও এ আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দেখা যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের নৌকা বাইচের নৌকাও সর্বত্র এক আকৃতির নয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এবং ময়মনসিংহের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব কিছু এলাকা ছাড়া এই বাইচের নৌকা অনেকটা প্রাচীন ছিপ নৌকার মতো। আকার ও আকৃতির কারণে একে প্রাচীন ছিপ-নৌকা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাইচের নৌকা একেবার অপ্রশস্থ, মাত্র তিন থেকে ৪ ফুট প্রশস্থ, গলুই সরু ও লম্বা, দৈর্ঘ্যে ৮০ থেকে ৯০ ফুট। প্রতিযোগী নৌকাসমূহের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর বিচিত্র রঙের বাহার। অনেক সময় তা দেখতে রঙ-বেরঙের রঙ করা মাছ ধরার ছিপের মত বা ময়মনসিংহের হাহিনী (সাপিনী) সাপের মতো বা রঙ বেরঙের রঙ করা বাঁধানো লাঠির মতো। বাইচের নৌকার গলুইটিতে বিচিত্র রঙের মনোহর শোভা ফুটিয়ে তোলা হয়। আর যে সকল নৌকায় তা করা হয় না সেগুলোতে গলুই সালু কাপড়ে আবৃত রাখা হয়। নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ভাটি এলাকার বাইচ নৌকা আকার-আকৃতি ও বিচিত্র রঙের সমাহারের জন্য খুবই সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে থাকে। ওই এলাকার বাইচ নৌকার গলুই প্রশস্ত, ত্রিকোনাকৃতির গলুইটি অনেক দীর্ঘ হয় এবং তা পানির উপর দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণাকৃতির মতো। সাধারণত এসব নৌকার গলুই-এর দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, প্রস্ত ৩ ফুট থেকে শুরু করে শেষে মাত্র সিকি ফুট হয়ে সমাপ্ত হয়। নৌকার দ্রুতি বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ সকল নৌকা তৈরি করা হয়। আগা ও পাছা গলুই শিল্পসম্মত কারুকাজ ও বহু বর্ণে নিপুণভাবে চিত্রিত। সামান্য কিছু পার্থক্য বাদ দিলে সকল নৌকার গলুই রাঙানো পদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের। এই গলুই রাঙানোর মধ্যে গ্রাম্য সুতার ও চিত্রকর গরে রঙ নির্বাচন ও চিত্রাংকন নিপুণতায় এক বিস্ময়কর প্রতিভার সন্ধান মিলে। গলুই ছাড়াও

'নৌকার মাথা কাঠ বা 'বাতা'সহ তার নিম্নাংশের ফুট খানেক পরিমাণ স্থানে সুন্দর ও রঙিন নানা আকারে লতাপাতা আঁকা থাকে। তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট দূরে দূরে 'গোড়া'গুলির উপরে লম্বা তক্তা দিয়ে মেঝে তৈরি করা হয়। এইভাবে তৈরি করা নৌকায় আড়ং থেকে যাত্রা শুরু করা থেকে প্রতিযোগিতা শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত কতগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম পালন করা হয়। আর এই নিয়মগুলিকে ভিত্তি করেই সারি গান গাওয়া হয়।

. 'দৌড়ের নাও' আড়ং থেকে যাত্রা শুরু করার সময় অনেক আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। নৌকার মালিকের স্ত্রী 'নববধূ' বরণের মতো ঘাটে বাঁধা নৌকার সামনের গলুইয়ে তেল সিন্দুর লাগিয়ে ধান-দূর্বা অর্পণ করেন। মালিক হিন্দু হলে গৃহবধূরা উলুধ্বনি দেয় আর মালিক মুসলমান হলে গৃহবধুরা পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অনেক সময় নৌকার কাছেই কিনারায় সামিয়ানা টাঙিয়ে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। খাসী জবাই করে বাইচালগণকে ভূরিভোজন করানো হয়। সর্বত্র থাকে উৎসবের আমেজ। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে নৌকায় মালিক ছোট ও সমান আকারের রঙিন বৈঠা গোড়ার উভয় পাশে সাজিয়ে রেখে আসেন। তারপর বাইচালগন নৌকাকে সালাম করে বদর পীরের এবং খাজা খিজিরের নাম নিয়ে নৌকায় উঠে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করেন। এ সময় ঢাক-ঢোল সানাই, বাঁশিতে আনন্দ রাগিনী বেজে ওঠে। এ জাতীয় দৌড়ের নাওগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে পিছনের গলুইয়ের নির্বাচিত বাইচালগণ দীর্ঘ রঙিন বৈঠা ব্যবহার করে আর অপরাপর বাইচালগণ অপেক্ষাকৃত খাটো বৈঠা ব্যবহার করেন। এ সকল বৈঠাকে 'পাতি বৈঠা' বলে। প্রতিযোগিতার সময় নৌকা বাওয়াকে বলা হয় 'ছুব'। পেছনের গলুই-এর বাইচাল 'ছুবে'র সময় দাঁড়িয়ে সমান তালে বৈঠা চালায়। প্রধান কাণ্ডারি বা 'শির খাড়ালী' দাঁড়ায় একেবারে সবার পশ্চাতে। 'ছুবের' সময় অনেক সময় সে শুধু দুপায়ের আঙ্গুলগুলো গলুইয়ের শেষ প্রান্তে স্থাপন করে, এটি তার দক্ষতার পরিচায়ক। মূল কাণ্ডারির একটু সামনে থাকে সহকারী কাণ্ডারি। তক্তার উপরে নৌকার মালিক, বয়াতী ও বাদকগণ দাঁড়ান। একটি বড় আকারের ঝান্ডাসহ মালিক দাঁড়িয়ে থাকেন। নৌকা দ্রুত বেগে সামনে অগ্রসর হবার সময় এই ঝাণ্ডাটি অনুকূল বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকে। কোন কোন নৌকায় আগা গলুইয়ে ঘাটু ছোকড়াও নৃত্য করতে দেখা যায়। নৌকার সামনের প্রথম গোড়ার দু'পাশে দু'জন অতি দক্ষ বাইচাল পাতি বৈঠা হাতে প্রধান কাণ্ডারির ইংগিত পাওয়ার পরপরই 'বদর' 'বদর' বলে বৈঠা চালায়, অন্যান্য সকল বাইচালগন ঐ দুজনকে অনুসরণ করে একই ভঙ্গিতে একই তালে, একই সঙ্গে বৈঠা চালায়।

'দৌড়ের নাও'-এর গতি ও ওজন হালকা-পাতলা রাখার জন্য বিশেষ কাঠ ও তক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়। জারুল ও 'রঙ্গী' (রাতা) এই নৌকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এক সময় ময়মনসিংহের পার্শ্ববর্তী জেলা সিলেট ও কুমিল্লা জেলায় 'দৌড়ের নাও' তৈরীর জন্য বিখ্যাত ছিল। সিলেটের চামারজানী ও কুমিল্লার ফান্দাউক এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। চামার জানীর পবন সূত্রধর ও কান্দাউকের সূধন মিস্ত্রি দৌড়ের নাও তেরীতে খুবই সুনাম অর্জন করেছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে ঐ দুটু এলাকায় জারুল ও রঙ্গী কাঠ বেশি পাওয়া যেত।

অনেকে সারি গানের মধ্যে ভাটিয়ালী গানের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ান। কেউ কেউ সারিগানে 'জারী' কিংবা 'ঘাটু' গানেরও মিল দেখতে পান। বিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষকগণের আলোচনা থেকেও সারি গানের স্বকীয় ও অবিকৃত চেহারা খুঁজে পাওয়া অনেক সময় খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। লোকসাহিত্য পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরেশ চক্রবর্তী : 'বাংলা লোকগীতির সুর বিচার' এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য:

'বাংলার লোক সাহিত্য' : পরিশিষ্ট-ক পৃষ্ঠা ৬০৪-৬০৫ গবেষকদ্বয়কে উদ্ধৃত করে জানান, : "সারিগান বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠ সংগীত বলেই এবং ছন্দোবদ্ধ কাজের সঙ্গে যুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল অপরিহার্যই নয়, বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ।" ভাটিয়ালী গানের সাথে সারি গানের পার্থক্য বুঝানোর জন্য ড. মনিরুজ্জামান এই উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করেছেন। 'পাকিস্তানের লোকগীতি'তে জারী ও সারি গান অংশে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেছেন, "সারি শব্দের অর্থ শ্রেণীবদ্ধ একদল কর্মরত মানুষের সমবেত সংগীত। কর্মের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলেই এ জাতীয় গানকে কর্ম সংগীতও বলা হয়ে থাকে। কর্মজনিত শ্রম-লাঘব, উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি চিত্তবিনোদন ও শক্তি অর্জনের জন্য সমবেত কণ্ঠে এ গান গাওয়া হয়।...ধান পাট নিড়ান বা ছাদ পেটা প্রভৃতি কার্যোপলক্ষে গীত গানও সারি গান।" এখানে উদ্ধৃতাংশের গবেষক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও বাংলাদেশের কর্মসংগীত আলোচনা করতে গিয়ে সারি গানকে কর্মসংগীত জাতীয় গানের সারিতে আবদ্ধ করেছেন। সারি গানের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণে একই প্রবন্ধে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম আরো বলেন, "পল্লীর চাষীরা দলবদ্ধভাবে পাটক্ষেত নিড়াণকালে বা ধান রোপণকালে মাঝে মাঝে সারিগান গেয়ে থাকে। তাদের সারি গানও নৌকা বাইচের সারি গান মূলত: একই। ছাদ পেটার গান ও সমগোত্রীয় গান। কৃষিকাজে সারি গান কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গীত হয়। ছাদ পেটার গানে বয়াতী সারিন্দা বাজায় ও গান গায়। নৌকা বাইচের সময় বৈঠা দ্বারা পায়ের নূপুরের তালে গানের তাল রক্ষা করা হয়। কৃষিকার্যে অঙ্গ সঞ্চালনে এবং ছাদ পেটার গানে ছাদ পিটানোর সরঞ্জামের সাহায্যে সেই তাল রক্ষিত হয়।"

ভাটিয়ালী গানের সাথে সারিগানের পার্থক্য বুঝানোর জন্য ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঐ একই প্রবন্ধে (বাংলাদেশের কর্মসঙ্গীত, লোকসাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা) ঐ রূপ বলে থাকবেন বলে মনে হয়। তবে পরবর্তী উদ্ধৃতিদ্বয় বাংলাদেশের কোন কোন এলাকার জন্য সঠিক হলেও ময়মনসিংহের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা বৃহত্তর ময়মনসিংহের সারি গান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ভাটিয়ালী গান সাধারণত ভাটির দেশে অথৈ পানিতে নৌকা ভাসিয়ে উদাস সুরে মাঝির একক কণ্ঠের গান। আর সারি গান মূলত সমবেত কণ্ঠে নৌকা বাইচের বৈঠা খেলার তালে তালে গাওয়া হয়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ড. মনিরুজ্জামান তা স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, "কিন্তু সারি গান সাধারণত সমবেত কণ্ঠের গান।... সারি দ্রুত তালের গান, ঠাস বুনানো ছন্দে দ্রুত তালে এগিয়ে চলে। উভয় গানই মাঝিরা গেয়ে থাকেন। কিন্তু এ দু ধরনের গানে পার্থক্য এসেছে পরিবেশের কারণে।" এ ভাবটি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে ড. জামান তাঁর প্রবন্ধে সুরেশ চক্রবর্তীকে উদ্ধৃত করেছেন, "ভাটিয়ালী একজনের গান বলেই এবং পরিবেশের এই নির্জন উদাস বিস্তৃতির জন্যই সুরের মধ্যে এই নির্লিপ্ত ধ্যান-গভীরতা রয়েছে"। এই উভয় গবেষকের কথায় একটি বিশেষ বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো— সারি গান গাওয়া হয় পানিতে নৌকা বাইচের সময় নৌকার উপরে। শুকনার কাজে আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধি, ক্লান্তি নাশ, সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই গান গাওয়া হয়ে থাকে এ সকল গান ও সারি গান কোনভাবেই এক ও অভিন্ন ভাবে গাওয়া হয় না। বৃহত্তর ময়মনসিংহের বেলায় 'তাদের সারি গান ও নৌকা বাইচের সারি গান মূলত একই' কথাটি মোটেও অভ্রান্ত নয়। এ সকল গান যেকোন গানই হতে পারে-ঘাটু, জারী ইত্যাদি তবে সারি গানের থাকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশগত সত্ত্বা। ময়মনসিংহে ছাদ পেটানোর গানে 'নাও

দৌড়ানীর হাইর'-এর অংশ বিশেষ মাঝে মধ্যে মিলিয়ে গাওয়া হয় তবে তা সর্বাংশেই ঘাটু বা ছম গান। মার্চ ১৯৭৮ সনে ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড প্রকাশিত 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থের 'লোক সংগীত' অংশের লেখকও একই ভাষায় বলেন, "ধান কাটা বা ক্ষেত নিড়ানীর সময়ও গান গাওয়া হয় ঠিক কিন্তু সে গান যেমন যে কোনও গান হতে পারে, ঠিক তেমনই একক কিংবা সমবেত কণ্ঠেরও হতে পারে। প্রসঙ্গত একটি কথা ভুললে চলবে না যে সারি গানে 'হাইরল' সমস্ত গান তৈরী করে এবং গেয়ে থাকে, নৌকার অন্যান্য সবাই শুধু যথাসময়ে দিশাটুকু গায়। ছাদ পেটানোর গানও এই রীতি অনুসারে হয়, কিন্তু ক্ষেত কাটা বা ক্ষেত নিড়ানীর গায়কের প্রত্যেকেই পুরো গানই গেয়ে থাকে আর কাজের বেলা হাত-পা নেড়ে বা কোমর দুলিয়ে তাল ঠুকতে গেলে আসল কাজ শিকেয় উঠবে, গেরস্থের বারটা বেজে যাবে।" ১৯৫৭ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের 'সারি গান' অংশে প্রয়াত লোকসাহিত্য গবেষক রওশন ইজদানী 'আগের হাল যে দিকে, পিছের হালও সে দিকে' পন্থা অবলম্বন করে বলেছেন, "নৌকা বাইচের সারি গান ছাড়াও মোমেনশাহী অঞ্চলে অনুরূপ এক সারি গানের প্রচলন আছে তা অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষী দল মাঠে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় কাজের তালে তালে গেয়ে থাকে। ইমারতের ভিত বা ছাদ গড়ার সময় সুরকি পেটার তালে তালে সারি গানে কাজ সম্পাদনের দ্রুততা বৃদ্ধি পায়, কর্মের মধ্যবর্তী অবসাদ নাশ করেও শ্রমিকের প্রাণে নতুন প্রেরণা যোগায়।" শ্রদ্ধাস্পদ রওশন ইজদানীর সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমরা বলতে পারি যে ছাদ পেটানোর সময় সুরকি পেটার তালে তালে যে গান গীত হয় তা ঘাটু গান আর ধান কাটা ও পাট ক্ষেত নিড়ানোর সময় ঐ রূপ তালে তালে গান গাইবার ফুরসত কোথায়? বরং এক্ষেত্রে গায়কের ধান না কেটে আঙ্গুল কাটার সম্ভাবনাই বেশি। আরো উল্লেখ্য, জনাব রওশন ইজদানীর নৌকা বাইচের বাইরে কোথাও সারি গান গীত হয় এমন কোনো সারি গানের উদ্ধৃতিই তার দীর্ঘ আলোচনার কোথাও ঠাঁই পায়নি। ইজদানী সাহেব ময়মনসিংহের লোক। তাঁর নিজ এলাকার কোনও লোকইতো তাঁর এ বক্তব্য গ্রহণ করবে না।

সারি গানের 'সারি' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সারি গানের 'সারি' শব্দের যে অর্থ করেছেন তা অত্যন্ত পরিষ্কার। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দেরই অর্থের সংকোচন, প্রসারণ ও অর্থ সংশ্লেষ ঘটেছে। তিনি একান্তভাবে সারি শব্দটির অর্থ সংশ্লেষের দিকেই নজর দিয়েছেন। ময়মনসিংহে এই 'সারি' শব্দটির অর্থের সংকোচন ঘটেছে ফলে তা শুধু 'দৌড়ের নাও বাওয়ার' গানকেই বুঝায়। তাই এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লোক সঙ্গীতের প্রবন্ধকার ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "তাই 'দৌড়ের নাও'র হাইর'কে দালানের মাথায় তো দূরের কথা শুকনায় তুললেই ময়মনসিংহের লোক হেসে বাঁচবে না।"

নৌকা বাইচ যে জায়গা থেকে শুরু হবে সে স্থানটির নামই হলো 'আড়ং'। নৌকা বাইচের আড়ং এর তারিখ পূর্ব থেকেই নির্দৃষ্ট থাকে। নতুন কোন স্থানে আড়ং হলে হাটে-বাজারে ঢোল সহরত করে তা জানিয়ে দেয়া হয়। পুরাতন আড়ং-এর কথা প্রতিযোগিদের আগে থেকেই জানা থাকে। তবু সে স্থান ও তারিখ পুন:বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার গ্রামেগঞ্জে ঢোল সহরত করা হয়। কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনার নিকলী, ইটনা, থানেশ্বর, বাদলা, শিমুলবাগ, তাড়াইল, মদন, মাওরা, গোবিন্দশ্রী, কদমশ্রী, তিয়শ্রী, বাস্তার এরন বিল, বাদলা, দৌলতপুরের নরুনসরের বিল, ময়মনসিংহ সদরের কালির বাজার, কেইলা বিল, ধলা এবং জামালপুরের দু'একটি স্থানে আড়ং অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

পর পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ চৌদ্দই আগস্ট (সাধারণত ভাদ্র মাসে) ময়মনসিংহ শহরের শম্ভুগঞ্জ ঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝে 'আড়ং' অনুষ্ঠিত হতে দেখা যেত। ময়মনসিংহের এই প্রতিযোগিতাটি সাধারণত সরকারিভাবে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হতো। তবে দীর্ঘদিন ধরে এখানে আর তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

সারি গানে 'দিশা' আছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ সকল দিশার তেমন কোন বিকৃতি ঘটেনি। বাইচালদেরকে কোন একটি 'দিশা' ধরিয়ে দিয়ে বয়াতী নিজের ইচ্ছামতো মিলিয়ে মিলিয়ে গানগুলি তৈরি করে থাকেন। কোন বিখ্যাত কবিয়াল কিংবা বাউল রচয়িতাগণ বয়াতীর কাজ করে থাকেন। আবার অধিকাংশ সময়ে বাইচালদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও কিছুটা শিক্ষিত তিনিই বয়াতীর কাজ করে থাকেন। দৌড়ের নৌকার মালিকগন অনেক সময় অন্য স্থানে থেকেও অভিজ্ঞ বয়াতী ভাড়া করে এনে থাকেন। সম্ভবত: এ কারণেই সারি গানে পালাগান, গাথা, জারী, ঘাটু, বাউল ইত্যাদি গানের কিছু কিছু অংশ চলে আসে। তবে তা সারির ঢংয়েই গাওয়া হয়। সমাজে প্রচলিত প্রবচন গুলি ও সারি গান থেকে বাদ যায় না। কোন কোন সময় উপস্থিত দর্শক মন্ডলীর মনোরঞ্জন কিংবা তাৎক্ষণিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে বয়াতীগন রঙ বেরঙের সারি গান বেধে থাকেন ও গেয়ে থাকেন।

সারি গানে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কোন গৃহস্থের 'দৌড়ের নাও' আড়ং-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে মালিকগিন্নী কি কি কাজ করে অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন তা পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এবারে দৌড়ের নাও যাত্রা শুরু করেছে। বয়াতী দিশা ধরলো :

আল্লা আল্লা বল ভাইগো নবী কর সার
নবীর কলিমা পড় হইয়া যাইবা পার॥

নাও ধীরে ধীরে আড়ং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বয়াতী গেয়ে চলেছে—

আল্লা তোমার নাম, তোমার কাম, তোমার মেহেরবানী,
তুমি দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়ে নেও পানি॥
অথবা
কালিদরে যাব আমি, ও-মা নন্দরানী
কালিদরে যাব আমি॥
মাগো, কালিদর সাগরের পানি নাগের বিষে কালা,
সেই-না নাগ মাইর‍্যা দূর করলাম বিষের জ্বালা॥
অনেক সময় বন্দনা গেয়ে এ যাত্রা শুরু হয়। বন্দনা এ রকম ঃ
পূবেতে বন্দনা করিগো আমি পূবের ভানুশ্বর গো,
একদিগে উদয়গো ভানু চৌদিগে পশর গো॥
উত্তরে বন্দনা করিগো ওরে ভাইধন হিমালী পর্ব্বত গো,
যাহার মধ্যে লইল গো জনম মালমের পাথর গো॥
পশ্চিমে বন্দনা করিগো ওরে ভাইধন মক্কা মদিস্থান গো,
যাহার মধ্যে লইল গো জন্নম কিতাব আর কোরান গো॥
দক্ষিণে বন্দনা করিগো ওরে ভাইধন ক্ষীর নদী সাগর গো
যাহার মধ্যে বানিজ করে চান্দু সওদাগর গো॥
চৌকোনা পৃথিমি বন্দি ওরে ভাইধন মধ্যে করলাম থীর গো,

শিরের আগায় তুইলা রাখলাম আশি হাজার পীর গো॥
আশি হাজার পীর নারে ওরে ভাইধন সোয়া লাখ পয়গম্বর গো
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সবারই উপর গো॥

এভাবে বয়াতী সারি তৈরি করে যাবে আর 'বাইচাল'গণ তালে তালে বৈঠা ফেলে 'দিশা' ধরবে। বাদকগণ তখন নৌকার মাঝখানে মেঝের তক্তার উপর দাঁড়িয়ে বাদ্য-বৃন্দ বাজাবে। মালিকসহ মোড়লগণ এক পা সামনে অন্য পা পিছনে ফেলে দুলকি তালে নাচতে শুরু করবে। পেছনের গলুই'র 'শির খাঁড়ালী' শুধু বৈঠা দ্বারা নৌকার গতি ও হাল ঠিক রাখবেন। অবশিষ্ট বাইচালগণ বৈঠার মধ্যভাগ ডান হাতে ধরে বৈঠার পাতা গলুইর ওপর স্থাপন করে একই তালে দুলকি নাচ শুরু করবে। প্রায়ই টিন দিয়ে তৈরি পেখমতোলা ময়ূর নৌকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সামনের গলুই বরাবর স্থাপন করা হয়। ছন্দে তালে হেলে-দুলে নৌকা যখন এগিয়ে যাবে, দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন একটি নৃত্যরত মনোরম পাখি সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। আড়ং-এ প্রবেশ করার সময় ও আড়ং থেকে ফেরার সময় পথে বহু সারি গান গাওয়া হয়। কয়েকটি সারি গানের দিশা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

দিশা (১) জল ভরিতে না লয় মনে প্রাণ সইগো
কেমনে যাব যমুনারই ঘাটে॥
বয়াতী- রাধিকা যমুনায় যায়গো হেলিয়া ঢলিয়া।
পাছে পাছে কানু চলে মূরলী বাজাইয়া॥ প্রাণ সইগো...
চলতে গেলে বাজে রাধার চরণ মেখুর
তার মধ্যে কাল মেঘে আসমান করল ঘোর॥ প্রাণ সইগো...
কেমনে জল ভরে রাধা মেঘে অইল আন্ধি।
মাডির কলস ভাইঙ্গা গেল হাতে রইলো কান্দি॥ ঐ

দিশা (২) সইন্ধ্যা বেলা যাই ও জলের ঘাটে সুন্দরীলো
কলসী বুরাইয়া দেম আমি॥
বয়াতী- কলসী বুরাইয়া রাই আইলো গাছের তলে।
গাছের না ফুল পড়ে কলসীর উপরে॥ কলসী বুরাইয়া...
আগে যদি জানতাম ফুল পড়বারে ঝরিয়া।
শাড়ীর আইঞ্চলে মুখ রাখিতাম ঢাকিয়া॥—ঐ
কলসীর ভারে অবশ রাই কলসী থইলো পথে।
সেই না কলসী ভাইঙ্গা ফেললো বিনন্দ রাখওয়ালে॥—ঐ
ভাঙ্গা কলসী লইয়া রাই কেমনে ঘরে যায়।
রাধা পড়লো বিষম ফেরে কানুর জ্বালায়॥—ঐ

দিশা—৩ ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ, রূপের বাহার গো
বাহার গো, ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ॥
বয়াতী- আউলা চুলের বাউলা খোঁপা বাহার তাতে নাই
বেণীর খোঁপায় ফুল গুজিলে পাগল অইয়া যাই
রূপের বাহার গো...॥

দিশা-৪ পিরিত কইরা যাইও না বৈদেশী বন্ধুরে
বন্ধুরে পিরিত কইরা ছাইড়া যাইও না॥

বয়াতী- পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত গলার হার।
ঐ যে পিরিত কইরা যেজন মরে সকল জন্নম তার॥ বৈদেশী বন্দুরে...
পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত বড় লেডা।
ছাড়াইলে ছাড়ান যায় না টেংড়া মাছের কাঁড়া॥...ঐ
বুড়া কালের পিরিত ভাইরে কাঁডলেরই কোষ।
যেনা বুঝে এর মজা তার জনম দোষ॥...ঐ

দিশা-৫ কোকিলার সুরে মায় কান্দেরে নিমাই চান সন্ন্যাসে যায়রে

বয়াতী— আরে সন্যাসী না হইও বাছা বৈরাগী না হইও।
নগরেতে ভিক্ষা কইরা দুয়ারে বইয়া খাও।
(অথবা) রূপায় বান্ধা বাঁশি বাছা চান মুখে বাজাইও॥...নিমাইচান
লেখাপড়া কইরা পন্ডিত হইলা বড়।
দুইন্যাই বুঝাইতে পার মারে কেনে ছাড়॥...ঐ
বাছিয়া করাইলাম বিয়া পন্ডিতেরো ঝি।
তুমি নিমাই সন্ন্যাস গেলে শচীর উপায় কি॥...ঐ
কোন দেশ থনে আইলা সাধু বসতে দিলাম পিড়া।
সেই দিন হইতে নিমাইর মন হইছে উড়া উড়া॥...ঐ

দিশা-৬ বাঁশি বাজে, বাজে রইয়া রইয়া—
গিরহে যাইতে মন চলে না প্রাণ বন্ধুরে থইয়া॥

বয়াতী— কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধারে চিনাইয়া।
পায়ে ধরি থামাও বাঁশি নাগর কানাইয়া॥...ঐ

দিশা-৭ বাঁশির সুরে যমুনা বয়সে উজান
আর বাঁশি বাজাই ও নারে শ্যাম॥

বয়াতী—ঐ যে-রইয়া রইয়া বাজে বাঁশি কাইড়্যা লয়রে প্রাণ।
দারুন বাঁশি হইরা নিল রাধার কুলমান॥--আর বাঁশি

দিশা-৮ কালাচান আমারে মজাইলে ওরে কালাচান পাগল করিলে।

বয়াতী— কাউয়া কালা, কুলি কালা, কালা মাথার কেশ।
চিরল দাঁতে মিশি দিয়া পাগল করলো দেশ॥...কালাচান
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশি কলংকিনী রাধা॥--ঐ
বাঁশি না বাজাইয়া কানু রাখে কদম ডালে।
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে॥...ঐ
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশি নারে জলে ভাইস্যা যায়।
বালুর চরে ঠেইক্যা বাঁশি রাধার গুণ গায়॥...ঐ

দিশা-৯ জলে-ঢেউ দিও না ঢেউ দিওনা ঢেউ দিও না গো প্রাণ সজনী—
আর জলে ঢেউ দিও না॥

বয়াতী—পুস্কুনীর চাইর পাড়ে তোতা-ময়নার বাসা।
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে কি আজব তামাশা গো॥ আর জলে...
পুস্কুনীতে নাইরে পানি কি করব তার সোতে।

যে-বা নারীর পুরুষ নাই কি করব তার রূপে গো॥...ঐ
আম গাছে নাইরে আম, কুঁড়া কেনে লাড়।
তোমার আমার নাই পিরিতি আংকী কেনে ঠার গো॥...ঐ

অনেক সময় বয়াতী দর্শক গনের অনুরোধে রঙ্গরসের সারি গানও গেয়ে থাকেন। এইরূপ একটি রঙ্গ-রসের সারি :

দিশা-১০ লতার ছালুন ভালা লাগেনা-কন্টুলের ভাবী গো-
ভাবীগো, লতার ছালুন ভালা লাগে না॥
বয়াতী— বারমাস্যা বাইগুন আছিল চোউখ্যে দেখলা না।
পাইব্যা মাছের হিদল লইয়া ছাউলনে দিলানা॥ কন্টুলের ভাবীগো—

ষাটের দশকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ সদর এলাকায় একটি রঙ্গরসের সারি গান :

দিশা-১১ রঙিলা দেওরা গো আঙ্গর করলানা ইরী ধান—
আঙ্গার করলা না ইরী ধান॥
বয়াতী— বন্দের বাড়ী বড় মিয়াজিরা করছে ইরি ধান।
সারা বছর খাইব সুখে লইয়া পোলাপান॥
রঙিলা দেওরা গো...॥

এভাবে বহু প্রকার, বহু ঢংয়ের সারি গান গেয়ে দৌড়ের নাও আড়ং এ গিয়ে হাজির হয়। আড়ং এ হাজির সকলকে নৌকার মালিকের পরিচয় দেয়া হয় এইভাবে ঃ

দিশা-১২ ওগো মিয়া বাড়ী কোন গাঁও।
বাড়ী আমরার কাইশ্যার চর
রাশিদ মিয়ার নাও॥ ওগো মিয়া--॥

প্রতিযোগিতামূলক নৌকা দৌড়কে 'ছুব' বলা হয়। 'ছুব' শুরু হলে সাধারণত সারি গাওয়া হয় না। 'ছুব' শুরু হওয়ার আগে ঃ—

দিশা-১৩ আল্লা ডাকি কাতরে পাড় কর সকল আমরারে॥
বয়াতী— তোমার নাম, তোমার কাম তোমার মেহেরবানী।
তুমি দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়ে নেও পানি॥
আল্লা ডাকি কাতরে॥
অথবা
দিশা-১৪ বন্ধু ডাকি কাতরে পাড় কর সকাল রাধারে॥
বয়াতী— যে আমারে করবে পাড়-তারে দিবাব গলার হাররে
আমার জীবন যৌবন দিবাম বিলাইয়া রে॥
পাড় কর সকাল রাধারে॥

ছুবের সময় সারিগান হয় না। বাইচালগণ তখন সমবেতভাবে একই তালে বৈঠা চালায়। তক্তায় দাঁড়ানো ব্যক্তিগণ তখন বাইচালদের বৈঠার তালে তালে কেউ করতালি ও লাঠির মাথা ঠুকে তাল রক্ষা করেন। এ সময় বয়াতী 'সাবাস ভাই', 'সাবুডি ভাই' বলে উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি করেন আর সকলে বলে 'হেইলুচ' বা 'হিঙ্গুইল'। ছুবের সময় অনেক সময় বিপজ্জনক ঘটনাও ঘটে থাকে। কোন একটি নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে, তার গতি মন্থর

করার জন্য পাশের নৌকার খাড়ালী এমন কৌশল করেন যে প্রথমোক্ত নৌকার বাতার সাথে তার নৌকার বাতা সংযুক্ত করে দেন। এতে সময় সময় ঝগড়ার উৎপত্তি হয়ে যায়। গোড়ার উপরে সাজানো তক্তার বা 'চেরটের' নিচে সড়কি রামদা থাকে, অবস্থা চরমে উঠলে অবলীলায় সেগুলির ব্যবহার হয়। অবশ্য যাতে তা না ঘটে সেদিকে বিশেষ ক্ষমতাবান মোড়লরা সজাগ দৃষ্টি রাখেন। দৌড়ে যে নৌকা জিতে তারা সারি গান গায়। অন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করে কিংবা চলে যায়।

জিতার সারি গান :

দিশা-১ লীলুয়া বাতাসে আইজ কেনে শ্যামের বাঁশি রাধা বলে।
রাধা বলে, বাঁশিরে আইজ কেনে শ্যামের বাঁশি রাধা বলে॥

দিশা-২ শুন ললিতে কই তোমারে, শ্যাম পিরিতের লাঞ্ছনা
শ্যামের পিরিত আমায় ছাড়লোনা॥
পুরস্কার নিয়ে এবার বাড়ি ফেরার পালা। সেই সময়ের সারি গান:

দিশা-৩ মায়ের কথা মনে হইলরে লক্ষ্মণ ভাই, ভাইরে চল ঘরে যাই।

বয়াতী— পিতা গেল পুত্র শোগে দুঃখের সীমা নাই।
ঘরে ছিল মা জননী, আছে কিবা নাই॥

দিশা-৪ বেলা গেল সন্ধ্যা হইল মায়ের আদরের ডাকে চল ঘরে চল।

বয়াতী— বেলা গেল সন্ধ্যা হইল রবি গেল ভাই।
মায়ের আদরের ডাকে চল ঘরে যাই॥

বাড়ীর ঘাটে পৌঁছার পর সারি গান :

দিশা-৫ নায়ের গলুইত ধান-ধূপ মাথায় তুইল্যা দে
ও আমার সোনামুখী ঘাটে আইছে।

বয়াতী— ঘাটে আইছে সোনার নাও আড়ঙ্গে জিতিয়া।
বালা খাওনের যোগাড় কর বাইচালের লাগিয়া॥

এ সময় সে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা নারী পুরুষ আবার ধান-দূর্বা দিয়ে দৌড়ের নাওকে বরণ করে নেয়। মালিক খাসী বা গরু জবাই করে বাইচালদের খাওয়ান। মুসলমানরা 'ইল্লাল্লাহ' জিকির করেন ও হিন্দুরা-কূলবধূরা 'জোকার' দেয়। মহা ধুমধাম হয় সেখানে।

লেখা শেষ করার আগে একটি কথা বলা দরকার। 'দৌড়ের নাওর' আগা গলুই গৃহস্থের ঘাট ছাড়া অন্য কোন ঘাটেই লাগানো হয় না। সব ক্ষেত্রেই নৌকার আগা গলুই ঘুরিয়ে পিছনের গলুই ঘাটে লাগানো হয়। প্রায় সর্বত্রই এ নিয়ম রক্ষিত হয়।

নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতাকে উপলক্ষ করে অনেক সময় ঝগড়া বেধে যায়। পুরুষানুক্রমে এই ঝগড়া। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সনে এই রূপ একটি ঝগড়া বাঁধে গৌরীপুর থানাধীন কাশিয়ার চর ও কোতোয়ালি থানাধীন দড়িভাবখানী গ্রামের মধ্যে। দড়িভাবখানী গ্রামের লোকেরা কাশিয়ার চরের দৌড়ের নাওটি শত শত লোকে মাথায় নিয়ে টানে তুলে ফেলেন এবং তা প্রয়াত পাষাণ আলী মণ্ডলের বিরাট পুকুরে এনে রাখেন। এই 'দৌড়ের নাও'টি দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত ফুট লম্বা ছিল। বিরাট পুকুরেও নৌকা আঁটতে চাইতো না। এ সময় আশপাশের গ্রাম ও শহর থেকে বহু লোক এই দৌড়ের নাওটি প্রতিদিন দেখতে যেতো। পরে অবশ্য গ্রাম্য হিতৈশী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তা মীমাংসা করা হয় এবং কাশিয়ার চরবাসীদেরকে তাদের নৌকাটি ফেরত দেয়া হয়।

বাউল গান ও গায়ক

বঙ্গদেশে কবে কখন বাউল গানের প্রচলন শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য পল্লী গান যেমন জারী, সারী, কবি ও ঘাটু গানের মতোই বাউল গান যে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের প্রাণস্পন্দন ছিল সে ব্যাপারে কোন পণ্ডিত কিংবা গবেষকই মতানৈক্য পোষণ করেন না। জারী, সারী, কবি কিংবা ঘাটু গান এখন বলতে গেলে গ্রাম বাংলায় প্রায় অনুপস্থিত। আকাশ সংস্কৃতির সর্বনাশা তোড়ে এখন এগুলো প্রায় ভেসে যেতে যেতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাউল গানের প্রচলন গ্রাম বাংলায় তার হারানো ঐতিহ্যকে কতক পরিমাণে হলেও ধরে রাখতে পেরেছে। গ্রাম বাংলায় এখনও হেমন্তের শুরু থেকে বর্ষার আগমন অবধি বাউল গানের আসর বসে। তবে এর জনপ্রিয়তা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছে। আজ আর আগের মত পর্ব-পার্বনে কিংবা হালখাতায়, নববর্ষে বাউলদের আসর বসে না। তবে একেবারে যে বসে না তা নয়।

বাউল গান মূলত ধর্মভিত্তিক গান। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের কাহিনী কিংবা তত্ত্বকথা নিয়ে দুজন বাউলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক গান এটি। দুজন বাউল শ্রোতাদের পছন্দ মাফিক দুটি ধারা নিয়ে প্রতিযোগিতা করেন। ধারাগুলো কোরআন হাদিস, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ধর্মীয় মহামানবদের জীবনী নিয়ে হয়। কোন কোন সময় আবার এর বাইরেও কোন ধারা নির্ধারিত হতে পারে। যেমন দিন-রাত্রি, নারী-পুরুষ ইত্যাদি পালা। একজন নারী হয়ে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যজন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। ধর্মীয় ধারা গুলুর মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী, শহীদে কারবালা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা রাম-রাবণের যুদ্ধ, শরীয়ত-মারফত, কিয়ামত তত্ত্ব ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয়। দেহতত্ব নিয়েও বাউল গান খুবই জমে ওঠে। গ্রাম্য বাজার কিংবা উন্মুক্ত কোন জায়গায় এই গানের আসর বসে সারারাত ধরে। ক্ষেত্র বিশেষে দিনের বেলায়ও এই আসর বসে। একজন বাউল তার প্রাপ্য ধারা মাফিক একটি তত্ত্বীয় গান গেয়ে শুরু করেন। তাত্ত্বিক গানের ধারাবাহিকতায় তিনি প্রতিপক্ষ বাউলকে তার ধারার কয়টি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন গুলো গানের মাধ্যমেও হতে পারে কিংবা স্বাভাবিক বাচনেও হতে পারে। তৎপর তিনি একটি বিচ্ছেদ গান গেয়ে বসে যাবেন। এবার প্রতিপক্ষ বাউলের পালা। তিনিও তার ধারা মাফিক গান গেয়ে প্রতিপক্ষের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিবেন এবং তৎপর অপর বাউলকে তার ধারা থেকে প্রশ্ন করবেন এবং যথারীতি একটি বিচ্ছেদ গান গেয়ে বসে যাবেন। এই ভাবে পালাক্রমে চলবে গান ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। বিচ্ছেদ গানগুলো আবার দুটি ধারাতে হতে পারে যেমন শ্যামধারা ও রায়ধারা। যিনি শ্যাম ধারা নিবেন তিনি সমস্ত বিচ্ছেদ গান শ্যামধারা মারফত ও যিনি রায়ধারা নিবেন তিনি রায়ধারা মারফতই গান গেয়ে যাবেন। এতে কোন ব্যত্যয় ঘটতে পারবে না।

মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতির অঞ্চল ময়মনসিংহ বহু পূর্বকাল থেকেই বাউল গানে সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার হাওড়, বাঁওড়, নদী-নালা, খাল-বিল পরিবেষ্টিত সমতল ভূমি বাউল গানের চারনভূমি হিসেবে খ্যাত। উনবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে বিংশ শতাব্দির সত্তরের

দশক পর্যন্ত এই অঞ্চলে বাউল গান, গান রচয়িতা ও গায়কদের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বাউল গায়ক ও বাউল গান রচয়িতার আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে ফকির উমেদ আলী জালাল খাঁ কানা জইমত, উকিল মুন্সী, আলী হোসেন আবেদ আলী, তালে হোসেন, সিরাজ আলি, চান মিয়া, প্রভাত কানা সারা বঙ্গদেশেই বাউল গান রচনা করে ও বাউল গেয়ে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক বাউল এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে এই শিল্পকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। বাউল গানের প্রবাদপুরুষ গীতিকার মোঃ জালাল উদ্দিন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২) পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ মরমী গানের রচয়িতা। বাংলাদেশে তার রচিত বাউল গানগুলি কেবল ফকির লালন শাহ ও হাসন রাজার রচিত মরমী গানের সাথেই তুলনীয়। সংখ্যার দিক দিয়ে তিনি প্রায় লালন শাহের সমপরিমাণ গানই রচনা করেছেন। বর্তমান নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার সিংহেরগাঁও গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বিশ্ব রহস্য' নামে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থও রচনা করেন। বাউল গান রচনার ভূবনে তিনি কিংবদন্তিতুল্য। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে এমনকি পশ্চিম বাংলায় ব্যপকভাবে তার গান গীত হয়। শোনা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ওপর গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের আরেকজন বিখ্যাত বাউল গায়ক হচ্ছেন কানা জইমত (১৮৮৯-১৯৪৯)। তিনি বর্তমান ময়মনসিংহ জিলার সদর উপজেলার চরগোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নামে কানা জইমত হলেও তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী, শুনে শুনে ও মুখে মুখে গান রচনা করতেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে ময়মনসিংহ জেলখানা ভেঙ্গে যায়। এ উপলক্ষে তিনি যে বিখ্যাত গানটি রচনা করেছেন তা আজ চর্চার অভাবে বিস্মৃতপ্রায়।

গানটির ভাষা ছিল এইরূপ—"ঘটল আজব লীলা, ময়মনসিংহ জিলা, সোমবারে বৈকাল বেলা ভাঙ্গলো জেলখানা/ ১৩৩৯ সনে, বৈশাখেরই ছাব্বিশ দিনে, আসিয়া দারুণ তুফানে লাগায় লাঞ্ছনা। দালানকোঠা ভাইঙ্গা পড়ে, কত কয়দি পইড়া মরে, কত কয়দি ভাগে ডরে নিষেধ শুনে না। তুফান আইসা মারে ঠেলা, সবেই বলে আল্লা আল্লা, ভাঙ্গলা দালানের মাল্লা বাকি রাখলা না। তুফান আইসা জোর করে, সব বাবুরা চিৎকার পারে, হরি যদি উদ্ধার করে বায়োস্কোপ দেখব না॥'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কানা জইমত এই দুর্ভিক্ষের স্মরণে যে গানটি রচনা করেন এক সময় তা মানুষের মুখে মুখে ছিল। আজ তাও হারিয়ে যেতে বসেছে।

গানটি এ রকম, "পাপের জন্য লক্ষ্মীশূন্য, জমিনেতে হয় না ধান্য, দেশে আইল দারুণ দুর্ভিক্ষ/পাপেরই কারণে, লক্ষ্মী গেল অন্তর্ধানে, অলক্ষ্মী আসিয়া দেশে করে রাজত্বী/জমিনেতে ধান্য হয়না, গাভীর বানে দুধ মিলে না, মায়ের বুকে দুধ আসে না ছেলে খাবে কী/বিশ টাকা চাউলের মন, একখানা হৈল লবন, বার আনা কাপড়ের গজ, পাঁচ টাকা সের ঘি"॥

কলমজান নামে তার খুব সুন্দরী স্ত্রী ছিল। শোনা যায় একবার তার সুন্দরী স্ত্রীকে বদমাইশরা জোর জবরদস্তি করে নিয়ে গিয়েছিল তিনি এ উপলক্ষেও একটি সুন্দর গান বেঁধেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও গানটি উদ্ধার করা গেল না। তার একটি লাইন এমন

ছিল, "যখন গেলাম কলের ধারে, দুই শয়তানে যুক্তি করে, ধইরা ফেলা জইমতেরে বিবি কলম জান"। এই স্ত্রী নিয়ে কোর্টে মামলা হয়েছিল এবং তিনি মামলায় জিতে স্ত্রীকে ফেরত পেয়েছিলেন।

বাউল গান গেয়ে এবং রচনা করে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন যিনি তার নাম ফকির উমেদ আলী (১৯০১-১৯৭১)। তার জীবদ্দশায় তিনি বাউল সম্রাট হিসাবে সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিলেন। তার জন্মস্থান বর্তমান গৌরীপুর উপজেলাধীন ভোলার আলগী গ্রাম। তিনি প্রথম জীবনে কবিয়াল হিসাবে আবির্ভূত হলেও ১৯৩০ সন থেকে তিনি নিয়মিত বাউল গান শুরু করেন। তিনি কবি গানের সাথে সাথে প্রথম যৌবনে কীর্তনও গেয়েছেন। তিনি মুক্তাগাছা গৌরীপুর, আঠার বাড়ী, সেন বাড়ীও ধলায় জমিদারদের আমন্ত্রণে কবি গান ও কীর্তন গান গেয়ে প্রচুর সুনাম কামাই করেছেন তবে তিনি সর্বাধিক নাম কামিয়েছেন বাউল হিসাবে। তার বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। তিনি যতক্ষণ আসরে থাকতেন ততক্ষণ আসর মাত করে রাখতেন। কবি ও কীর্তনের সুবাদে তিনি হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এ কারণে তিনি যখন কোন আসরে বসতেন তখন পালা হিসাবে রামায়ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে তাকে গান গাওয়ার জন্য পালা নির্ধারণ করে দেয়া হতো। অপরূপ বাচনভঙ্গি ও রসিকতার জন্য শ্রোতামণ্ডলী তার খুবই প্রশংসা করতো। তার সময়টা (১৯৩০-১৯৭০) সারা বাংলাদেশেই বাউল সঙ্গীতে চরম উৎকর্ষতার যুগ। একে বাউল জগতে 'সোনালী যুগ'ও বলা যেতে পারে। নিবন্ধে উল্লেখিত সকল বাউল গায়কই এই সময়কার সমসাময়িক। দেহতত্ত্ব গানেও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। নারী ও সৃষ্টি রহস্য নিয়ে তিনি বেশ কটি গান রচনা করেছেন যেগুলো অপরাপর গানের মত আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। নিম্নে তার রচিত কয়েকটি গান (যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে) দেয়া হলো :

(১) "ঘরের কোনে কোনি বেঙি গাল ফুলাইয়া গোসা করে/দেখনা রূপের ঘরে মানুষ দেখনা রূপের ঘরে॥ শুনছনি আশ্চর্য কথা, সেই বেঙির নাই মুন্ডু মাথা, শুধু একটা মুখের গাতা জিহ্বা তার উপরে/সেই বেঙি নালী ভেঙ্গী চিপাইয়া চিপাইয়া মারে॥ যে পেয়েছে সেই বেঙির লাল, ঘর ভরা তার আছেরে মাল, কাল বিকাল মহাকাল যমে ডরায় তারে/অমাবস্যা মাস কাভারে সেই বেঙি লাল ছাড়ে। লাল কিরে লাল মহালাল লাল দীঘিতে নিশান ওড়ে॥ বেঙি যখন লাল ছাড়ে, সর্প থাকে অনেক দুরে, ঘরে ঘরে কপাট মারে যায় না বেঙির ধারে/এক লাল ভাই সাত রাজার ধন যেবা সঞ্চয় করে/মহাজন কয় সাত পুরুষ তার ঘরে বইসা খাইতে পারে॥ বেঙির বাড়ি মধ্য গঙ্গায়, সর্প থাকে নারকেল ডাঙ্গায়, কায়দা পাইলেই বেঙির বাসায় সেই সর্পে ডিম ছাড়ে/বেঙি জাতি নির্বোধ অতি আদরে ওম পাড়ে/দশ মাস দশ দিন পরে মানব শিশু প্রসব করে॥

(২) ঘাটে ডুব দিয়া তোল মণি, ঘাটে ডুব দিয়া তোল মণি॥ নদীর নাম কীর্তিনাশা, জলের নিচে সাপের বাসা, চতুর্দিকে মাছি মশা দিতেছে জয়ধ্বনী/মন্ত্র ছাড়া ঘাটে গেলে অমনি ধরে ফণি/সেই সাপে দংশন করে মিলে না কোন ঔষধ পানি॥ ওই পাড়ে মথুরা বাজার লাগছে বিকিকিনি/কত দোকানদার হয়ে যায় পাড়, আসময় নিয়ে টানাটানি॥ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাউল সম্রাট উমেদ আলী রচিত এই দুটি গান এক সময় দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেত্রকোনাতেই বাউল গানের চর্চা বেশি হয়। উকিল মুন্সী (১৯১০-১৯৬৯), আলী হোসেন (১৯১৫-১৯৮২), চান মিয়া, সিরাজ আলী ও আবেদ আলী এদের সবারই জন্মস্থান নেত্রকোনার গ্রাম অঞ্চলে। প্রভাত কানার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জে। ১৯৭১ সনে পাক সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। ময়মনসিংহের অপর এক প্রখ্যাত বাউল তালে হোসেন ওরফে পক্ষিয়ার বাপ (১২৯৯-১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) ফুলপুর উপজিলার কোকাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরা সবাই সারা বাংলাদেশব্যাপী বাউল গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

১৯৭০ সন অবধি নেত্রকোনা শহরের গোহাটায় প্রতি বছরই শীতকালে বাউলদের একটি সম্মিলনী হতো। ৭-১০ দিনব্যাপী চলতো এই সম্মিলনী। প্রতিযোগিতা হতো দীর্ঘ সময় ধরে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হতো। এ জন্য বৃহৎ প্যান্ডেল নির্মাণ করা হতো মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমাগম হতো বরেণ্য সব বাউলদের। এক কথায় একে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাউল মেলা হিসেবে মনে করা হতো। মহকুমা হাকিম এটি উদ্বোধন করতেন ও শেষ দিনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতেন। এই মেলায় প্রচুর দর্শক-শ্রোতার সমাগম হতো। স্বাধীনতার পর এখন আর নেত্রকোনার গোহাটায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় না।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের উল্লেখিত সব প্রখ্যাত বাউলদের উত্তরসূরি হিসাবে ময়মনসিংহ অঞ্চল কিছুটা হলেও বাউল গানে তার অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পেরেছে। যারা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাদের মধ্যে মোঃ মাহতাব উদ্দিন, সুনীল কানা (অন্ধ), সাদীর হোসেন (সদ্য প্রয়াত) ফয়েজ উদ্দিন (সদ্য প্রয়াত) মকবুল হোসেন ও ইদ্রিস আলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোক-জীবনের প্রাণস্পন্দন হিসাবে বাউল গান সংরক্ষণ, বাউলদের একটি যথার্থ তালিকা প্রস্তুত করত সরকারীভাবে এদের পূনর্বাসনের চেষ্টা এখনই নেয়া উচিত নচেৎ কালের প্রবাহে এই ঐতিহ্যবাহী বাউল গানও এক সময় এদেশ থেকে হারিয়ে যাবে।

প্রবাদ প্রবচন ও ছড়া

যুগ যুগ ধরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রবাদ প্রবচন ও ছড়ায় সমৃদ্ধ। ব্রহ্মপুত্রের পলিবিধৌত এ অঞ্চল লোক সংস্কৃতির সকল শাখাতেই সমস্ত বাংলাদেশে একটি বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। হাজার হাজার ছড়া প্রবাদ প্রবচনে ছেয়ে আছে ময়মনসিংহের পল্লী অঞ্চল। এগুলোর ভাষা একান্তভাবেই আঞ্চলিক। নিম্নে আমরা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রবাদ প্রবচন তুলে ধরলাম।

প্রবাদ প্রবচন : যেমন কুত্তা তেমন মুগর। আইস্যা আইস্যা কয় কতা, হাই মরছে কোদাল দিতা। আগেও আড়ে না, পথও ছাড়ে না। আত্তি বেদরে পড়লে চামচুরায়ও বেদায়। মারা গুয়া কাশি গেলেও কিরেনা। আত্তির লেদা দেইখ্যা হৈইট্টা ও কুতায়। হেই মাওই বিয়াতো হইলাইন তবে ভাইয়ে দোষ করছিল কী? আজাইরা গোয়া পাইলে চেড়ের আগ ও হাসি লাগায়। সব হিয়ালের এক রাও। এক আওয়ায় রাও করে হগল আওয়ায় বেইরা দরে। কানার মনে মনেই জানা। আমিও কানা দাদা ও চৌহে দেহেনা। কুনসুম যাইবে, হেল মাইরা ব্যালে। কলা গেল গলার তল, ছুলা গেল উগার তল। কপালে আছে আর, কি করবো চাচা শাহিদার? চৈতা বাগুন লোফা লোফা মন খিরা খেতো। চোরের মন পুলিশ পুলিশ! চোরায় না হুনে ধর্মের কাহিনী। চে [illegible] রে আলি, এক চোরে বিয়া করছে আরেক চোরের হালী। ভিক্ষার চাইল কারা আ[illegible] কারা? ঝড়ে বগ মরে, ফহিরের কেরামতি বাড়ে। এমনেই নাচুইন্যা কাড়ি, আরো পাইছে ঢুলের বাড়ি। হস্তা কলায় চিড়া নষ্ট। চুনে মুখ পুড়লে, দই দেইখ্যাও ডর করে। ডেওয়া ডেফল, অতি চুক্কা নাইরল। কয়লার কালি যায় না ধইলে, স্বভাব যায় না মইলে। ডেহি স্বর্গে গেলেও বারা বানে। টেহা অইলে হালায় বাপ ডাহে। টেহা অইলে বাঘের চৌক পাওয়া যায়। টেহায় করে কাম, মিছা মর্দের নাম। ধলা কড়ি কালা মুখ। নারী আর টেহা, যার কাছে যায় তারই গুণ গায়। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার। ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়। থাকতে কুন্দা, আরাইলে নাও। থাকতে কাচি আরাইলে দাও। দেহে জনে কয় না আচাবিলে পায় না। ঠগের বাড়ি নিমন্তন, খাইলে হাছা। খাডে মড়ল খাডেনা। যে বুঝে টিপের বাও, তার লগে টিপ টিপাও। নাপিত দেখলে কুনির নৌখ বাড়ে। যে মাছ দুইট্যা যায় হেইডা বড়ই থাহে। যে বিলাই শিহারী অয় তার গাড়ের লোম্বা আগেই ফড় ফড় করে। কানা ছেড়ির নাম পদ্মলোচনী। কানা ছেড়ার নাম পদ্মলোচন। না-বাঁচবো পুলা-আইডই বেশি। মাহর মারলে দুহর অয়। মা মরলে বাপ তাউই, ভাই বইন সব বনের বাউহ। মোডে মায় রান্ধে না, ততা আর পান্তা। যারে না দেখছি হে বড় সুন্দরী, যার আতে না খাইছি হে বড় রান্ধুরী। বুইধে বধরা, না যায়ো উতরা। যেমুন মাদানী, তেমুন আল খেদানী। উত্তরে রলা, দক্ষিনে কলা, পুবে রাশ পশ্চিমে বাঁশ। হাছা গুড় আইন্ধারওঁ মিডা। পত্তি ডুবে হালুকনা। যার মুরগী তার পুটকী। যার মুরগী হে খায় আগাগরা, পাড়া পড়শী খায় রান। মাংনা পাইলে জুতার কালিও মিডা। রাজার লগে হাজা, কুদাল দেয়া হাগলাড়া। রারি মাগীর আডার হাই। শহের পুটকী বেড়া বিলাইয়া পাদে। কিছুই করুম না টাইন্যা টুইন্যা দেহুম। সোম শুক্কুর বাইছ্যা, কাপড় পিন্দ কাইছ্যা। হাপে খায় লেখলে, বাঘে খায় দেখলে। সাতেও নাই পাঁচেও নাই। ছাগল পালে পাগলে। দশ পুত্র সম কন্যা। হাজার কুবের লাঙ্গল এক কুবেই চেলি। এক মাঘে শীত যায় না। হাছা কতায় বন্ধু বেজার ততা ভাতে বিলাই বেজার। গাঙ্গ মরলে ও তার রেগ থাহে। বিয়া করাও জাত দেইখ্যা, বিয়া দেও ভাত দেইখ্যা। ক্ষিধার পেড বচনে ভরে না। ক্ষিধার সময় নুন মইচও ভালা। মাছে ভাতে বাঙালি। এক কানি সাত রাজার ধন।

বাঘে ছুঁইলেও আডার গাও। এক্কই গাছো পান সুবারী এক্কই গাছো চুন। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। শহের চোডে, বাত্তি জ্বালাইয়া পাদে। আত্তি ঘোড়া গেল তল, ভেড়ায় কয় কত জল? বাঁশের থাইক্যা কইঞ্চা বড়। তেলা মাতায় তেল দেওয়া। যার বিয়া তার রাও নাই, পাড়া পশীর ঘুম নাই। মায়ে ঝিয়ে বাত্তি করে, যারজি পূন্নি যারজি করে। এমনেই যায় না, আরো তেনা পেছাইয়া। মুরাদ নাই কড়ার, নাম জগত জোরা। আতা পাতার চেড, ঢুলি দিয়াও যায় না। মুরাদ নাই বেডার, খাদা ভরা উল। নিজে পারেনা, শংকরের মারে লইয় টানাটানি। চিনা বামনের পৈতা লাগে না। নিজের বন্ডত বাই, অপরের বন্ডত কুইচ্যা। কেচু খুরলে সাপ বারয়। শহের তোলা আশি টেহা। মক্কার বেশি যাওন নাই, কিছুমতের বেশি খাওন নাই গইড়্যা বলদ, কুরবানীর জুত। শহে মরি, কই লাগাই দড়ি। বইয়া খাইলে রাজার ভান্ডারও ফুরায়। সাদা অইলেই দুধ না। মায় বুঝে পুতের দর্দ। ঠগের নিমন্তন্ন, খাইয়া হারলে বিশ্বাস। লেংড়া বিলাই, খরমে শিকার। উঠ ছেড়ি তর বিয়া। আল্লায় দিলে পাল্লায় কুলায় না। রাজার কাম, প্রজায় অয় না। আইল শার ঠাহুর লাড্ডির ছালা। নদীর জল ঘোলাও ভাল, জাতের মেয়ে কালাও ভাল। হালায় বাইম মাছ, ছাই দিয়াও ধরুন যায় না। চোরে চোরে মামাতো ভাই। আন্ধাইর ঘরও দুরাই গুক্কুর। ছাই ফালাইতে ভাঙ্গা কুলা। উগার তলে কুলির ছাও, জাত বিদ্যায় করে রাও। জাইত, কচু পাতার পানি না যে এট্টু লাড়া দিলেই পইড়া যাইব। আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সিন্দুক পায়। অল্পে পুশে, অনেকেই দোষে। নাচতে না জানলে উডানের দোষ। কচি পাঠা বৃদ্ধ মেষ, দুধের অগ্র গুলেব শেষ। আতো বইডা, ঘাটো নাও। চেংড়া গরুর ফালুর ফুলুর যদি না যায় আল, চেংড়া মাইনষের ফালুর ফুলুর যদি না যায় মেল। পরের আতে খাইতে মজা। কানার আবার দিন বাইত কি? হুইত্যা মাগুর বইয়া কৈ। খাড়ি খুড়ি, আমার ভাগো পুড়ি। এক পুরুষ দারোগা গিরী করলে তিন পুরুষ বইয়া খায়। কুলুর পুটকী দিয়াও তেল পড়ে। আস্তে রান্ধে ধীরে খায়, সেই জিনিষের মজা পায়। বিশ ঘর রাইয়াত, উন্নিশ ঘর মারে, এক ঘরে কি করে? বাপের আগে বাল ফালায়। যদি বর্ষে আগুনে, রাজা যায় মাগুনে। যদি অয় পোষের শেষ, ধন্য রাজা পূর্ণ দেশ। কথার নাই মাথা ব্যাঙে চিড়া খায়, বাপে বিয়া না করতেই পুত হউর বাইত যায়। বাপের ধর্মে, পুতের জয়। দৌড়ের আগে, মাইরের পিছে। গরীবের সুন্দরী বউ সবারই ভাবী। বাপ দাদার নাম নাই, চান মল্লের বেওয়াই। ভাইসাব কি আঙ্গরপর, ঢালাও বিছনা কর। নয় মণ ঘিও অইত না, রাধাও নাচত না। ডাইলের মজা জ্বালে বেলের মজা খালো, বেডির মজা গালো। রস খাইলেই যশ বাড়ে। আগের আগ, পিছে কপালের ভাগ। বেক্কলের গু কুত্তায়ও খায় না। বাইচ্যা থাকলে বাপের নাম। ধর্মের ঢোল বাতাসেও বাজে।

ছড়া

(১) অলি ললিগো কাল বাদুড়ের ছাও
পহিল্যা লাইল্যা ডাঙ্গর করলাম ফড়িং ধইর‍্যা খাও॥

(২) এবেন টু বাসকো
রাইটানা টেসকো।
সুলতানা বিবিয়ানা
লাটুম বাবুর বৈঠক খানা
পান সুবারী খাইতে
মামুর বাড়ি যাইতে
পানের আগো মরিচ বাডা
ইস্কুল ঘরের চাবি আডা
যার নামা রেনু বালা

তারে দেম গলার মালা॥

(৩) ভাইট্যা গাবর, তেলের ডাবর
খায় কচুর মুড়া, আগে চৌদ্দ কুরা॥

(৪) এলকড়ি বেলকড়ি তিনকড়ি দাসী
শ্যামের উক্কা নলের বাঁশি।
শ্যাম গেল নদীয়া পুর
তুইল্যা আনলো চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আয়ে (বউ আয়ে) আনন্দে॥

(৫) এলকড়ি বেলকড়ি তিনকুড়ি দাসী
শামের উক্কা নলের বাঁশি।
চিহিনিহি দুধের হর
ফাল দ্যা উড়ে মামার ঘর
মামা আইলো ঘামিয়া
ছাতি ধর টাইন্যা
ছাতির উপরে ভমরা
ফাল দে উড়ে চেমরা
এলের আত বেলের আত
তুইল্যা ফালাও কলের আত॥

(৬) এই ছেড়িরে ধর
থইল্যার ভিত্তে ভর
বাইদ্যা নানী কইয়া দিছে
এইধুন এইধুন কর॥

(৭) জামাই আইল বাড়িত
তেল নাই তাড়িত
উগারো উডি
তিন আণ্ডা পারি
বাইজ্যা লাইজ্যা
জামাইরে দিলাম খাওয়াইয়া॥

(৮) আঁদা পাদা ছিলুম দাদা
যে পাইদ্যা মিছ কয়
তার পুটকীত কুড়াল বয়
কুড়ালে কয় টাই টুই
শালা বেডা পাদ মারছস তুই॥

(৯) এদিছে বেদিছে
কার গুয়ায় পাদিছে?
পাইদ্যা পুইদ্যা মিছ কয়
কুড়ালের ভয় তাই অয়
এইত বেডা পাছছত তুই॥

(১০) জামাইর মাগো খাড়ো না
অলদী গিলা বাড়োনা

লতাপাতা জিংগার বাইত
জামাই আইল নিশি রাইত
হাদলে জামাই খায় না
বেদা মারলেও যায় না॥

(১১) গুত্তুম বাজী টুকরো
ইছা মাছ খাইতাম না
বাইগুন বাড়ি যাইতাম না॥

(১২) ইছুন বিছুন
ধাইরা বিছুন
শোভা পরে
মইশ পরে
কাপড় বাইয়া
পানি পড়ে।
ছোটমামী রান্ধে বাড়ে
বড় মামী খায়
মাইজলা মামী গাল ফুলাইছে
নাইওর যাইবার চায়
এলের আত বেলের আত
তুল্যা ফালাও কলের আত॥

(১৩) চৈতে গিমা তিতা
বৈশাখে খৃত নালিতা
জৈষ্ঠ্যে খই
আষাঢ়ে দই॥

(১৪) কই আনছিলাম বাইশা কুড়ি
দুইডা নিছে মামী হউরী।
তেওতো রইলো আডার,
দুইডা ছাড়ছি পাগার।
তেওতো রইলো ষোল্ল,
দুইডা বেইচ্যা আনছি পল্ল।
তেওতো রইলো চইদ্দ,
দুইডা নিছে তোর বইন পদ্ম।
তেওতো রইলো বারো
দুইডা দিয়া লেপ দিছি ঘাড়ো।
তেওতো রইলো দশ,
দুইডা বেইচ্যা আনছি খাজুরের রস।
তেওতো রইলো আট
দুইডা বেইচ্যা আনছি লাঙ্গলের কাড।
তেওতো রইলো ছয়
দুইডাতো কাটতে ধুইতেই ক্ষয়।
তেওতো রইলো চাইর
দুইডা দেয়া ধরছি পশ্চিমের ঘরের পাইর

তেওতো রইলো দুই
একটা দেয়া ধরছি পুবের ঘরের টুঁই।
তেওতো রইলো এক
মড়ার মড়া, নিচবা চাইয়া দেখ।
খাইলে খা, নইলে এইডাও দিয়া ফালা॥

(১৫) দিনে মারছে ডাক, শমুগঞ্জের আড
এই ছেড়ি তোর পাইলা ঘুইরা রাখ॥

(১৬) গুংগী গো গুংগী
কই গেছিলে? পূবে।
ধানটি কেমন? থুবে থুবে।
চিড়াটি কেমন? বগুলার পাখ।
তর বাড়ি কই? শিমুল গাছ।
শিমুল গাছ কই? কাইট্যা ফালছে।
ডুম কই? হুতারে নিছে।
হুতার কই? পিড়ি বানাইছে।
পিড়ি কই? রান্ধুনী নিছে।
রান্ধুনী কই? জলে গেছে
জল কই? ডাউকে খাইছে।
ডাউক কই? বনে গেছে।
বন কই? পুইড়্যা ফালছে।
ছাই কই? ধোবায় নিছে।
ধোবা কই? কাপড় ধইছে।
কাপড় কই? রাজায় নিছে।
রাজা কই? সভায় গেছে।
সভা কই? ভাইঙ্গা গেছে॥

(১৭) ...
শাম গেছে আডো
বশি ফালছে ঘাডো।
ধরছে রও এ
কাটছে বউ এ,
এক ডুমা মিলাইছে
সারা রাইতই কিলাইছে॥

(১৮) সুতিয়াল্লারা বুইত্তা চোর
ভাবাইল্যারা কিলাইন্যা ঠাহুর॥

(১৯) এল কড়ি বেল কড়ি
তিন কড়ি দাসী
শ্যামের উক্কা, নলের বাঁশী
কে কে যাইবে একাদশী
একাদশীর বেকা ফুল
কে কে নিবে চাম্পা ফুল?
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আয়ে আনন্দে॥

বিলুপ্ত প্রায় ঐতিহ্যবাহী ঘাটু গান

এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের মধ্যে ঘাটু গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শহুরে সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ফলে এই ঘাটু গান বিলুপ্তপ্রায়। ঘাটু গান বাংলায় কবে শুরু হয়েছিল তা এখন অজ্ঞাত। তবে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পাদে এটি গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য গ্রাম্য গান যেমন— বাউল, কবি গান, জারী ও সারি গানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছিল। বিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এই ঘাটু গান কম-বেশি চালু ছিল। তার মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলেই এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার নদী-নালা, হাওড়-বাঁওড়, বিল-ঝিল পরিবেষ্টিত অঞ্চলই এই গানের চারণভূমি ছিল। বছরের একটা নিদৃষ্ট সময় ধরে এ গান গাওয়া হতো। তবে উৎসবের দিন যেমন রথযাত্রা ও ফিরা রথ যাত্রায় একটি বিশেষ আমেজ থাকতো এর। জৈষ্ঠের শেষ থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত এ সময়টা এ গানের জন্য উপযুক্ত সময়। ঘাটু গান একটি দলীয় গান। বাদ্যযন্ত্র অতি সাধারণ। একটি ঢোল, খঞ্জুরী, মন্দিরা বা করতাল এবং একটি বাঁশের বাঁশিই যথেষ্ট ছিল। সময় বিশেষে কাঠের চটি কিংবা হারমনিয়ামও ব্যবহার করা হতো। একটি অল্প বয়সী ছেলেকে 'বউ' সাজিয়ে আসরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। তার মাথায় লম্বা চুলের বেণী যা অনেক সময় পিঠের উপর ঝুলিয়ে রাখা হতো, পায়ে ঘুঙুর, হাতে একটি রঙিন রুমাল। এই ছেলেটিকেই বলা হতো 'ঘাটু', কোথাও কোথাও 'ছোকড়া' বা 'ছেড়া'। তার রক্ষণাবেক্ষণে এবং গানের সর্দার হিসেবে থাকতো একজন অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্র বিশেষে বয়স্ক ব্যক্তি। তিনিই দলনেতা। বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন বর্তমান ময়মনসিংহে তাকে 'সখীন', কিশোরগঞ্জে 'সরকার' ও নেত্রকোনায় বলা হতো 'বয়াতী'। ঠিক তদ্রূপ যারা এ গানে বাজনা বাজাতো কিংবা সমস্বরে গান ধরতো বা হাততালি দিত তাদের দলটিকে ময়মনসিংহে 'পাইল' নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে 'দোহার' ও জামালপুরে 'বাহারী' বলা হতো। সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে মাঝরাত অবধি চলতো এই গান। নদী বেষ্টিত এলাকায় নৌকার মাঝে এই গান গাওয়া হতো। অন্যান্য আসর অপেক্ষা নৌকার আসরই জমতো সবচেয়ে বেশি। নৌকায় এত বেশি লোকের সমাগম হতো যে অনেক সময় নৌকাডুবির সম্ভাবনায় নদীর তীরে উন্মুক্ত জায়গায় এর আসর সরিয়ে নেয়া হতো। একবার ১৯৬২ সনের দিকে আষাঢ় মাসে ব্রহ্মপুত্র নদে এইরূপ দল বোঝাই একটি নৌকা তলিয়ে গিয়েছিল যাতে কয়েকজনের প্রাণহানিও হয়েছিল। চতুর্দিকে খোলা ছই বিশিষ্ট নৌকা এর জন্য সাজানো হতো।

বাংলাদেশের সর্বত্রই এই গানের প্রচলন ছিল। এর মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলই ছিল প্রধান। বর্তমান ময়মনসিংহ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ যেমন সদর উপজেলার দক্ষিণাংশ, ত্রিশাল, ভালুকা, ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ভাটি অঞ্চল যেমন খালিয়াজুরী, মদন, মিঠামইন মোহনগঞ্জ এলাকায় এর কদর ছিল সর্বাধিক। এই সময় ময়মনসিংহ অঞ্চল ছেড়ে অনেক লোক উন্নত জীবিকার সন্ধানে উত্তরে আসাম রাজ্যের নওগাঁও, তেজপুর এবং বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। ফলে ময়মনসিংহের ঐতিহ্য হিসেবে উক্ত কয়েকটি অঞ্চলেও এই গানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। ময়মনসিংহে হাওড়-বাঁওড়, নদী-নালা ও উর্বর জমি, অনায়াস শ্রমলব্ধ কৃষিকাজ এই গানের জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্ষাকালে বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে হাওড় নদী নালা যখন ভরে যেতে তখনই শুরু হত এই গান গাওয়ার পালা। মেঘমুক্ত দিনে খোলা আকাশের নিচে কোন একটি স্থানে

এই আসর বসতো। আর বৃষ্টি হলে বসতো ছইঅলা নৌকায়। দুই বা তার অধিক দল একত্রিত হলে হতো প্রতিযোগিতা। একদল প্রশ্ন করে যেত গানের মাধ্যমে আর অন্য দল গানের মাধ্যমেই তার উত্তর দিত। এই প্রতিযোগিতায় হার-জিত ছিল। প্রতিযোগিতার গান ছিল দু'ধরনের— 'প্রকাশ্য' ও 'ছাপা'। 'প্রকাশ্য' গানের উত্তর প্রকাশ্য গানের মাধ্যমেই দিতে হতো আর ছাপা গান উচ্চারণ না করে হু হু হু করে গাওয়া হতো। প্রতিযোগী দল সেই গানের কলি বলে দিতে না পারলে তাদের হার হতো। এই গান প্রকাশ্যে গাওয়ার সময় প্রথমে 'ঘাটু' বা 'ছোকড়া' গানের দুই একটি কলি এবং অনেক ক্ষেত্রে 'সখীন' বা সরদার গানের দুই একটি কলি গাইতো তৎপর 'পাইল' বা 'দোহার'রা সমবেত কণ্ঠে সেই কলিই বারবার গাইতো। কলি শেষে সবাই মিলে হে হে হে বলে হাততালি দিয়ে বাহার দিত। প্রায় দশ-পনের মিনিট ধরেই চলতো একটি গান। এই গানগুলো খুবই ছোট। কলির সংখ্যা চার, ছয় কিংবা বড় জোর আট। কোন কোন সময় এই গান ধারা মাফিক হতো। শ্যাম ধারা ও রাই ধারা। গায়েন দল তাদের ইচ্ছেমতো ধারা নিতে পারতো তবে একবার যে ধারা কোন দল পছন্দ করে নিতো, সারারাত সেই ধারাতেই গান গাইতে হতো। মাঝখানে 'ধারা' পরিবর্তন করতে পারতো না। ধারা মাফিক গীত এই গানগুলির আবার প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতো। একদল গানের মাধ্যমেই প্রশ্ন করতেন এবং অপর দল গানের মাধ্যমেই তার উত্তর দিতেন। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত পালাক্রমে চলতো এই প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রথমে 'ঘাটু' বা 'ছেড়া' গানের প্রথম দু'একটি কলি গেয়ে শুরু করতো গান। বন্দনা গেয়ে শুরু হতো এই গান।

বন্দনা—'আল্লা ডাকিবে তোমারে, রহম নজর কর আমরারে॥ (১) তোমার নাম তোমার কাম তোমার মেহেরবানী/ (২) তুমি দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়ে নেও পানি॥ আমি অধম দুরাচার গাহীন গাঙের ফেনা/দরিয়ায় ভাসিয়া বেড়াই কিনারা তো পাই না॥'

তৎপর শ্রোতামন্ডলীকে সালাম আদাব।

সেলাম জানাইলাম আমি সভার বিদ্যমান। সভার বিদ্যমানগো সেলাম আসর বিদ্যমান॥ মুসলমানদের আলেকগো সেলাম/হিন্দুগর ভাই পরনাম/কোরান আর কিতাবের মধ্যেগো আছে যে সাই আল্লাজীর নাম॥ সেলাম...(বাহার)

তৎপর প্রশ্নের পালা :

প্রশ্নের ধরন কেমন হতো তার উদাহরণ :

'রাই জিগাই তোরে, সাততালা পর্বতের নিচে কৃষ্ণের নামে মালা কে জপে॥ কৃষ্ণের নামে মালা কে মালা জপে/কৃষ্ণের নামে মালা কে জপে॥ রাই জিগাই তোরে...(বাহার)

অথবা

'শ্মশান ঘাটে একটি কন্যা রোদন করেগো কী কারন, শ্মশান ঘাটে একটি কন্যা...ছুঁইলে নারী পাপী হয়/না ছুঁইলেও নারী গর্ভ হয়/সেই নারীরই সন্তান হইলেগো পিতা কারে বলতে হয়॥ আরে শ্মশান ঘাটে একটি কন্যা (বাহার)।

রাই এর উত্তর :

শ্যাম বলি তোরে পর্বতের উপরে গো রাই কৃষ্ণের নামে মালা যে জপে॥ শ্যাম বলি তোরে...(বাহার)।

এরপর দ্বিতীয় দলের পালা। তারাও সালাম-আদাব জানিয়েই শুরু করতো গান।

যেমন : 'সেলাম জানাইলাম জানাইলাম আমি সভার বিদ্যমান। শ্রেণীমতো আদাব-সেলাম আমি জানাইলাম'॥

অনেক সময় দলসমূহ পরস্পরের পরিচয় গানের মাধ্যমেই জিজ্ঞাস করতেন এবং এ গানের সাথে প্রশ্নও মাখা থাকতো।

উদাহরণ : 'পরিচয় পরিচয় দেওগো আমারে। একটি ডিম্ব তিনটি কুসুম, ছয়টি বাচ্চা কেমনে গো হয়/তোমার আমার পরিচয়গো আগে দিতেই উচিত হয়॥ পরিচয়...(বাহার)।

এ সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দির ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত ফকীর লালনের একটি আধ্যাত্মিক গান ঘাটু গানে অনুপ্রবেশ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। প্রশ্ন পর্বেই কোন দল এই গানটি গাইতো।

গানটি এই রকম:

'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে আমরা ভেবে করবো কী। চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে...। তিন মাসের এক কন্যা ছিলো/ছয় মাসে তার গর্ভ হলো তিনটি ছেলে জন্ম নিলো, কোন ছেলে পায় ফকীরী॥ চাদের গায়ে...। ঘর আছে দরজা নাই/মানুষ আছে বাক্য নাই। কেবা সেথায় আহার জোগায় কে জ্বালায় সন্ধ্যা বাতি॥ চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে...।

এরপর একটি সাধারণ প্রেমের গান যেমন :

'চেংড়া বন্ধুরে হাত বাড়াইয়া জলপাই পাইড়া দে॥ হাত বাড়াইয়া জলপাই পাইড়া দে...। তুমি যাইবা জলপাইগো পাড়তে, আমি যাইবাম লোটার ছলে/প্রেম করিবগো জলপাই গাছ তলে॥ আরে চেংড়া বন্ধুরে...(বাহার)'

অথবা

চেংড়া বন্ধুরে ঢাকার শরের কমলা কিইনা দে॥ ছোট কমলার দাম দুই আনা/বড় কমলার দাম চাইর আনা/রসের কমলা বন্ধু চিনে না॥ আরে চেংড়া বন্ধুরে...(বাহার)'।

আরও প্রেমের গানের উদাহরণ যেমন :

বাঁশীরে মোহন বাঁশী, বাঁশী ডাইকো রাধা রইলে॥ আষ্ট আঙুল বাঁশের গো বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেঁদা, হায় বাঁশীরে/নাম ধরিয়া ডাইকো বাঁশীরে বাঁশী কলংকিনী রাধাগো বইলে বাঁশী ডাইকো রাধা বইলে॥ বাঁশীরে...(বাহার)

মা আমায় দেয়না বিয়া সাধের যৌবন ভেসে যায়। স্কুলেরই ছাত্রগুলি আমায় দেইখ্যা চোখ পাকায়॥ মা আমায় দেয় না বিয়া সাধের যৌবন ভেসে যায়। মা আমায়...(বাহার)

অন্যত্র : কৃষ্ণ কালো বলে তার অনুযোগ :

কালা কালা বইলে আমারে আর ডাইকো না। কালা কালা বইলে...।

রাধিকার উত্তর :

'কালো যদি হইতরে লাল খাইতো বাটার পান/বুকের সাথে বুক মিশাইয়া গো যৌবন করতাম দান॥ যৌবন করতাম দান গো আমি যৌবন করতাম দান...(বাহার)'

ঘাটু গানে অনেকেই বিকৃত যৌনতা খুঁজে বেড়ান। বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে তবে বিষয়টি শালীনতা বর্জিত বলে আলোচনা করা হলো না। ঘাটু গানের ছোকড়া, প্রশ্নোত্তর পর্ব কিংবা হারজিত নিয়ে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ দরিদ্র ঘরের লোকেরাই এই গানের গায়ক ও শ্রোতা। সংগত কারণেই ঘাটু গান নিয়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৫ সনে লেখক যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সে সময় ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের দুইটি পাশাপাশি গ্রামে এইরূপ একটি ঘটনা নিয়ে দড়িভাবখালী ও ভাবখালী গ্রামের মধ্যে একটি গ্রামীণ ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মারামারিতে রূপ নেয় এবং ঘটনার জের উভয় গ্রামেই দীর্ঘদিন ধরে চলে। বিষয়টি অবশেষে কোর্ট/আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নরেশ নামে একটি ছোকড়াকে নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত। এই নরেশের জন্মস্থান ভাবখালী হলেও সে গান শিখেছিল দড়িভাব খালীর সখিনদের কাছে। একদিন রথযাত্রার দিন গান গেয়ে ফিরার পথে লঞ্চ ঘাটে ভাবখালীর লোকেরা নরেশকে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। লাগে দু'দলে মারামারি। শেষে

ঘটনা আদালতের রায়ে নিষ্পত্তি হয়। ত্রিশাল থানাধীন আড়িয়াদি গ্রামে ঘাটু ছেড়া নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ তো তখনকার দিনের ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ সব ঘটনার মারপেঁচে পড়ে থানা-পুলিশ করে অনেক গৃহস্থ পরিবার সর্বসান্ত হয়ে গিয়েছিল। যাক সে কথা।

ঘাটু গানে বহু প্রকারভেদ ছিল। প্রশ্নোত্তর ছাড়া যে সব ঘাটু গান সে সকল ঘাটু গানকে তাদের ভাষায় 'ছম' গান বলে। 'ছম' গান বহু প্রকারের। তার মধ্যে দেহতত্ত্ব বা রঙ বাউলা, বিচ্ছেদ, জলভরা ও মূরলী প্রধান।

দেহতত্ত্ব গানের উদাহরণ

কোন কামেলায় বানছে ঘর/ধন্যরে তোর সাধের কারিগর॥ নব কোটায় ঘর বাইন্দাছে/কোঠায় কোঠায় মানুষ আছে/উপর তলায় জ্বলছে বাতি নিচের তলায় জুম্মা ঘর'॥

অথবা

'দয়াল কউ শুনিহে সারাসার/কোন কামেলায় বানাছেরে ঘর এমন চমৎকার॥ চামড়ার ছানি/হাড়ের বনী/যোড় গাথুনী কি সুন্দর/সেই ঘরে লুকাইল রে তোর ঘরের কারিগর॥

বৈরাগ্য বিচ্ছেদ ভাবের গান যা উর্দু-হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত খিচুরি ভাষায় :

'বাহার তরমছে গিয়ে দিলতো মেরে হৈল একি উচাটন/হায় আত্মছে দহন॥

আরও উদাহরণ খিচুরি ভাষার :

'মনরে পিয়ারী দানা জিউ রয়না মনে॥ পিও পিও পিও, মাথায় গুঁজে নিও/যে দিগে মন চলে আমার; মন মানে তো মানে না॥'

বাংলা বিচ্ছেদ ঘাটু গান যা বিচ্ছেদ 'ছম গান হিসাবে খ্যাত :

'বইসে তমাল ডালে কোকিলায় কি বলে গো রাই। কি আর নিশি বাকি নাই॥ কোকিলারই কুহু টানে, ধৈর্য নাহি মানেগো প্রাণে, অধৈর্য প্রাণ কিসেতে জুড়াই/যার লাগি কলংকী আইলাম, সে বন্দেরে কোথায় পাই॥ বইসে তমাল ডালে...(বাহার)'।

'রাধারই পিঞ্জরার পাখী উইড়া গেল মধুপুর। নতুন রাজায় বিচার গো করে, বিচার দিলাম তাহার গো তরে পাখী কার ঘরে। পাখীর সনে শ্যাম মইজাছে গো রাধার মনতো বহুদুর॥ রাধারই পিঞ্জরার পাখী...(বাহার)'।

মিলনান্তক ও বিচ্ছেদ গানের আরও উদাহরণ

'বহু দিনের পিরীত গো বন্ধু একই দিনে ভাইঙ্গোনা। একই দিনে ভাইঙ্গোনা গো একই দিনে ভাইঙ্গোনা। বাপ ও ভাইয়ে হইয়াগো রাজী/দুরদেশে দিলগো সাদী, সুখতো হইলো না/আমি কি দোষ দিবাম পরের পুতের গো আপন কর্ম ভাল না॥ বহু দিনের পিরীত গো বন্ধু একই দিনে ভাইঙ্গো না...(বাহার)'।

'আরে কোকাফেতে যাওরে কোকিল পতি আমার সেই বনে। যাহার ঘরে আছে রে পতি/উল্লাস করে সারা রাতি পতিরে লয়ে/মুই অভাগী পতি হারানো ঘুইরা বেড়াই কত খানে॥ কোকাফেতে যাওরে কোকিল...(বাহার)'।

মিলন ও বিরহ সমন্বিত সাধারণ 'ছম' গান ঃ

'আমারই অন্তরার গো বেদন মা বিনে কেউ জানে না। মা বিনে কেউ জানে না গো মা বিনে কেউ জানে না॥ বিদেশেতে গিয়াগো যদি পুত্র মারা যায়/পাড়া পড়শী জানার আগে জানে তার ও মায় গো॥ আমারই অন্তরার গো বেদন...(বাহার)'।

অন্য একটি : 'আইসো কালা বইস কাছে, হাত দিওনা ডালিম গাছে, ডালিম কাঁচা রইয়াছে/পাঁকলে ডালিম হইবে লাল, হাতে ধরে মুখে দিলে রসে ভরবে গাল॥ আইসো কালা...(বাহার)

আরও একটি : 'অতি রসের বন্ধু আমার তাস খেলাইতো জানে না। আরে অতি

সাধের...। কুড়ি চৌদ্দ টাক্কা লইয়া, বইসা আহো বাবু হইয়া, হাতের পোড়া মাইরা নিলো বাবু আমার রং তুরুপতো করলা না॥ আরে অতি রসের বন্ধু...(বাহার)'।

'জল ভরা' উদাহরণ :

'কি জল ভরিতে আইলাম ঐ না যমুনায় গো সখী ঐ না যমুনায়॥ যমুনার জলে সখী সহকা ডাকে বায়, মোই শোকে অধির হইয়া যমুনা উজান যায়॥ কি জল ভরিতে আইলাম...(বাহার)

'তোরা নাচ দেখিগো সই মোদের রসিক নাগর কই। রসিক নাগর কইগো মোদের রসিক নাগর কই॥ যমুনার জল দেখতে কাল, জল ভরিতে লাগে ভাল, সেই জলেতে সান করিয়া আমরা শীতল হই॥ মোদের রসিক নাগর কই। ওরে আমার কলসী কানা, বসতে দিব ফুল বিছানা, খাইতে দেব মাখন ছানা খই মিশানো দই॥

মোদের রসিক নাগর কই...(বাহার)'।

আর ও দুটি :

'আর তো যাব নালো সই জল ভরিতে নদীর কূল। আর তো যাবো না লো সই...। করব নালো দাসীগিরী হয়ে যাবো রাজকর্মচারী, ফুলের ঢালী মাথায় নিয়ে তুলবো বনে কুসুম ফুল॥ আর তো যাবো না লো সই...(বাহার)'।

'আমার কাংখের কলসী, জলে গেলো যে ভাসি, মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া লো মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া॥ জানতাম যদি ঢেউ লাগিয়া কলসী হবে তল, মাঝিরে তোর দেশে যাওয়া হবেরে বিফল, আমি কলে কৌশলে/শাড়ীর আঁচলে নৌকাখানি রাখিতাম বান্দিয়া গো॥ মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউ লাগিয়া ...(বাহার)'।

মূরলী ঘাটু গানের উদাহরণ 'যমুনারই কূলে সইগো কে বাঁশী বাজায়। কে বাঁশী বাজায় গো সই কে বাঁশী বাজায়॥ ঐ বাঁশী যে সর্বনাশী, করলো আমায় কুলবিনাসী শাশুড়ী ননদী সবে দোষে যে আমায়॥ যমুনারই কূলে সইগো কে বাঁশী বাজায়...(বাহার)'।

'আমারই মনের গো বেদন সে বিনে কেউ জানে না। কালা যখন বাজায় বাঁশী, তখন আমি রানতে বসিগো/বাঁশীর সুরে মন উদাসী গো ঘরে থাকতে দিলো না॥ আমারই মনের গো বেদন...(বাহার)'।

ঘাটু গানের গায়েন, ছোকড়া ও শ্রোতা সবাই প্রাকৃতজন। প্রাকৃতজনের সংস্কৃতি হিসেবেই এর বিস্তৃতি। গ্রামের সহজ-সরল অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণই এর রচয়িতা। বহু শতাব্দি ধরে লোক মুখে মুখে এই গানগুলো চালু হয়েছিল। সে কারণেই ঘাটু গানের প্রকৃত রচয়িতাগণকে খুঁজে বের করা সত্যি এক আয়াসসাধ্য কাজ। হয়তো বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও এ কাজটি করা যাবে না। আমাদের গবেষকরাও এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেননি। যে কারণে এর আদি রচয়িতাগন আঁধারেই থেকে গেছেন। তবে একথা অবিসম্বাদিত যে বাংলার হিন্দু-মুসলমানগণ উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টাতেই এই ঘাটু গানের উৎপত্তি হয়েছিল। মধ্যযুগের মঙ্গল ধারার কাব্য থেকে অনেক কিছুই এতে সঞ্চারিত হয়েছে। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত ঘাটু গানে সাধারণত হিন্দু প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ধারা, গায়কদল, নাম ইত্যাদি বিশ্লেষন করলে এ তত্বটি প্রমানিত হয়। এ কারণে ঘাটু গান ব্যাপক হিন্দু সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে উঠেছিল। আগেই বলা আছে যে ঘাটু গান সারা বাংলাদেশব্যাপী গীত হলেও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলই এর বড় চারণভূমি। এখানকার অধিবাসীদের শতকরা পচাত্তর ভাগই মুসলমান। গেল শতাব্দির ত্রিশ/চল্লিশের দশক থেকে ঘাটু গানে ব্যাপক মুসলিম প্রভাব পড়তে শুরু করে। ঐ সময়ে মুসলমানগণের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় ক্রমাগ্রসরতার ধারাবাহিকতায় ঘাটু গান মুসলিম ঐতিহ্য প্রধান সংস্কৃতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।

যেমন : 'চারকোনা পৃথিবী বন্দি মধ্যে করলাম থির/শীরের আগায় তুল্যা রাখলাম আশি হাজার পীর॥ আশি হাজার পীর নারে সোয়া লাখ পয়গাম্বর/মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সবারই উপর॥

এ সময় ঘাটু গানের গায়েন বৃন্দ মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকগণ ছিল যদিও তারা তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের ঐতিহ্যকেও সমান ভাবেই রক্ষা করে আসছিল। মুসলিম নাম প্রধান ঘাটু গান এবং একই সাথে সখিন তালই ও ছোকড়া আবুল হোসেনের হৃদ্যতাপূর্ণ্য সম্পর্কের প্রকাশ :

তালই বলছে 'আবুল হোসেন তুই আমারে দেওয়ানা বানাইলে। দেওয়ানা বানাইলে আমায় পাগল করিলে॥ হায়রে আবুল হোসেন...(বাহার)।

ঘাটু আবুল হোসেনের হৃদ্যতাপূর্ণ উত্তর :

'গাছের পাকা শবরীরে কলা, গামছায় বাঁধা দই/খাইবার বইলে মনে হয়গো তালই রইল কই॥ তালই রইল কইগো আমার তালই রইল কই...(বাহার)'।

বাংলাদেশের অনেক জায়গা বিশেষত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রাণস্পন্দন ছিল এই ঘাটু গান। এই ঘাটু গানের সাহিত্য মূল্য যা-ই থাকুক কিন্তু এক সময় এই গানের কদর ছিল স্মরণ করার মতো। শোনা যায় বিভিন্ন এলাকার জমিদারগণ এই ঘাটু গানে মুগ্ধ হয়ে নিজ কাচারিতেও এই গানের আসর বসাতেন এবং মাঝরাত অবধি তন্ময় হয়ে শুনতেন পাত্র-মিত্রসহ এই গান। সময় সময় ভাল গায়েন দলকে পুরস্কৃতও করতেন। ঘাটু গানে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতা থোড়াই আছে— এটা সর্বজন স্বীকৃত। এই গানের নায়ক-নায়িকারা গ্রাম বাংলার চিরন্তন যুবক-যুবতী, প্রেম-প্রীতি, বিরহ-বিচ্ছেদের প্রতীক এরা। হাসি-কান্নায়, সুখ-দুঃখে বিজরিত আবহমান বাংলার মানব-মানবী। জীবনঘন ঘাটু গান আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। আকাশ সংস্কৃতির সর্বনাশা ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে এদেশের এক সময়কার জননন্দিত কবি, জারী, সারী গানের মতো ঘাটু গানও। ভাদ্র মাসের জোছনা মাখা রাতে আজ ব্রহ্মপুত্র কাচামাটিয়া, খিরো কিংবা ঘোড়া নদীতে নৌকায় আর ঘাটু গানের আসর বসে না। আসর বসে না কোন উন্মুক্ত জায়গাতেও। শুধু কদাচিত আসর বসানো হয় দালান ঘরের ছাদ পিটাতে তবে তা হয় এই গানের অন্তর্নিহিত মাধুর্য রক্ষা বা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য নয় বরং বৈষয়িক দিকটিকে লক্ষ্য করেই। এক সময়ের গ্রামাঞ্চলের লোক-জীবনের প্রাণ-স্পন্দন এই ঘাটু গানকে তথা এই প্রাচীন লোক-ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সকল সংস্কৃতি সাহিত্য সেবীদের এখনই এগিয়ে আসা উচিত। নচেৎ ঐতিহ্যবাহী এই ঘাটু অন্যান্য লোক ঐতিহ্যের মতো কালের অতলে তলিয়ে যাবে।

পূনশ্চ :

লেখাটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন এলাকা অনুসন্ধান করে ও লোকদের কাছ থেকে আরও কয়টি বিচ্ছেদ 'ছম' গান উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নে দেয়া হলো।

(১) কে দিল পিরিতের বেড়া সাধের লিচু বাগানে। সাধের লিচু বাগানে গো মজার লিচু বাগানে॥ ছোট ছোট লিচুগুলি, বন্ধু তুলে আমি ও তুলি, বন্ধু দেয় আমার মুখে গো, আমি দেই বন্ধুর মুখে॥ আরে কে দিল পিরিতের বেড়া. .বাহার

(২) এখন আমায় চিনবে কেন দেখিলে আড়ালে থাক। দেখিলে আড়ালে থাক। বহুদিনের ভালবাসা, মিটিল প্রাণের আশা/মথুরাতে গিয়া রাধার কথা কেন মনে রাখ॥ বাঁশির সুরে মন উদাসী, সঙ্গে নিয়ে গেলে বাঁশি/বিরহে মরিব আমি, তুমি কানাই সুখে থাক॥ এখন আমায় চিনবে কেন...(বাহার)

(৩) মন তো মানেনারে কালা, দিয়ে গেলি একি জ্বালা। চোখের দেখা প্রাণ সখা, দিয়ে যারে নিষ্ঠুর কালা॥ গোকুল আধার করি, মথুরাতে গেল হরি/প্রেমানলে জ্বলে মরি, কলংক মোর গলার মালা॥ মন তো মানে নারে কালা...(বাহার)।

মেয়েলী গীত : এক সময়ের পল্লী-নারী জীবন

মেয়েলী গীত এদেশের গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে গ্রাম্য মেয়েদের গাওয়া গীত। যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলার সাধারণ গৃহস্থ ঘরেই এই গীত চালু রয়েছে। এই গীতের প্রচলন বাংলাদেশে কখন শুরু হয়েছে তা এদেশের কোন সাহিত্য গবেষকই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। ধারণা করা হয়ে থাকে যে যেদিন থেকে এদেশে প্রাচীন সাহিত্য শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই এর প্রচলন। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এমনকি আধুনিক সাহিত্যও এই গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে পণ্ডিতকুল মনে করেন। গ্রাম বাংলার অন্যান্য লোক-সংস্কৃতি যেমন জারী গান, সারী গান, কবি গান একদিল গান ও ঘাটু গানের চেয়ে এই গীতের ঐতিহ্য অধিকতর প্রাচীন বলে তারা ধারণা করে থাকেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে যেমন বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এই মেয়েলী গীতের প্রচলন ছিল এমনকি অদ্যাবধি, আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসব, নববর্ষ, বিয়ের অনুষ্ঠান ও আঁতুড় ঘরে গ্রাম্য সকল বয়সের রমনীরা এই গীত গেয়ে থাকেন। এক সময় গ্রামে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কুলীন-অকুলীন প্রায় সমস্ত গৃহস্থ ঘরেই এর বহু মাত্রিক প্রচলন ছিল কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকে এর বিস্তৃতি কমতে কমতে বর্তমানে কেবল নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে এসে ঠেকেছে। গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা দরিদ্র ঘরেও ইদানিং এর প্রচলন দারুণভাবে কমে আসছে। অবিভক্ত বাংলার সকল স্থানেই এই গীতের প্রচলন থাকলেও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলেই এটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

জারী গান, সারী গান, ঘাটু গান, গাম্য শিলুক, গ্রাম্য ছড়া, কীর্তন এমনকি মৈমনসিংহ গীতিকায় এই মেয়েলী গীতের প্রচলন রয়েছে। ময়মনসিংহ এলাকায় প্রচলিত বাউল গানেও এই গীত এখনও প্রচলিত রয়েছে। ইদানীং এই অঞ্চলের বাউল গানে এরূপ দু'একটি গীত বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষযটি পরিষ্কার করছি। ময়মনসিংহে প্রচলিত একটি বাউল গানে জনপ্রিয় বাউল শিল্পী সুনীল কানা (অন্ধ) এই গানটি রেকর্ড করেছেন।

গীতটি এই রকম :

'মনেরই আউশে না করুম কাজ বন্ধুয়া নাই ঘরে। নানান লোকের নানান কথায় মনযে কেমন করেরে॥ মনেরই আউশে...॥ বাপমায়ে আউশ করিয়া নাম রাইখাছে তারা/আউলাইয়া মাথার বেণী কুটিয়া বানুম বারারে॥ মনের আউশে...'।

আবার বৃহত্তর ময়মনসিংহের অনেক বাউল গায়ক গীতের সুরে বাউল গান বেঁধেছেন। যেমন অষ্ট গ্রামের মাওলানা আবদুল জব্বার চিশতীর মেয়েলী গীতের সুরে একটি বাউল গান:

'গোনাহ্ খাতা যা কইরাছি মাফ কইরা দেও তুমি গো আল্লা। কোন জনমের অপরাধী আমি॥ রহিম রহমান নাম ধরেছ কোরআনেতে শুনি/আমারে পাঠাইয়া ভবে হইলা বদনামী গো আল্লা॥ প্রেমের নদী এতই গহিন আগে নাগি জানি/সাতারিয়া কুল পাইলাম না জায়গা নাই সে থামি গো আল্লা...॥ কাদিরও করিমও তুমি, তুমি অন্তর্যামী/জব্বর পাগলা মইরা

গেলে কে করবে গোলামী গো আল্লা...॥'

অনভিজাত পল্লীর অনুন্নত সমাজের অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনে মেয়েলী গীত নিরক্ষর পল্লী রমণীদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সহজ ভাবধারায় নিরেট গ্রাম্য ভাষায় বাংলার নিভৃত পল্লী কোণের পল্লী নারীর সত্যিকার রূপ, সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি প্রকাশ ঘটে মেয়েলী গীতে। অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীরা সহজ ও সরল-সহজ তাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, প্রেম পরিণয়, সহজ তাদের জীবনও। মেয়েলী গীতে তারই অতি সাধারণ প্রকাশ ঘটে। 'ভাব ও ভাষার জটিলতার বালাই নাই এতে' এই গীত নানা সুরে, নানা ভাবে ও নানা রাগিনীতে গীত হয়। এর ধরন-ধারন অনেক প্রকারের। বৃহত্তর ময়মনসিংহের পল্লী অঞ্চলে প্রধানত পাঁচ ধরনের গীত পাওয়া যায়। এগুলো হলো—নতুন দামান্দের গীত, কইন্যা সাজানোর গীত, কইন্যা বাখানীর গীত, কইন্যা বিদায়ের গীত ও আউজ ঘরের গীত। এ সকল গীতের মধ্যে আউজ (আতুড়) ঘরের গীতই জমে সবচেয়ে বেশি। গ্রামে কারও ঘরে সন্তান হলে নবজাতকের ৬ষ্ঠ দিবস গত রাত্রে এই গীতের অনুষ্ঠান হয়। দাওয়াত করে আনা হয় গীত পটিয়সী রমনীদের তাদের সাথে তো নবজাতকের মায়ের আত্মীয়ারা রয়েছেনই। নবজাতকের কোন আত্মীয়দের মধ্যে কেউ বাজার থেকে বিভিন্ন ব্যঞ্জন এনে এদের সমাদর করেন। আনা হয় প্রসূতীর জন্য নতুন শাড়ি, ধাত্রীর জন্য শাড়ি, শাশুড়ি ও মায়ের নতুন কাপড়-চোপড় ও নবজাতকের পোশাক আশাক। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক হিসাবে আনা হয় আতপ চাল, কলা, গুড়, দুধ ও পান-সুপারি। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই গীতওয়ালীরা আঁতুড় ঘরে চলে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয় গীত।

'আল্লা আল্লা বলগো নবী কর সার/নবীর কলিমা পইড়া অইয়া যাইগ্রাম পাড়॥' গীত গাইবার আইলাম গো/নতুন ছাইলার বাড়ী গো/শুইবার নাইকা চহিগো/বইবার নাইকা পিড়িগো/গীতকিবা গাইবামগো'॥

নবজাতক কাঁদলে কিংবা ঘুমুতে দেরি করলে—

'অলী ললীগো কাল বাদুরের ছাও/বাদুর গেছে মধু আনতো, শুইয়া নিদ্রা যাও'

অথবা 'বিন্দা ওয়ালী মাইয়াগো কালবাদুরের ছাও/পাইল্যা লাইল্যা ডাঙ্গর করলাম ফড়িং ধইরা খাও॥'

বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে শুরু হয় যেই রাত্রির আসল পালা।

যেমন, "চিকন বিবি ছিনান করে শানে বান্দাইল ঘাটেগো...শানে বান্দাইল ঘাটে। দীঘির পাড়ে বাইন্যা পুলা/চতুর্দিকে দেয় দোলা/শানে বান্দাইল ঘাটে॥ আগে দুগুন কইছলারে বাইন্যা আমারে করবা বিয়া/অহন কেনে কান্দরে বাইন্যা দীঘির পাড় বইয়া॥"

সরলা নারীর মন। বাইন্যার পুলার কান্দন দেখে তার অন্তরে দয়া হয়। চিকন তাকে তার নতুন স্বামীর দেশে যাইতে বলে এইভাবে,

"তক্তা দিয়া নাও বানাইয়া/আমার দেশে যাইসরে বাইন্যা সোনা রূপা লইয়া"।

বানিয়া বলে, 'তোমার দেশে যাইতে রে কইন্যা লাগে পানি তিরাশ'।

কইন্যা উত্তর দেয়,

'পথে পথে লাগাইয়া থইছি ভাব নারকেলের গাছ'।

বাইন্যা আবার বলে

'তোমার দেশে যাইতে কইন্যা লাগে গুয়া-তিরাশ'।

কন্যা বলে—

'পথে পথে লাগাইয়া থইছি পান সুবারীর গাছ'॥ গীত এইভাবে এগিয়ে চলে।

'থওর কলা বাদুরে চইলে গাছে ঝিলমিল ছরি॥ ছাইলার (অথবা মাইয়ার) বাপ যে শুইয়া রইছে কানে লাগাত দড়ি। ঢিল কইরা লাগাও দড়ি মরুক চতুর্বাড়ী/টান কইরা লাগাও দড়ি আইউক আমার বাড়ী॥'

ছেলের বাপ জবাব দেয়,

(তাদের মধ্যে থেকেই একজন) আর মাইরনা আর মাইর না মাজার বিষে মরি/শীঘ্র কইরা আই না দিবাম পান গুয়া বিড়ি॥"

গীত এগিয়ে যায় আরও বহুদূর। গায়ের মেয়ে মনুরা। ভালবাসে পড়শী কামাইল্যাকে। কামাইল্যাও মনুরাকে ভালবেসে শাড়ী-চুরি লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দেয়। উভয়ের বাপ-মায়ের বিরোধিতার কারণে তাদের প্রণয় পরিণতি লাভ করে না। মনুরার বিয়ে স্থীর হয় অন্যত্র। মনুরাকে সাজানোর জন্য কামাইল্যার দেয়া শাড়ি পড়তে দেয়া হয়। অভিমানে মনুরা বলে,

এইনা শাড়ি পরতাম না আমিগো কামাইল্যা গন্ধ করে গো কামাইল্যাই গন্ধ করে।'

যাক এরপর মনুরার বিয়ে হয়ে যায়। অভিমানী মনুরা মাহফায় বসে গলে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করে সকলের অজান্তে।

বাবায় বিদায় দেবার সময়—'মাহফার কাপড় খুলিয়া গো দেখে মনুরার গলায় ছুরিগো মনুরার গলায় ছুরি। বাপে কান্দে ভায়ে গো কান্দে কান্দে নর-নারী গো কান্দে নর নারী॥'

অন্য কাহিনী নববধু শ্বশুর বাড়ী যাবে। বাপে মায়ে মাহফার খোটায় ধরে কান্দে। নববধু তখন বাপকে বলে,

"আগে যে বাজান মারছিলাইন ঝারের কইঞ্চা ভাইঙ্গা/এখন কেন কান্দুইন গো বাজান মাফার খোড়াত ধইরা/মাফা ছাড়ইন, মাফাগো ছাড়ইন যাইবাম শ্বশুর বাড়ী"॥

এই ভাবে আমোদের আহ্লাদে কেটে যায় সাড়া রাত্রি। সকাল বেলায় কোথায়ও দুধ, গুড় ও আতপ চাল দিয়ে পাক হয় খীর। আবার কোতাও দুধ ভিজানো আতপ চাল ও কলা মিশিয়ে 'হাইটারা' তৈরি করা হয়। গায়েনরা গোসল করে এ সকল খেয়ে যে যার বাড়ি চলে যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিয়ের অনুষ্ঠান যেমন বর গোসল, কন্যা গোসল, কন্যা বিদায় ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও মেয়েরা গীত গেয়ে থাকেন। এ সকল গীতে সাধারণত জামাই ও কন্যার প্রসঙ্গই বর্ণিত হয়ে থাকে। যেমন : গ্রামের সরলমনা কিশোরী ভালবেসেছিল এক তরুন রূপবান সওদাগরকে কিন্তু সেই ভালবাসাকে উপেক্ষা করে সওদাগর বিয়ে করে এক ভিনদেশীকে।

কিশোরী অনুযোগ করে,

'আগে তুমি কইছিলা সওদাগর না করিবা বিয়া/অহন দুগুন দেহিগো সওদাগর নাপিতে তোমায় কামায়/আগে দুগুন কইছিলা সওদাগর না করিবা বিয়া/অহন দেহি সওদাগর তুমি বিয়ার সাজন সাজ/আগে দুগুন কইছিলা সওদাগর না করিবা বিয়া/অহন দুগুন দেহিগো সওদাগর বিয়ার ধুতি পরা॥"

সরলা কিশোরী সতিনের ঘরেই যেতে রাজী হয়। সতিনের পুলার প্রতিও তার আদরের কমতি হবে না,

'কি করবো তোর রূপেরঙ্গে পুত্র নাই মোর কোলে/সতিনের ঘরে অইব পুত্র, টান দ্যা লইবাম কোলে॥"

অন্যত্র আরশ নামের গ্রাম্য বালার গুন বাখান করে গীত,

'আরশের মাথা ভালা দেখি গো/ডাব নারকেলের খোল গো দামান॥ আরশের ঠোঁট ভালা দেখি গো/যেমন বিন্নার পাতাগো দামান॥ আরশের দাঁত ভালা দেখি গো/ঝিঙ্গা ফলের বিচিগো দামান॥ আরশের গলা ভালা দেখিগো। রাজহাঁসের গলাগো দামান॥ আরশের আঙ্গুল ভালা দেখিগো/থরুয়ারই ছই ও গো দামান॥ আরশের হাঁটা ভালা দেখিগো/খঞ্জনের কাইকো গো দামান॥'

দামান শ্বশুরবাড়ি বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে আসে। অপরিচিত লোকেরা জিজ্ঞাস করে,

কইনচেন কইনচেন কইনচেন দেহি কোনলা নতুন দামান গো কোনলা নতুন দামান॥

অন্যপক্ষ উত্তর দেয়, 'কেচি কাটা বাবড়ি গো ছাঁটা এইলা নতুন দামান গো এইলা নতুন দামান॥ মাথায় টুপি হাতে রুমাল এইলা নতুন গো এইলা নতুন দামান॥ হাতের রুমাল মুখে গো দিছে এইলা নতুন দামান গো এইলা নতুন দামান॥'

যথারীতি বিয়ে হয়। বরপক্ষ কি কি উপহার পাবে তা জিজ্ঞাস করে দয়িতার পক্ষকে।

যেমন : 'কি করুইন গো কইন্যার আম্মা কতই নিদ্রা যান/ মাফার ভিতর কিতা দিবাইন ভাল কইরা কন?

কইন্যার মা উত্তর দেন,

"ঘড়ি দিলাম আংটি দিলাম আরবা দিতাম কি?/মাফার ভিতর তুইলা দিলাম সোনার বরণ ঝি॥'

কন্যার চাচিকে জিজ্ঞাস করা হয়,

'কি করুইন গো কইন্যার চাচি কতই নিদ্রা যান/মাফার ভিতর কিতা দিবাইন ভাল কইরাই কন?

চাচির উত্তর,

লেপ দিলাম তোষক দিলাম আরবা দিতাম কি/মাফার ভিতর তুইলা দিলাম সোনার ভাতিঝি॥'

কন্যার মামীকে জিজ্ঞাস করা হয়,

কি করুইন গো কইন্যার মামী কতই নিদ্রা যান/মাফার ভিতর কিতা দিবাইন ভাল কইরাই কন॥'

মামীর উত্তর,

'ধুতি দিলাম চাদর দিলাম আরবা দিতাম কি/মাফার ভিতর তুইলা দিলাম সোনার ভাগিনী॥' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর কন্যা সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয় এইভাবে,

'দেখগো দয়ার বাপজান তোমার দুই নয়ন মেলিয়া/কালি যে আছিলাম গো বাপজান তোমার উর জুড়িয়া/আজু অতি যাইবাম গো বাপজান তোমার উর ছাড়িয়া॥ দেখগো দয়ার মাওজান তোমার দুই নয়ন মেলিয়া/ কালি যে আছিলাম মাওজান তোমার উর জুড়িয়া/ আজু অতি যাইবামগো মাওজান তোমারে ছাড়িয়া॥'

এরপর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, যথারীতি ঘর সংসার করে এবং কয় বছর পর তাদের

কোল জুড়ে আসে এক কন্যা সন্তান নাম নীলু। বড় আম্বরী॥ অনেক বায়না ধরে সে মায়ের কাছে। মেয়ের আবদার স্বামীকে বলে এইভাবে,

'হাটে যাও বাজারে যাও গো আমার একখান কথা/নীলুর লাগি আয়না কাকই, আমার মাথার ফিতা গো প্রাণ আমায় যায় যায়গো॥ ও হাটে যাও বাজারে যাওগো আমার একখান কথা/নীলুর লাগি পান সুপারী আমার মুখের পাতাগো, প্রাণ আমার যায় যায়গো॥'

মেয়েলী গীতে অনেক প্রকার ভেদ। এখানে কইন্যা সাজানীর একটি গীত :

নুলুক দিয়া সই সাজাব/চিরতন মাত্র শেষে দিব, সইলো সই/মনের মতন রাই সাজাব যাহও বিন্দা বনে॥ সীতা দিয়া সই সাজাব/সীথি মাত্র শেষে দিব, সইলো সই/মনের মতন রাই সাজাব, যাইও বিন্দাবনে॥ মাকড়ি দিয়া সই সাজাব/কান পাশা যে শেষে দিব, সইলো সই/মনের মতন রাই সাজাব, যাইও বিন্দা বনে॥'

নতুন দামান বরযাত্রী ও প্রাসঙ্গিক জিনিষ পত্রাদি সাথে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়।

এ প্রসঙ্গে একটি গীত :

'বাদ্যি বাজে আমার আনন্দে/বাদ্যি বাজে আমার বিনন্দে, বাদ্যি বাজে আমার নতুন শ্বশুর বাড়ী॥

সাথের লোকেরা জিজ্ঞাস করে কইন্যার বাপের বাড়ী কতদূর:

'সাথেরই গুরুয়া লোক পুছাবালা করে। কতদূর কতদুর কইনার বাপের বাড়ী?

ঐ যে দেখা যায় বৈঠক ঘর সারি সারি/সেইখানে সেইখানে কইনার বাপের বাড়ী॥'

এ ছাড়াও বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে নিম্নে কয়েকটি জনপ্রিয় মেয়েলী গীত উদ্ধৃত করা হলো:

'আঙ্গার আবু ঝুলেরে/বাইঙ্গন পাইড়্যা তুলেরে/আবু কান্দে আয় বায়/বাইন্যা বেটা নিতো চায়/বাইন্যা বেটা কইরে/আঙ্গার আবুরে লইয়া যা॥'

'নিনরা ওয়ালী মাইয়া গো/আঙ্গার বাইত যাইও গো/খাট নাই, পিড়ি নাই, আবুর কোলও বই ও গো॥

এগুলো ছড়ার মতো মনে হলেও আসলে এগুলো মেয়েলী গীত। মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ছেলেকে দোল দেয় ও একক কণ্ঠে এই গীতগুলো গেয়ে থাকেন। নিম্নে এ রকম আরো কয়েকটি ছড়া গীত দেয়া হলো :

'কইতরীর মা ঘরে গো/মুরগীর ঠোঙ্গা ধরগো/মুরগীর ঠ্যাং কালা/ছায়াবানী বড় ভালা/ও ছায়বানী সূতা কাট/কাইল॥ অইল গঞ্জের আট্/গঞ্জের আটো যাইতাম না/কেচকি মাছ দ্যা খাইতাম না॥'

'মায়াগো চাউল ভাইজ্যা দে/চাউল বাজা খাইতাম না, কলসী আইন্যা দে/কলসীর ভিত্তে ধুরা হাপ/ফাল দ্যা উডে বৌ এর বাপ/বৌ এর বাপ কালা/লাগে আমার হালা॥'

ছোট ছোট মেয়েরা আম কুড়াতে যেয়ে সমবেত কণ্ঠে গীত গায় :

'কাউয়া আমার মাজু ভাই/আম ফালা বাড়িত যাই/পবন বেডা অনুমান/লেজে কইরা বাতাস আন/পবন আমার মাজু ভাই/আম ফালা বাড়ীত যাই/আম বড় চুকা/পবনের শইল্যে পুকা॥'

মায়ের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে মেয়েলী গীত :

'আধ পৃষ্ঠ খাইছিল মায়ের গুয়ে আর মুতে/আধ পৃষ্ঠ খাইছিল মায়ের মাঘ মাইস্যা শীতে/নিজের শইল্যের কাপড় খানি ছেলের অঙ্গে দিয়া/সারা রাইত ঘুমাইচে মায় বুহে আগুন লইয়া/ বিদেশেতে যদি কারো পুত্র মারা যায়/পাড়া-পড়শি জানার আগে জানে তারো মায়॥'

অন্য আরেকটি ছম গীত :

"মাইয়া গো চাউল ভাইজ্যা দে/চাউল ভাজা খাইতাম না বাইগুন পুইড়া দে/ইতা বাইগুন ভালানা পুহায় ধরেছে/পুবপাড়া যাইতাম না নডি টাঙ্গাইছে/নডির আতে বারি খাইয়া তাশকা লাগাইছে॥'

অন্য আরো একটি বারমাসী গীত :

'কত পাষান বান্‌ছরে সাধু তোমারো অন্তরে॥ জৈষ্ঠ মাসে আম ফল/আষাঢ় মাসে বর্ষার জল/ শাওন মাস কাডাইলাম আমি আগরে সাগরে॥ ভাদ্দর মাসে তালের পিডা/আশিন মাসো হশা মিডা/ কার্তিক মাস কাডাইলাম আমি কাতরে কাতরে॥ আগুন মাসে নয়া ধান/পোষ মাসে তুষের বান/মাঘ-মাইস্যা শীত লাগল নারীর অন্তরে অন্তরে॥ ফাল্‌গুন মাসো নগুন জ্বালা/চত্রি মাসে শরীল কালা/বৈশাখ মাস কাডাইলাম আমি নাইল্যার ডগায় বইয়া রে॥'

বৃহত্তর ময়মনসিংহে মেয়েলী গীত মুসলিম ও হিন্দু সংস্কৃতি যুগল ভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। গীতই এখানে আসল, ধর্ম এখানে একান্ত গৌণ। মেয়েলী গীতে যেমনই রয়েছে মুসলমানী প্রভাব ঠিক তেমনই রয়েছে হিন্দুয়ানী প্রভাব। এখানে নিরক্ষর পল্লীবালাদের একান্ত মনের অজান্তেই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ, মুসলমানী প্রভাব :

'আল্লা ডাকি যে তোমারে/রহম নজর কর আমারে॥ তোমার কাম তোমার নাম তোমার মেহেরবানী/তুমি দরিয়া শুকাইতে পার/পাহাড়ে নেও পানি॥ আমরা অধম দুরাচার গহিন গাঙ্গের ফেনা/দরিয়ায় ভাসিয়া বেড়াই কিনারা পাইলাম না॥'

উদাহরণ হিন্দুয়ানী, (জলভরা ও সন্ন্যাস)

'কুক্ষণে জল ভরতে আইলাম বিরহিনীর দেশে॥ কেউর কাঙ্খে লুটা গো ঘটি কেউর কাঙ্খে কলসী/রাধিকা সুন্দরীর কাঙ্খে হীরার মাঞ্জা কলসী॥ কেউর পিন্ধনে লালে গো লীলে, কেউর পিন্ধনে শাড়ি/রাধিকা সুন্দরীর পিন্ধনে গো কিষ্ট নীলাম্বরী॥'

'নিমের গাছে থাকরে নিমাই নিমের গুডা খাইয়া/নিমাই কেনে অইলারে নবীন সন্ন্যাসী॥

নিমের গুডা ফুরাইয়া গেলে মাও ডাকিবা কারেরে...নবীন সন্যাসী॥ অইয়া পুক্র মইরা গেলে পাশরিতাম দুখ/বাঁইচ্যা পুক্র সন্ন্যাস গেলে দেখব কারও মুখরে...নবীন সন্ন্যাসী॥'

আরও একটি বহুল প্রচলিত ছম গীত।

মা ও রান্ধে পেগা ভাত, বইনে রান্ধে চাউলা ভাত, আমার নিলো রান্ধে আতপ চাউলের ভাত॥ মাও পিন্ধে লাল শাড়ী, বইনে পিন্ধে নীল শাড়ী, আমার নিলো পিন্দো কৃষ্ট লীলাম্বরী॥ মাওর আত মাটিয়া চুড়ি, বইনের আত রূপার গো চুড়ি, আমার নীলোর পিন্দো চিহুনের চুড়ি॥

বিভিন্ন প্রকারের শত শত মেয়েলী গীত আবহমানকাল ধরে পল্লীর নারী মনে হাসি খুশীর উপাদান জুগিয়ে আসছে। আজ আকাশ-সংস্কৃতির সর্বনাশা ঢেউয়ে পল্লীর অনেক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির এই মেয়েলী গীত তার মূল্য হারাতে বসেছে। গ্রামের নারী সমাজ অশিক্ষিতা। এই অশিক্ষিতারই কল্পনার রঙিন রঙে রঞ্জিত করেছে যুগ যুগ ধরে এ সকল মেয়েলী গীত। এগুলোর ভাব সাদামাটা, বর্ণনা একান্ত সাধারণ তবু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। সাধারণ শ্রোতাদের হয়তো এগুলো বাঁধবে তবু পল্লী জীবনে এ গীতগুলো একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে মহিমামন্বিত হয়ে আছে।

ভারমতীর পালা

ভারমতীর পালা একটি নিখুঁত পল্লী চিত্র। গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল মানুষের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রণয়-পরিণয়সহ গৃহস্থালী চিত্রের একটি নির্ভেজাল চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। এদেশের আর কোন পালা গানেই পল্লীকে এত নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় না। নিখাদ পল্লীর জিনিস বলেই হয়তোবা এই পালা গানটি এক সময় দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জিলার গ্রামাঞ্চলে। গীতাভিনয় হিসাবে এর যথেষ্ট নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ছিল যা আর কোন পালা গানেই লক্ষ করা যায়নি। পালাটির অধিকাংশ সংলাপই হচ্ছে গানের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এই পালাকে অনুসরণ করে পল্লী অঞ্চলে 'কাঞ্চনমালা', 'শ্যামসুন্দর' 'গুনাই' 'রূপবানের' মতো জনপ্রিয় পালা গানের উদ্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র 'রূপবানের' পালাটি ব্যতীত অন্য কোন পালাই জনপ্রিয়তায়, 'ভারমতীর পালা বা বাইদ্যা গানের' পালাকে অতিক্রম করতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত 'মহুয়ার' গীতি রূপে এই 'ভারমতী বা বাদিয়ানী'র পালার নাট্যরূপের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। অনেক বিষয় নাট্যরূপের আখ্যানভাগে সংযোজিত হয়েছে এবং বেশ কিছু পরিত্যক্তও হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই পালাটি বিভিন্ন নামে অভিনিত হতো। যেমন, ভারমতীর পালা, উনরা বাইদ্যার পালা, বাইদ্যানীর পালা, মহুয়ার পালা ও চন্দ্রাবলীর পালা। নামে যা-ই হোক উল্লিখিত বিভিন্ন পালাতে নায়ক/নায়িকা ও একই ঘটনা সাদৃশ্যতা ছিল। এক কথায় বলতে গেলে, পুরাতন ও আধুনিক উভয় পর্যায়ের পল্লী গীতাভিনয় সাহিত্যের আসরে বাদিয়ানীর পালাটি একক সুন্দর, সার্থক ও মহিমোজ্জ্বল এক অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টিকারী। নিম্নে পালাটির কিয়দংশের উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

স্থান গোলক। ধর্ম ও অধর্ম দুই দেবতার মধ্যে কে অধিক ক্ষমতাশালী এই নিয়ে বাঁধে তর্ক। উভয়েই কলিঙ্গা রাজের দরবারে যায় মীমাংসার জন্য। আসন মাত্র দুটো খালী। ধর্ম সোনার আসনে ও অধর্ম রুপার আসনে বসে। এতদ্দর্শনে কলিঙ্গা রাজের রানী চন্দ্রাবতী বললেন, 'দেবগণ! আপনাদের তর্কের মীমাংসা তো এরই মধ্যে আপনারা নিজেরাই করে ফেলেছেন। যে যে মর্যাদার দাবিদার সে মতই আসন গ্রহণ করেছেন'। এই অপমানে অধর্ম কুপিত হয়ে চন্দ্রাবতীকে অভিশাপ দিল—'তুই যেমন প্রকাশ্য রাজদরবারে আমায় অপমান করছিস, ঠিক তেমন তুই ইতর মানবকুলে জন্ম নিয়ে কলংকিনীর জীবন যাপন করবি'। দেবতার অভিশাপ বৃথা যাবার নয়।

অভিশাপের ফলেই চন্দ্রাবতীর জন্ম হয় নীচ মানব কূলে বাদিয়ানী রূপে পূর্ব-মোমেনশাহীর কোন এক গ্রামে। নাম চন্দ্রাবলী। আইধর বাইদ্যা তাকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করে কিন্তু উনরা বাইদ্যা তাকে চুরি করে নিয়ে প্রতিপালন করে। দেখতে দেখতে সময় চলে যায়। চন্দ্রাবলী এখন ষোড়শী যুবতী— রসের নাগরী। উনরা বাইদ্যা বৃদ্ধ, ইয়া লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি কাঁধে ঝুলানো এক মস্ত বড় পোঁটলা, তীর-ধনুক। বাইদ্যানীকে উনরা বাইদ্যা কখনও মহুয়া, কখনও চন্দ্রা আবার আদর করে ডাকে ভারমতী বলে। ভারমতীও একান্ত সোহাগী-উনরা বাইদ্যাকে বলে 'খলিপা'। উনরা বাইদ্যা আসরে অবতীর্ন হয় এবং

নিজের পরিচয় নিজেই দান করে :

'আইলরে শিকারী বাইদ্যা, তীরের কাঠি লইয়ারে, শরের কাঠি লইয়া রে॥ আমরা জাত শিকারী, আমরা জাত শিকারী/আমরা পংখী মারি। কত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি, আমরা পংখী মারি আমরা জাত শিকারী'।

পরিচয় হয়ে গেলে এক 'গ্রামবাসী' বাইদ্যাকে তার বাড়ীতে যেয়ে গান গাইতে বলে। এ সময় ভারমতীর আবির্ভাব, গান গায় দ্বৈত কণ্ঠে:

'বাইদ্যা-আইল আইল দেশে রসের বাইদ্যানী

ভারমতী-বাইদ্যা বড় ভাগ্যবান/সোনা দ্যা বান্ধাইছে দুটি কান। বাইদ্যা-রূপা দ্যা বান্ধাইছে দুটি আঁইখি লো সজনী॥ কানে তোমার ঝুমকা শোভে শাথায় চিরুনী/গলাতে গজমতি হারলো সজনী'।

'গ্রাম বাসী'কে আবার বাইদ্যা রঙ্গা করে উত্তর দেয় :

'ঢাকা শরে ছিলাম আমি নবাব সাবের বাড়ী/সুন্দরী ভারমতী লইয়া দেশে দেশে খুরিরে, প্রাণ আমার যায় যায়রে।'

এরপর দৃশ্যান্তর। গ্রামের নাম হরিপুর, ভাটি অঞ্চল। গ্রামের কিনা মড়লের সাথে কথা বলে উনরা বাইদ্যা একটি জায়গা নিয়ে বাড়ি তৈরি করে। ভারমতীর বাড়ী পসন্দ হয়না বলে : 'ও খলিপা, খলিপা, এই বাড়িঢা ভালানা, ভালানা।

বাইদ্যা বলে :

'কি অইছে চন্দ্রা, এই বাড়িঢার কি ব্যামো আছে?

ভারমতী বলে :

'ও খলিপা, খলিপা, এই বাড়ি আগারে পাগারে ভরা, মশায় কামড়ায়। গান :

আগাইর‍্যা পাগাইর‍্যা রে মশা লম্বা লম্বা ঠোট, উইড়্যা উইড়্যা মারে কামড়, জ্বইল্যা যায় যে বুকরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥"

উনরা বাইদ্যা অনুযোগ করে :

'ও তোর মন জুগাইব কত আর/পাঁচ সিকার বাইদ্যানী তুই আমার॥ মোর পিন্দনে ছিঁড়া তেনা/তোর পিন্দনে আল-বাহার॥'

বাইদ্যানীর পসন্দ না হওয়ায় নতুন বাড়ী বাধতে কামলা আসে। কামলাকে বলে : 'দীঘলা ঘর বানবাম-দীঘলা। দীঘে ছয় কুড়ি হাত, পাশে এক আঙ্গুল ও না। কামলারা অবাক হয়। 'পাশ ছাড়া কি ঘর অয়' ভারমতী বাইদ্যাকে বুঝায় : 'ও খলিপা, খলিপা! তুমি অমন অবুঝ কেরে? তুমি অমন অবুঝ কেরে? ফাড় না দিলে ঘর অইব কিভায়?' যা হোক নতুন ঘর বানানো হয়। সেই ঘর লেপতে পোঁচতে ভারমতীর গায়ে জ্বর আসে :

'নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা বানলো জুইতের ঘর/লেপিতে পোঁছিতে কইন্যার গায়ে আনলো জ্বর রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

জ্বর সারাতে আসে আনন্দ বৈদ্য ঃ

'আনন্দ বৈদ্য আমি থাকি রাজবাড়ি/বার আনা ভিজিট পাইলে যাই রোগীর বাড়ি গো॥ কানা ল্যাংড়া রোগী পাইলে তারে খাওয়াই বিষের বড়ি/ছয় মাসের আয়ু থাকতে তারে পাঠাই যমের বাড়ি গো প্রাণ আমার যায় যায়গো॥'

এদিকে নতুন বাড়ি তৈরী হয়। ভারমতী সেরে ওঠে। বাইদ্যা বাড়ির চারদিকে বিভিন্ন

গাছপালা লাগায়। পাইলেরা গায় :

'নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা লাগায় সাধের কবি। কবির পাতায় লিখা আছে ভারমতীর ছবিরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥' 'নয়া বাড়ি' লইয়ারে বাইদ্যা লাগায় সাধের সাজনা/সেই সাজনা বেচিয়া দিবে মহারাজের খাজনা গো প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

'নয়া বাড়ি' লইয়ারে বাইদ্যা লাগায় সাধের কলা/থওর কলা বাদুরে চইলে বাড়ে দ্বিগুন জ্বালারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

বাইদ্যা উত্তর দেয় :

'আমরাতো বাদিয়ার জাতগো বড়ই জানি সন্ধি/তীরের আগো তীর বান্দিয়া বাদুর করব বন্দি গো॥'

এর পর আসে বেগুন চাষের পালা :

'নয়া বাড়ি' লইয়ারে বাইদ্যা লাগায় সাধের বাইগুন/ সেই বাইগুন তুলিতে কন্যা হায়রে জুড়িল কান্দল গো 'প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

বাইদ্যা ভারমতীকে ডেকে প্রবোধ দেয় :

কাইন্দোনা চন্দ্রা না কান্দি ও আর/সেই বাইগুন বেচিয়া কিনব তোমার গলার হাররে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

এরপর সীম বা উরি লাগানোর পালা :

নয়া বাড়ি লইয়ারে বাইদ্যা লাগায় সাধের উরি/সেই উরি বেচিয়া দিব চন্দ্রার হাতের চুড়িরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

বাদিয়া হাল চাষ শুরু করে। কিনে আনে দুইটি বলদ কিন্তু দুইটি বলদই 'গড়িয়া' :

'কাইল্যা বলদ দইল্যা বলদ জুইড়া দিলাম আল/একটা হুতে একটা উডে ঘটাইল জঞ্জাল রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

দিন যায়। একদিন ভারমতীকে বাইদ্যা জিজ্ঞেস করে, 'চন্দ্রা, চন্দ্রা তোমার কি কেউরে দেখতে মন চায়'॥ ভারমতী উত্তর দেয়, 'খলিপা, খলিপা, ছোড বইন লবজানকে দেখতে বড়ই মন কান্দে'।

'ছোট বইনি আদরের নবজান/তারে দেখতে মনখান করে আনচান/নাইওর আনতে যাও খলিপা॥'

তখন উনরা জবাব দেয় :

'আমি যে যাইব চন্দ্রা লবজানরে আনিতে/পথের মধ্যে ঘটলে বিপদ/কে তরাইব মোরে রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

ভারমতীর উত্তর :

'যাও যাও যাও খলিপা যাও মনরঙ্গে/পথের মধ্যে ঘটলে বিপদ আমারে নিও সঙ্গেরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

উনরা বাইদ্যা তাকে সঙ্গো নেয় না— একাই রওয়ানা দেয় :

'আপন শালী আনতে যাইগো হাতে বৈঠা বাইয়া/ কত লোকে দেখবে তামশা নদীর কুলে বইয়ারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

এরপর দৃশ্যান্তর। স্থান নদীয়া শান্তিপুরের এক নিভৃত পল্লী। এক ব্রাহ্মণ যুবক নাম নইদ্যার চান ঠাকুর। নিশিযোগে ভারমতীকে স্বপ্নে দেখে তার ছোট ভাই কালী ঠাকুরকে বলে :

'স্বপন দেখিয়া উঠিলাম জাগিয়া/গাছের ডালেম যে রইয়াছে পাকিয়া। কি স্বপন দেখি আজুকার নিশি/জলের ঘাটে অইব দেখা বাজাইয়া বাঁশীরে॥'

নদীয়ার ঠাকুর মা ও ভাইকে জানিয়ে রওয়ানা দিতে চায় সেই কন্যার দেশের দিকে। মা চোখের জলে ভাসে। তাকে বারণ করে :

'সাত নয় পাঁচ নয় তোমরা দুইটি ভাই/তোমরা বিনে এই জগতে আমার কেই নাইরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

নদীয়ার ঠাকুর মায়ের নিষেধকে উপেক্ষা করে :

'নইদ্যা ঠাকুর কালী ঠাকুর আমরা দুইটি ভাই/কালী থাকুক তোমার কোলে আমি চইল্যা যাইরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

এইভাবে নদীয়া ভারমতীর উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়।

এরপর আবার দৃশ্যান্তর। স্থান জারিয়া অঞ্চল। প্রসঙ্গ উনরা ও লবজানী। ভাইরা নাছিরের বাড়ী খুঁজে পায়না উনরা। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে :

'বিল বিলান্তি বাইয়া আমি নাও বান্ধিলাম গাছে/জারিয়ায় নাছিরের বাড়ি কতদূর আর আছেরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

ঘাটের উপরে উঠে এক পক্ষী শিকারির সাথে দেখা হয়। ভাগ্যক্রমে সেই নাছির বাইদ্যা। কিন্তু একি! নাছির বাদিয়া তো বড় ধনী কাঠ কেউয়াড়ী চৌকারী আছে! সে নিজে তালুকদার ইত্যাদি কত কি!! ভারমতীর কাছে তো সে এ রকমই শুনে আসছে। কিন্তু বাস্তবে :

'তিন কোর দ্যা ঘর বান্দিছে ভেন্না পাতার ছানী/কই থাকে বা নাছির বাইদ্যা কই থাকে লবজানী রে॥ একটি পয়সা নাইরে শালার নামে তালুকদার/থাকলে কি ভেন্নার পাতায় ছানী দিত ঘর শালার রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

দুই ভাইরা ভাইয়ে অনেক হাসি-মস্কারী করে। নাছির লবজানীকে ভাল করে পাকশাক করতে বলে :

'আস মাইলাম কইতর গো মাইলাম বাইছ্যা মাইলাম টিয়া/ভালা কইর‍্যা রাইন্ধো ছালুন কাইল্যা জিরা দিয়া দিয়া রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

লবজানী ও রসিকা। হেসে উত্তর দেয় :

'লং দিলাম এলাচি গো দিলাম হলদি দিলাম বাটি/কিদ্যা ছালুন হইত ভালা ভাইছাব তেজপাতা বাকীরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

দুই ভাইরা একত্রে খেতে বসে। এখানে ঠাট্টা তামাশা হয়। লবজানী তাদেরকে খাওয়ায়।

দৈ নিয়ে রঙ্গ :

'সকল পাতে দিলা দই/আমার পাতে দিলা কই?/দে দই দে দই লবজানী দে দই দই॥

'খেতে বসেই কথা হয় লবজানীকে নাইওর নেয়ার। শুনে নাছিরের মাথায় হাত,

'তুমি নিবা নাইওর ভাইরা আদরের লবজানী/লবজানীরে না দেখিলে আমার বাঁচেনা পরানীরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

অনেক বলে কয়ে নাছিরকে রাজি করায় উনরা। এখন রওয়ানার পালা। নাছির বিদায় নেয় :

'কত কথা কইলামগো ভাইরা না রাখিও মনে/আদরের লবজানী ভাইরা রাখি ও

যতনে রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

আবারও পটপরিবর্তন। স্থান হরিপুর। ভারমতী একলা পাটশাক তুলছে। ঘুরতে ঘুরতে নদীয়ার ঠাকুর আসে এখানে। দেখা হয়। প্রনয় হয় ভারমতীর সাথে :

'শাক তোল সুন্দরী কন্যা নউখে ভাঙ্গা ডাল/কেমন জনে করছে বিয়া সফল জনম তারার প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

ভারমতীর জবাব?

'আম গাছে নাইরে আম কুটা কেন লাড়?/তোমার আমার নাই পীরিতি আঁখি কেন ধাররে প্রাণ আমার...।'

নদীয়ার ঠাকুরের সাথে ভারমতীর প্রণয় এগিয়ে চলে। নদীয়ার ঠাকুর তাকে জলের ঘাটে যেতে বলে। এদিকে লবজানীকে নিয়ে উনরা বাড়িতে আসে। ভারমতী কুশল বিনিময়ের পর উনরার কাছে বায়না ধরে :

'তোলা পানি গাষ্টরে গিলা শরীর জ্বালা করে/আইজো উতি যাইবাম জলে সিনান করিবারে রে প্রাণ আমার...॥'

উনরা তাকে মানা করে। লবজানী সব টের পায়। মুখ টিপে হাসে।

'ও মহুয়া জলে যাইও না/জলের মধ্যে কুম্ভির আছে তোমায় ছাড়বো না॥

ভারমতী কলে :

'ও খলিপা নিষেধ কইরো না/জলের ঘাটে কুম্ভির আছে আমায় খাইতোনা॥'

উনরা অগত্যা রাজি হয় :

'যদি চন্দ্রা জলে যাও/ত্বরিতে ফালাইও পাও/ছিনান করিয়া ঘাটে দেরী কইরো না ও সেই ঘাটেতে কুম্ভির আছে তোমায় ছাড়বে না॥'

লবজানীও বোনকে পায়ে ধরে নিষেধ করে কিন্তু ভারমতী রসের নাগরী ষোড়শী যুবতী তাদের কথা শুনবে কেন? ভারমতী জলে আসে। দেখা হয় নদীয়ার নাগরের সঙ্গে। ঠাকুর গান গাইতে গিয়ে বেহুঁশ হয় :

'কেবা ঘাটে সান করগো কাহারও ঘরণী/তোমারে দেখিয়া আমার উড়িছে পরানী রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

ভারমতী ঠাকুরের মাথাটি উরুতে নিয়ে বসে ঃ

'রূপসী দেখিয়া রে নাগর পড়িলা ঢলিয়া/উঠিলে কহিব কথা পরান খুলিয়া রে॥'

নদীয়ার ঠাকুরের হুঁস হয়। আদান হয় ভাবের। এরপর একটানা গানে সংলাপ।

'বাদিয়ানী— পন্থে যাওরে পন্থের নাগর পান চিবিয়া খাও/সাপের মাথার মণি দেইখ্যা হাত বাড়াইতে চাও রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

নদীয়ার ঠাকুর— সাপ মারবাম সাপুনী মারবাম মনি লইবাম হাতে/ যমের ঘরে প্রাণটি দিয়া প্রেম করবাম তোর সাথেরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

বাদিয়ানী— লজ্জা নাই নিলজ্জ্যা পুরুষ লজ্জা নাইরে তোরো/গলাতে কলসী বান্দিয়া, জলে ডুইবা মরোরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

নদীয়ার ঠাকুর—কোথায় পাইব কলসী গো কন্যা কোথায় পাইব তুরি/তুমি হওগা গহি গঙ্গা আমি ডুইবা মরিরেপ্রাণ আমার যায় যায়রে॥প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

বাদিয়ানী– প্রেমের নদী বড়ই গো গহিন নামলে উঠা দায়/আমার সাথে করলে পীরিত

কানবো তোমার মায়রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

নদীয়ার ঠাকুর– নাইরে মাতা নাইরে পিতা, নাইরে সোদ্দর ভাই/তুমি কন্যা বিনে আমার ত্রিজগতে কেউ নাইরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

বাদিয়ানী-কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়া/এত শিয়ান হইছ তবু না করাইছে বিয়ারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

নদীয়ার ঠাকুর—ভাল আমার মাতা পিতা-ভাল আমার হিয়া/তোমার মত সুন্দরী পাইলে করাইতো বিয়ারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

এরপর গোত্র পরিচয়ের পালা। নদীয়ার চান জিজ্ঞাস করে, 'কোথায় তনে আইলারে কন্যা কোথায় বাড়ীঘর/কিবা নামটি মাতা পিতার কিবা নামটি তোররে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

বাদিয়ানী-'আইবর বাইদ্যার পালক কন্যা নামেতে মহুয়া/শিশু কালে উনারা বাইদ্যা আনিল হরিয়ারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

বাদিয়ানী ও নাগরের পরিচয় জিজ্ঞেস করে :

'কোথায় তনে আইলারে নাগর কোথায় বাড়ি ঘর/কিবা নাম তোর মাতা-পিতার কিবা নামটি তোয়রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

নদীয়ার ঠাকুরের উত্তর :

'পিতার নামটি রতন ঠাকুর বাড়ি শান্তিপুর/মাতা পিতায় রাখছে নামটি আমার নদীয়ার চান ঠাকুরের প্রাণ... ।'

নদীয়ার ঠাকুর হিন্দু ব্রাহ্মণ জেনে ভারমতী বলে :

'তুমি হও ব্রাহ্মণ পুরুষ আমি মুসলমান/তোমার আমার পীরিত তবে কেমন যে হয় মিলন রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

ঠাকুর জবাব দেয় :

'পীরিতে নাই জাতি গো কূল হিন্দু মুসলমান/তুমি আমি এক থাকিলে হইবে মিলনরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

ঘটনা এগিয়ে চলে। নদীয়ার নাগরকে বাড়ি যেতে বলে ভারমতী।

'আমার বাড়ি যাইওরে নাগর পশ্চিম বরাবর/বাড়ির পিছে গাছ গাছালী পূব দুয়ারীর ঘর॥ আমার বাড়ি যাইও রে নাগর বইতে দিবাম পিরা/জলপান করিতে দিবাম শালী ধানের চিরারে॥ আমার বাড়ি যাইতে রে নাগর না করিও আন/শুইতে দিবাম শিতল পাটি যইবন করবাম দানরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

নদীয়ার ঠাকুর ব্রাহ্মন বলে ভারমতী তাকে আলাদা খেতে দিবে :

'যাইও যাইও যাইওরে নাগর আমার বাড়ি যাইব/ডাইল দিব, চাউল দিব যে রুশুই কইরা খাইও রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

কথা মতো নদীয়ার ঠাকুর ভারমতীর বাড়ী যায়। অতিথি হয়। খায় দায়। গভির রাতে ভারমতীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। পথে দেখা হয় দূতীর। তার একমাত্র সই। সে তার কাছে তার অনুসন্ধান বলে যায়।

'কইও কইও রে দূতী উনরা বাইদ্যার ধারে/আমারে যে করে তালাস কইট্যাদির বাজারে রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

আগ ভারে তারা :

'সাক্ষী হইও চান্দরে সূরুজ তোমরা দুইটি ভাই/নইদ্যার চান্দের জাত্তি গেল আমার দোষ নাইরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥

দূতি তাদেরকে হরিপুরের নদী পাড় হতে দেখে দুর থেকে। তার গান :

'বাইদ্যা ছেড়ি বাড়ি রে গুতি নইদ্যার ঠাকুর চান/কান্দ কইর‍্যা পাড় করিল হরিপুরের গঙ্গারে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

এদিকে উনরা ভোরে উঠে দেখে ভারমতী নেই। তার বুঝতে বাকী থাকে না। সে বিলাপ করতে থাকে :

'হায়রে আমার মাথায় বারি দিলা/অতি সাধের বাইদ্যানীরে কেবা লইয়া গেলা॥ অতি সাধের বাইদ্যানী গো খাইতো চাইছিল কলা/তারে দেইখ্যা পাগল হইল রতন ঠাকুরের পূলা॥'

এরপর ফের দৃশ্যান্তর। স্থান কটিয়াদির বাজার, মোকাম কিশোরগঞ্জ। নদীয়ার ঠাকুর জাত দিয়ে মুসলমান হয়। বিয়ে করে ভারমতীকে। সুখের ঘর বাঁধে। আনন্দ বন্যায় ভাসে যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা। মাঝে মাঝে নদীয়ার ঠাকুরের হিন্দু ধর্মের স্মৃতি স্মরণ হয় :

'আছিলাম ব্রাহ্মনের পুত্র, করতাম চন্ডিপাঠ/বাইদ্যা ছেড়ির প্রেমে পইড়া খাইছি সানকীত ভাত রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

অথবা

'ছিলাম গো ব্রাহ্মণের বেডা করতাম শিব পূজা/আমার কপালে ছিল করতাম তিরিশ রোজা রে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

সব দোষ কপালের। নদীয়ার চান অনুযোগ করে :

'দেশ ছাড়লাম রাজ্যিরে ছাড়লাম ছাড়লাম সোনার পুরী/বাইদ্যা ছেড়ি ভারমতী লইয়া দেশে দেশে ঘুরিরে প্রাণ আমার যায় যায়রে॥'

এরপর শেষ দৃশ্য। উনরা বাইদ্যা ভারমতীদের খোজ পায়। ভারমতীর হাতে একটি ছুরি তুলে দেয়। খুন করতে বলে নদীয়ার ঠাকুরকে। ভারমতী তা করবে কেমন করে। সে তো নদীয়ার চানকে গভির ভাবে ভালবাসে। তাই উপায়ন্তর না দেখে নিজের বুকেই ছুরি বসাতে উদ্যত হয়। ক্ষিপ্র গতিতে নদীয়ার ঠাকুর ধরে ফেলে ভারমতীর হাত। দূরে ফেলে দেয় ছুরি। রাত্রিকালে আবার নিরুদ্দেশ হয় ভারমতীকে নিয়ে নদীয়ার চান ঠাকুর। উনরা বাইদ্যা আর কোনদিন তাদের দেখা পায়নি। পালা এখানেই শেষ। দর্শক-শ্রোতাদের চোখে পানি।

বাদিয়ার পালাটির প্রেম রসাত্মক কাহিনীটির জনপ্রিয়তা ও সার্বজনীনতা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। এরূপ নির্ভেজাল পল্লী কথাকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন 'বেদের মেয়ে' নামক একটি নাটক লিখেন যা কালোতীর্ণ হয়েছে। বাদিয়ার এই কাহিনীকে নিয়ে এই দেশে ছবি ও হয়েছে-হয়েছে এরই অনুসরণে আরো ছবি। এর মধ্যে উর্দু ভাষায় নির্মিত 'মালা' ও বাংলা ভাষায় নির্মিত' 'বেদের মেয়ে জোছনা'র কথা কেই না জানে শোনা যায় তোজাম্মেল হোসেন বকুলের এই 'বেদের মেয়ে জোছনা' ছবিটি নাকি ব্যবসা সফলতার ক্ষেত্রে এ দেশের সকল রেকর্ড ভেঙ্গেছে। 'বাদিয়ার পালা'র এই কাহিনীটি নিয়ে এখনও এদেশে নির্মিত হতে পারে কাব্যনাট্য, নাটক, ছায়াছবি এমনকি গীতিনাট্য। এদেশের হাজারো দর্শক-শ্রোতার প্রশংসা পাবে এ সকল প্রয়াস— সংস্কৃতি টিকে থাকবে অনন্তকাল। বিষয়টির গুরুত্ব লক্ষ্য করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের এখনই এগিয়ে আসা উচিত।

ওঝার ঝাড়-ফুঁক বা সাপের মন্ত্র

সাপ বিশেষ করে বিষধর সাপ নিয়ে মানুষের কৌতূহল আদিকাল থেকেই। সৃষ্টির প্রথম দিক থেকেই সাপ মানুষের জাত শত্রু। কথিত আছে হজরত আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ানোর জন্য ইবলিশ শয়তান সর্পের জিহ্বায় বসে বেহেস্তে প্রবেশ করে বিবি হাওয়াকে মন্ত্রণা দিয়ে গন্ধম খাইয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে আদম (আঃ) ও হাওয়াকে স্বর্গ থেকে আল্লাহপাক বিতারিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

সাপ মানুষের চিরশত্রু। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই বিষধর সর্পের দংশনে কত প্রাণীর যে ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ সর্প থেকে– সর্পের বিষ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। সর্প বিষ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়েই বঙ্গদেশে সাপের মন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দু পুরাণে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন পদ্মাবতী। হিন্দু পুরাণ অনুসারে মনসা দেবী হলেন পদ্মাবতীর শত্রু। একদিন পদ্মাবতী বিষ রেখে স্নান করতে গেলে মনসা দেবী তেত্রিশ কোটি বিষ নিয়ে পালায়। সে মর্ত্যে এসে চাঁদ সওদাগরকে পূজো দিতে বলে। দেবী ছিলেন কানা অর্থাৎ একচোখা। দম্ভভরে চাঁদ সওদাগর 'কানি মাগীকে পূজা দেব না' বলে জানিয়ে দেয়। এতে মনসা দেবীর রোষানলে পতিত হয় চাদ সওদাগর। একে একে অনেক পুত্র সন্তান হয় চাঁদ সওদাগরের কিন্তু যৌবনে সাপের দংশনে সবাই মারা যায়। রাজরানী সনকা পুত্র শোকে অধীরা। অবশেষে রানীমাতার কোল জুড়ে এলেন লখিন্দর। যৌবনে অপরূপ সুন্দরী বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিয়ে হলো। লোহার বাসর ঘর বানানো হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিশ্ছিদ্র লৌহ বাসরে কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে। সতী বেহুলা স্বামীর মরদেহ নিয়ে অবশেষে বহুদিন পর দেবী পদ্মাবতীর কৃপাদৃষ্টিতে স্বামীর আত্মা ফেরত পান। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের গ্রাম্য এক কবি এ পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করেই পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকে লেখেন 'মনষার ভাসান' বা ভাসান যাত্রা। সাপের মন্ত্রাবলীতে এই বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীও উল্লেখ করে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। গ্রাম্য ওঝাদের বিশ্বাস এই পদ্মাদেবীর দোহাই দিলে সাপের বিষ রোগীর দেহ থেকে নেমে পরে।

আধুনিক শিক্ষার বদৌলতে মানুষ সাপের মন্ত্রের এইসব ঝাড়-ফুঁকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সাপের বিষতো বাঙালির বিষ নয় যে 'কষিয়া গালি গালাজ করিলেই' আপনা থেকে নেমে যাবে। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিলাসী গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় তো সাপের বিষের কাছে 'মৃত্যুঞ্জয়' হতে পারেনি। ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল তার। যাক সে কথা।

যারা সাপের বিষ ঝাড়ে তাদেরকে 'ওঝা' বলা হয়। এদের অঞ্চল বিশেষে বিষ ঝাড়ার প্রক্রিয়ায় ও রকম ফের হয়ে থাকে। কেও কেও মন্ত্র বলতে বলতে প্রচণ্ড বেগে হাত ঘুরায় ; রোগীকে দুরে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে ক্ষত স্থানে থাবা দেয় ; কেউ কেউ মন্ত্র বলে রোগীর শরীরে কাঁসার থালা বসায় ; কেউ বা কড়ি চালান দিয়ে দংশনকারী সাপকে এনে রোগীর দংশিত স্থান থেকে বিষ তুলে নিতে বাধ্য করার বাহানা করে। আসলে এ সবই এক ধরনের

ভাওতা বাজী। কড়ি চালান দিয়ে সাপ আসেনা অন্তত: কেউ কখনও দেখেছেন বলতে পারবেন না। এসবই হচ্ছে শোনা কথা বা কিংবদন্তী।

ওঝারা ব্যক্তিগত জীবনে বহু নিয়ম-কানুন রক্ষা করে চলে। অনেকে ছাতা মাথায় দেয় না, জুতা পরে না, সাপ মারে না কিংবা রোগীর বাড়িতে জলস্পর্শও করে না। গারো পাহাড়ের গারো বা হাজংগণ ওঝাদের আদি গুরু। যারা গারো পাহাড়ে গিয়ে সাপের মন্ত্র শিখে আসেন তাদেরকে বলা হয় 'গারোরী ওঝা'। 'গারোরী ওঝারা'ই সবচে ভাল ওঝা বলে স্বীকৃত। ওঝারা সাপের মন্ত্রে যে সকল শ্লোক ব্যবহার করে তা সবই হিন্দুয়ানী। এ ঝাড়া বহু খণ্ডে বিভক্ত। যে যত বড় ওঝা সে তত বেশি খণ্ড জানে। সাপের মন্ত্রে মারাত্মক অশ্লীলতা থাকে। ওঝাদের বিশ্বাস এই অশ্লীল বাক্যবানে জর্জরিত হয়েই বিষ নেমে পরে। বিষ নামতে দেরি হলে অশ্লীলতার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়া হয়, এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণভাবে রুচিশীলতাকে অতিক্রম করে যায়। এ মন্ত্রের কিছু অংশ ছন্দোবদ্ধ, কবিতার মতো বা পুঁথি পাঠের পয়ার ছন্দের মতো আবৃত্তি করা হয়। কিছু অংশ টপ্পা গীতের মতো আবার কিছু অংশ গানের রাগিনীতে গীত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ অংশই উচ্চারণ না করে গুন গুন করে বলা হয়। সাধারণত সাপের কাটা রোগীকে একটি আসনে বসিয়ে তার চোখ মেলে ধরে মন্ত্র বলে ওঝা প্রচন্ড বেগে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে হস্তস্থিত পাত্র থেকে ঠাণ্ডা পানি প্রবল বেগে রোগীর খোলা চোখ ও মাথায় ছুড়ে মারে। এইভাবে ঝাড়ার চোটে বিষ 'ভূমেতে' এসে পড়ে। পরে 'কাইক্যা' মাছের কাটা দিয়ে রোগীর দেহ থেকে রক্ত বের করে (হাত বা পা থেকে) লবণ দিয়ে মুছে দেয়া হয়। আসলে ঝাড়-ফুঁক এখানে কোন কাজ করে না, কাজ করে কিছু নিয়ম ও প্রচণ্ড পানির ঝাপটা-পানির ঝাপটা খেয়ে সংগত কারনেই বিষ পানি হয়ে যায়। এরূপ ঝাড়তে গিয়ে ওঝা যে মন্ত্র ন্যবহার করে তা হলো :

ধর্ম চালম কর্ম চালম
সাপের মই টক চালম,
আসা আসি কমন চালম
ধর্ম চালম কর্ম চালম॥

ওঝার হাতে ঘটিতে রাখা পানি। সাধারণত পানি তোলার সময় দম বন্ধ করে সাত ঘাটের পানি আনা হয়। পানি পড়ার মন্ত্র নিম্নরূপ :

সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও,
কোনখানে দংশিলেরে বুড়া যইবত নারীর গাও?
সাধের চিলারে বাঁকা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে চিলা যইবত নারীর গাও॥
সাধের মাছোয়া রে মাছোয়া বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে মাছোয়া যইবত নারীর গাও॥
সাধের কাইল্যা রে কাইল্যা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে কাইল্যা যইবত নারীর গাও॥
এরপর শুরু হয় ঝাড়ার মূল অংশ :
আছিলে মাধব নাগরে হৈয়া গেলে ডুরা
রাখ ওয়ালে পাইলে তরে ভাঙ্গবো তোর মুড়া॥

তোর দেবী কালী দেবী
ন্যাংড়া থাকে নিরবধি
ন্যাংড়া মাগী কানী মাগী সেও তোর মা
যা বিষ ছাইড়্যা যা নইলে আস্ত রাখবনা॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব॥

অথবা

এ পাড়ে ধোবা ধুবনী সে পাড়ে তার পাও,
মাঝখান দিয়া বাইয়া যায় সওদাগরের নাও॥
সওদাগরের নাওখানি ঝুমুর ঝুমুর করে,
হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া বিষ ভূমে আইসা পরে॥
ভূমেতে আসিয়া বিষ চায় চতুরদিকে,
ঝাড়িতে লাগিল নেতা পদ্মার সাক্ষাতে॥
নেতা বলে পদ্মাবতি কিবা ঝাড়া ঝাড়ো,
'জলসাফা' 'কুলি ভাঙ্গা বীর' সকল জ্ঞানের বড়॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব,
রহিতে না পারো বিষ মা পদ্মার তলব॥

অথবা

গাঁইট বানলাম গাটরে বানলাম
দইর‍্যা বানলাম ছাইর‍্যা;
বাপে না লইছিল কোলে, মায় না দিছিল তন।
আরক্ষ্যা জারক্ষ্যা বিষ মন্ত্র নাহি মানে,
কালিয়া সাপের বিষ ঢলিয়া পড়ে।
উজানী উজানী দাফন যদি করিবে
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব॥

কোন কোন ওঝা সাপে কাটা রোগীকে দশ পনের হাত দূরে গাইলের উপর বসিয়ে ঝাড়া শুরু করেন। প্রথমে ওঝা ঘটির পড়া পানি দিয়ে মাটির উপর হাত ঘোরাতে ঘোরাতে পানি ঢালে। পানি মাটিতে কাদা হয় লেপার মত হয়। হাত কাদা মাটির উপর প্রচন্ড বেগে ঘুরতে থাকে। 'দোয়াই আল্লার', 'দোয়াই পয়গম্বরের', 'দোয়াই আলীর', 'দোয়াই কালীর', 'দোয়াই পদ্মার', 'দোয়াই ওস্তাদের' বলে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র আওড়ায় :

কর্ম ছালি ধর্ম গো ছালি
ছালি আর গো যত দেব ধরম গো।
পঞ্চম পাণ্ডব ছালি অষ্ট মাতা তবে গো
চৌষট্টি নগরে ছালি ধর্মপুরের মাধ্যে গো॥
চল চল হাতরে চল
চল আরগো যেখানে সাপের বিষ গো॥

এ অবস্থায় ওঝা হাত ঘোরাতে ঘোরাতে রোগীর পিঠে এবং মাথায় থাবা দেয়। তারপর আবার শুরু করে :

থাবায় ধরলাম বিষ
চিপায় করলাম পানি
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পারি বিষ মা পদ্মার তলব॥

এরপর শুরু হয় মূলমন্ত্র। মূলমন্ত্র এ রকম ঃ

সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও
কোনখানে দংশিলে বুড়া যইবত নারীর গাও।
যইবত নারী জলে যায়   গোলখাড়ুয়া তার পায়
পথে পথে নারী জাতে যৈবন বিলায়।
ময়ূরা ময়ূরী নাচে উলু খেতে থাইক্যা
গুইয়াডায় লড়ালড়ি যায় সেই পারে থাইক্যা;
সেই পারে সাধু সদাগর ডিঙ্গা বাইয়া যায়
এই পাড়ে ধোবা ছেড়ি এ কাপড় ধুলাই করে॥

এর পরবর্তী অংশ ভারী অশ্লীল। তাই এখানে উল্লেখ করা হলো না। এগিয়ে চলে ঝাড়ফুঁক। দু'একটি উদাহরণ ঃ

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা
ওলট পালট পাতাল ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
দুধরাজ মণিরাজ।
কার আজ্ঞা— বিষহরির আজ্ঞা॥

অথবা

বিষ থুইয়া পদ্মাবতী ছান করিতে গেল।
তেত্রিশ কোটী বিষগো লইয়া মনসা পালাইল॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পারো বিষ মা পদ্মার তলব॥

পুরাণের ভাষ্য মতে মনসা দেবী ও পদ্মা দেবী একই রমণী। মনসা দেবীর এক চোখ কানা ছিল। তার জন্ম বৃত্তান্ত এরূপ— একদিন শিব কুচুনী নগরে যাচ্ছিলেন। যেতে পথে ময়ূর-ময়ূরীর সঙ্গম ক্রিয়া দেখে তাঁর ভেতর সঙ্গম ভাব জেগে ওঠে। ফলে তার লিঙ্গ থেকে এক ফোটা বীর্য স্খলন হয়ে তা সাগরে পড়ে। সাগর শুকিয়ে বালুচর হয়। একদিন সেখানে কংশা ও কংশী নামে দুটি পাখি আসে। কংশী সেই শিব বীর্য ভক্ষণ করে। এভাবে কংশীর পেট থেকে পদ্মা দেবীর জন্ম হয়। সে জন্ম কানা ছিল। বার বছর পরে শিব যখন সে পথ দিয়ে ফিরছিলেন তখন পদ্মার রূপ যৌবন দেখে তার লোভ হয়। তিনি তাকে তার আশ্রমে নিয়ে গিয়ে রতিকর্ম করতে চাইলে পদ্মা দেবী তার আত্মপরিচয় শিবকে প্রদান করেন। এই জন্যই সর্প বিষের মূল রক্ষিতাকে বন্দনা করেন ওঝাগণ। স্তোত্র পাঠ করেন তার নামে,

পুজোও হয়। সোজা পথে কাজ হাসিল না হলে ওঝারা পদ্মা দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরে গান পাড়েন শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায়। তাদের বিশ্বাস এতে পদ্মা দেবী লজ্জিত হয়ে বিষ তুলে নেবেন। এসব কাহিনী বড় শ্রুতিমধুর। তা শুনতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভিড় জমায় রোগী ও ওঝার পাশে। সাপের বিষের মরাকে বলা হয় 'ডৌকা'। 'ডৌকা' ঝাড়ার নাম শুনলেই অনেক লোক সমবেত হয়। যখন আশে পাশের ওঝারা ব্যর্থ হয় তখন সাপের কাটা মরাকে কলা গাছের 'তেউড়' বানিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো বলে ও শোনা যায়। বহুকাল ধরেই অবশ্য এ চলট উঠে গেছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে সাপুড়ে বা ওঝারাই আবার 'নাগাবুতি' রোগের চিকিৎসা করেন। এ রোগীকে সাপের মন্ত্রেই ঝাড়তে হয়। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো, রোগীর মাথা ভার, চক্ষু লাল, বসা মাত্র বমি, রাত্রিকালে বাতি দেখতে পারে না। মাছের তরকারি তাদের কাছে দুর্গন্ধযুক্ত মনে হয়। ওঝাদের বিশ্বাস-নাগরাজের (সর্পরাজ) বাতাস লেগে এই রোগ হয়ে থাকে অথবা নাগ রাজ আশ্রিত কোন ভূতের বাও লেগে এ রোগ হয়। এ কারণেই এ রোগের নাম 'নাগাবুতি' আর এর ঝাড়-ফুঁক হয় সাপের মন্ত্রেই। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে এলার্জি নামক রোগকে 'নাগে পেছা' রোগ বলা হয়। এলার্জি রোগের লক্ষণই হলো শরীরের যে অংশে চুলকানো হবে সেই অংশই ফুলে যাবে এবং লাল হয়ে যাবে। তৎপর এই লাল অংশটুকুতে ঘন ঘন চুলকানি অনুভব হবে। গ্রামের লোকদের বিশ্বাস নাগ বা সাপে ঘুমন্ত অবস্থায় রোগীকে পেঁচিয়ে এ রোগের সৃষ্টি করেছে। সাপের মন্ত্র দিয়েই এখনও অনেক গ্রামাঞ্চলে এ রোগের চিকিৎসা করানো হয়ে থাকে।

সাপের মন্ত্র হিন্দু শাস্ত্রমতে কথিত হয়। সাপের মন্ত্রের অনেক কাহিনীই হিন্দু পুরাণে উল্লেখ আছে। অনেক মুসলমান ওঝাগণ সাপের মন্ত্রের সাথে মুসলমানী আচারের সংযোগ করেছেন। যারা সাপ ধরে, খেলা দেখায়, সাপের বিষ সংগ্রহ করে তারা জাতে 'বাদিয়া'। বাদিয়ারা সাধারণত মুসলমান যাযাবর। এ কারণে সংগতভাবেই সাপের মন্ত্রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু মুসলমানী প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রাম্য লোকদের বিশ্বাস, সাপ ধরার সময় সাপের মন্ত্র ব্যবহার করে বাঁশি বাজিয়ে সাপকে কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্র বলে বশীভূত করা হয়। আসলে তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। সাপ ধরা একটা কৌশল মাত্র। যারা সঠিকভাবে এ কৌশল আয়ত্ব করে প্রয়োগ করতে পারে সাপ ধরতে গিয়ে তারাই বেশি সাফল্য অর্জন করে। অনেক আনাড়ি সাপুড়েকে সাপ ধরতে গিয়ে সাপের ছোবলে মারা যায় শুনেছি। এতে বুঝাঁ যাচ্ছে যে সাপ ধরার কৌশল প্রয়োগই হচ্ছে আসল জিনিস কোন মন্ত্রতন্ত্র নয়। ধৃত সাপকে গলায় ধরে তৎপর বিষ দাঁত উঠিয়ে ফেলে কয়েকদিন খাচায় ভরে রাখলেই তার জংলি স্বভাব হ্রাস পায় এবং পোষ মানে।

গ্রাম্য শিলুক ও ধাঁধা

আলোচনার সুবিধার্থে বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রচলিত গ্রাম্য শিলুক বা ধাঁধাসমূহকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। আকৃতি, প্রকৃতি, উৎস, ভাব ও ভাষার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করেই এ ভাগগুলো সমীচীন হবে বলে আমরা মনে করি। যেমন (১) গদ্য শিলুক (২) দরবারি শিলুক (৩) বিয়ের শিলুক (৪) ছুটকী শিলুক ও (৫) শিশু শিলুক। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আমরা উপরোক্ত পাঁচ প্রকারের শিলুক আলোচনা করবো।

গদ্য শিলুক ঃ 'গদ্য শিলুক' প্রতিযোগিতামূলক। সাধারণত গ্রামের অবসর সময় ও বিয়ের আসরে গদ্য শিলুক কথিত হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর অবসর সময়েই গদ্য শিলুক বেশি কথিত হয়। এ সব শিলুকে একজন প্রশ্নকর্তা বিপক্ষের প্রশ্নকর্তা বা উত্তরদাতাগণের প্রতি শিলুকের মাধ্যমে প্রশ্ন করেন। বিপক্ষ কথিত শিলুক বা ধাঁধার উত্তর দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে অপর পক্ষকে প্রশ্ন করেন। এইভাবে পালাক্রমে চলে শিলুক। যারা বেশি উত্তর দিতে পারেন তাদের জিত হয় এবং অপর পক্ষ পরাজিত হয়। অন্যান্য ধরনের শিলুকও এইভাবে হতে পারে অথবা সাধারণ রঙ্গলীলা হিসাবেও হতে পারে। নিম্নে আমরা বৃহত্তর ময়মনসিংহে প্রচলিত কতিপয় গদ্য শিলুক তুলে ধরছি।

(১) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে বলছে : দুটি গাছে দুই দল পাখি বসেছিল। এক গাছের (১ম গাছের) পাখিরা অপর গাছের পাখিদের ডেকে বলছে, 'তোমাদের মধ্য থেকে একটি পাখী আমাদের কাছে চলে আস তবে আমরা তোমাদের সমান হব। দ্বিতীয় গাছের পাখিরা এ কথা শুনে বললো, না ভাই, তা নয়, বরং তোমাদের কাছ থেকে আমাদেরকে একটি পাখি দিয়ে দাও, তবে আমরা তোমাদের দ্বিগুণ হবো। এখন প্রশ্ন হলো, দুই গাছে মোট কতটি পাখি বসেছিল এবং কোন গাছেইবা কতটি?

উত্তর : দুই গাছে মোট পাখি বসেছিল বারটি। প্রথম গাছে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় গাছে সাতটি।

(২) একবার এক ব্যক্তি কিছু লেবু কিনে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। আসতে পথে সাতটি খেয়াঘাট। সে প্রতি খেয়াঘাটের মাঝিকে তার কাছে যে সংখ্যা লেবু আছে তার অর্ধেক খেয়ার ভাড়া হিসাবে দিচ্ছিল। এমন করে সে যখন বাড়ি পৌঁছে তখন তার হাতে মাত্র একটি লেবু। এখন প্রশ্ন হলো ঐ ব্যক্তি কতটি লেবু কিনে রওয়ানা হয়েছিল?

উত্তর : একশত আটাশটি।

(৩) তিন চোর গৃহস্থ বাড়ির নারকেল গাছ থেকে নারকেল চুরি করছিল। একজন আগা গাছে, একজন মধ্য গাছে এবং তৃতীয় জন মাটিতে। আগা গাছ থেকে নারকেল পেড়ে সে মধ্য গাছের লোকটির কাছে দেয়, মধ্য গাছের লোকটি মাটিতে থাকা লোকটির কাছে নারকেল দেয়। তারা এভাবে বেশ কয়টি নারকেল পেড়ে নিচে মাটিতে জমাচ্ছে। এমন সময় বাড়িওয়ালা টের পায়। সে

চোরদের দিকে আসছে। টের পেয়ে মাটিতে থাকা চোর তাড়াতাড়ি নারকেলগুলো সমান তিন ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে সটকে পড়ে। এখন টের পায় মধ্য গাছের লোক। সে তাড়াতাড়ি নেমে অবশিষ্ট যা নারকেল ছিল তা তিন ভাগ করে দেখে যে একটি নারকেল অতিরিক্ত রয়েছে। সে তার নিজের এক ভাগ ও অতিরিক্ত নারকেলটি নিয়ে দেয় দৌড়। শেষে টের পায় গাছের আগায় থাকা লোকটি। তখন গৃহস্থ তাঁর একেবারে কাছে এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি কোন ভাগাভাগি না করে অবশিষ্ট সব কটা নারকেল নিয়ে ভোঁদৌড়। নির্দিষ্ট স্থানে এসে তারা আবার একত্রিত হলো। দেখা গেলো সব চোরের হাতেই নারকেলের পরিমাণ সমান। মোট কতটি নারকেল গাছ থেকে পাড়া হয়েছিল?

উত্তর : ৬টি (ছয়টি)

(৪) একবার তিন চোর এক গৃহস্থের বাঁশ বাগান থেকে তিনটি বাঁশ কেটে ফেলে। এ সময় টের পায় গৃহস্থ। কয়েকজন মিলে তিনজন চোরকেই ধরে ফেলে তারা। বিচারের জন্য সালিশ বসে। সালিশে সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যেক চোরের পাছা দিয়ে দুটি করে বাঁশ ঢোকাবে। কোন বাঁশ না কেটে বা টুকরা না করে কেমন করে তা সম্ভব?

উত্তর : তিনটি বাঁশ দিয়ে ত্রিভুজ বানিয়ে।

(৫) একটি মহিষ পাঁচ সের, একটি গাভী এক সের ও একটি ছাগী এক পোয়া দুধ দেয়। তিন প্রকারের বিশটি প্রাণী থেকে বিশ সের দুধ কেমন করে পাওয়া সম্ভব?

উত্তর : ছাগী ষোলটি = চার সের, মহিষ তিনটি = পনের সের এবং গাভী একটি = এক সের।

(৬) এক ডুবুরি ডুব দিয়ে পুকুর থেকে শালুক তুলছিল। পুকুরের কিনারে দাঁড়িয়ে তিনটি ছেলে। ডুবুরী তাদেরকে শালুক দেবে। ডুবুরি প্রথম ডুবে বেশ ক'টি শালুক পেল। সে তা থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শালুক প্রথম ছেলেটিকে দিয়ে দিল। অবশিষ্ট শালুক নিয়ে সে দ্বিতীয় বার ডুব দিল এবং তার হাতে আগে যতটি শালুক ছিল ঠিক ততটি শালুক সে কুড়িয়ে পেল এবং দ্বিতীয় ছেলেকে প্রথম ছেলের সমান সংখ্যক শালুক দান করলো এবং অবশিষ্ট শালুক হাতে নিয়ে ফের ডুব দিল এবং তার হাতে যতটি শালুক ছিল ঠিক সমান সংখ্যক শালুক কুড়ালো। সে ভেসে উঠে এবারে সব ক'টি শালুক তৃতীয় ছেলেকে দিয়ে দিলো। ডুবুরি প্রথম ডুবে কয়টি শালুক তুলেছিল?

উত্তর : চৌদ্দটি। এবং প্রত্যেক ছেলেকে আটটি করে শালুক দিয়েছিল।

দরবারী বা মজলিসী শিলুক : কোন দরবার বা উৎসব অনুষ্ঠানে এসব শিলুক বলা হয়ে থাকে। এ সব শিলুক নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, হারজিত হয়। হয়তো কোন মাহফিলে এক পক্ষ প্রশ্ন করে অপর পক্ষ উত্তর দেয়। 'শিলুক কথক' মজলিসে পা দিয়েই ছালাম জানায়—

আচ্ছালামু আলাইকুম ভাই ডোনে-ডানে

সালামের ঢং দেখেই প্রতিপক্ষ বুঝে নেয় এ ব্যক্তি 'শিলুক কথক' প্রত্যুত্তরে দরবারীগন ও প্রশ্ন করে :

ছালামের নাই কালাম
বউনের নেই ঠাঁই
এই ছালাম জানাইলাম আপনে
কার কার পাই?

শিলুক বক্তা দরবারে আসন গ্রহণ করার আগেই এ প্রশ্নের উত্তর দেয় :

ছালামের আছে কালাম
বউনের আছে ঠাঁই।
এই ছালাম জানাইছি আমি
দশ জনের পাই॥

এই ছালাম নিয়েই বহু শিলুক প্রচলিত রয়েছে। এবারে দরবারী শিলুকের আরো কয়টি উদাহরণ; 'বহুদিন বাইরে কাটিয়ে এক ব্যক্তি বাড়িতে এসে পা দিয়েই দেখলো-তার স্ত্রী একটি ছোট শিশুকে গোসল করাচ্ছে। তার নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না। স্ত্রীর ওপর তার সন্দেহ হলো। সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল :

শাখাওয়ালী বলি তোরে
পুলা ধোস তুই কার ঘরের?

মহিলাটি ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। সে তার স্বামীকে তাৎক্ষণিক শিলুক দিয়েই উত্তর দেয়:

পুলার বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর।

উত্তর : ছেলেটি প্রশ্নকর্তার শ্যালক এবং উত্তরদাত্রীর ছোট ভাই।

নদীর ঘাটে এক যুবতীর সাথে এক অচেনা সুদর্শন যুবকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই প্রণয়ের সৃষ্টি হয়। মেয়েটি ভিন দেশী যুবককে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য সংকেতে বলে যায় :

আস্তে ধরি টিপে মারি,
চিনকারী উড়ে গায়।
বাড়ি আমার বাইর কান্দা
যাইতে হাতের বাঁয়॥

প্রশ্ন : এই সংকেতের অর্থ কি?

উত্তর-মেয়েটির বাড়ি কামার পাড়া, সে জাতিতে কর্মকার। কান্দার বাইরে এবং যেতে পথের বাম দিকে তার বাড়ি।

এক সুদর্শন অতিথি আসে একবার এক গ্রামের বাড়িতে। অতিথিটি সাংঘাতিক বাবু পায়ে জুতা, মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরী চুল। সে সকালবেলা লোটা হাতে জুতা পায়ে প্রাত:কৃত্যাদি সারতে যায়। তা দেখে এক সুন্দরী রমনী লোকটি কেমন চালাক তা পরীক্ষার জন্য বললো ঃ

হাতম লোটা, পাওমে জুতা
ছিরমে ঘুঙ্গুট বাল্,

আপ এ্যায়ছা রসিক নাগর
ঘরমে ক্যায়ছা লাল?

অর্থাৎ তুমি যে এত সুদর্শন বাবু তোমার গৃহিণীটি না জানি কেমন! অতিথি খুবই বুদ্ধিমান সে চটপট জওয়াব দেয় :

আগুন হইতে সুন্দরী সে
হীরা হইতে ধার,
তোমার মত কত নারী
তার পাবোশ বরদার॥

সুন্দরীটি আচ্ছা জওয়াব পেল এবং বুঝলো লোকটি বুদ্ধিমান।

১৯৫৭ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'দরবারী শিলুক' আলোচনা করতে গিয়ে লোক সাহিত্য গবেষক রওশন ইজদানী 'দরবারী শিলুকে' এক রাজকন্যা কোতুয়াল পুত্রের প্রণয় কাহিনী তুলে ধরেছেন। প্রয়াত লোকসাহিত্য গবেষক রওশন ইজদানীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে আমরা বিনয়ের সাথে জানাতে চাই যে তাঁর সেই 'রাজকন্যা কোতুয়াল পুত্র' প্রণয়োপাখ্যান একটি গ্রাম্য কিচ্ছা বটে। কোনক্রমেই তা শিলুক নয়। শিলুকে সাধারণত প্রশ্ন ও উত্তর থাকে অর্থাৎ দুটি পক্ষ ছাড়া শিলুক হয় না দুজনে দুপক্ষ হতে পারে আবার অনেক লোকেও হতে পারে। আমরা ছোটকালে এমনকি এখনও ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে বহু শিলুক বলতে শুনেছি যাতে প্রশ্নোত্তর থাকে মুখ্য বিষয়। প্রয়াত রওশন ইজদানী বহুল প্রচলিত এই গ্রাম্য কিচ্ছাটিকে শিলুক না বলে 'গ্রাম্য কিচ্ছা' বললেই ভাল করতেন।

বিয়ের শিলুক : বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে গ্রামের বিয়ে-শাদিতে নতুন বরের বা বরপক্ষের লোকদের বুদ্ধিশুদ্ধির যাচাই করতে এসব শিলুক কথিত হয়ে থাকে। এখানেও প্রশ্ন আছে উত্তর আছে। যেমন কনে পক্ষ বরপক্ষকে জিজ্ঞেস করে :

আছছালামু আলাইকুম হেন্
জামাই আইছে শ্বশুর বাড়ি আপনারা আইছেন কেন?

কনে পক্ষের লোকদের এই প্রশ্ন শুনে বরপক্ষের চালাক চতুর লোকটি উত্তর দিলেন:

ওয়ালাই আছছালাম উবা,
জামাই আছে শ্বশুর বাড়ি, আমরা আইছি শোভা॥

এরপর নতুন বরকে বাড়ির ভেতর নেওয়া হয়। নতুন বরের শালী, ভাবী, দাদি শাশুড়ি, নানি শাশুড়ি এরা অথবা এদের মধ্যে যে কেউ নতুন বরকে পান সাজিতে পান দিয়ে শিলুক বলে প্রশ্ন করে :

পান পান সাবাস পান
গুয়ার নাম মামুদজান,
অবিচারে খাইলে পান
কাটা যাইব জামাইর কান॥

অথবা

তা হিসাব কইরা ছইন পান
বিচার কইরা খাওহাইন পান;

অবিচারে খাইলে পান
কাটা যাইব সবার কান॥

অথবা

পান খাও পণ্ডিত ভাই কথা কও ঠারে
এই পানের জন্ম কোন কোন বারে?
যদি না কও পানের জন্ম কথা
ছাগল অইয়া চাবাইবা শেওড়ার পাতা॥

শিলুকের উত্তর না দিয়ে পান স্পর্শ করার কোন উপায় নাই। এমতাবস্থায় বরপক্ষের কোন একজনকে জওয়াব দিতেই হবে :

হাতুড়ের টনটনি মেখুরের খিলি
এক্কই ঠোকরে ভাঙবাম বাটার খিলি॥

অথবা

আষাঢ় মাসে গোয়ার জন্নম
মঙ্গল বারে পান,
পান আছিল সমুদ্দুরে
আন্‌ল হনুমান॥

বিয়ে-শাদিতে পানের শিলুক বিশেষ করে মেয়ে মহলেই প্রচলিত। বিয়ের মজলিসে আবার কোনো কোনো সময়ে দরবারি গদ্য শিলুকও প্রচলিত ছিল। এই প্রশ্নোত্তর নিয়ে অনেক সময়ে বিয়ের মজলিসে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়েছে এবং বহু বিয়ে ভেঙ্গেও গেছে বলেও শুনা যায়।

ছুটকি শিলুক ঃ ছুটকি শিলুক সাধারণত কবিতার ছন্দে হয়ে থাকে। গরমের দিন সন্ধ্যার পর দাওয়ায় বসে আমরা ছোটকালে মুরব্বিদের মুখে এইসব শিলুক শুনেছি। এ ধরনের শিলুক একান্তভাবেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। একজন শিলুকের মাধ্যমে প্রশ্ন করবেন এবং অন্যদের যে পারে, সে-ই তার উত্তর দিবে। অনেক সময় উত্তরের জন্য সময় বাঁধা থাকে। একটি প্রশ্নের উত্তর না হলে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা নিষিদ্ধ থাকে। ছুটকি শিলুকে আবার কোনো কোনো সময় অশ্লীলতাও থাকে। ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছুটকি শিলুকগুলি ধাঁধা'র মতো। উদাহরণ :

(ক) ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে রাও নাই॥
উত্তর : কবর।

(খ) ছেপদিয়া, লেপদিয়া, টানিয়া টুনিয়া
খাড়া কইরা, ভিতরে দিলাম ঢুকাইয়া॥
উত্তর : সুঁইয়ে সুতা চড়ানো।

(গ) দুইজনে ধরে, আতকা জাতা মারে
গুড়া কইরা ছাড়ে॥
উত্তর : যাতি দিয়ে সুপারি কাটা।

(ঘ) এক বেটি উনি, তার তিন বুনি॥
উত্তর : চূলা

(ঙ) এক বেটির বুনি নাই পোলা পানের সীমা নাই॥
উত্তর : বাচ্চাওয়ালা মুরগি।

(চ) আভাগীর ঘরের খোয়ারী এমন ডাক ডাকে
আমানুষ ভাল মানুষ সকলেই ঠেকে॥
উত্তর : টিকটিকি।

(ছ) গাই এ ভাঙ্গে নল খাগড়া
বাছুরে ভাঙ্গে আইল
ছয় মাস আগে গাই ফিরাইছে
বাছুর অইছে কাইল॥
উত্তর : কাছিমের ডিম ফুটা

(জ) গাঁয়ের নাম কালিয়াজিরা মধ্যে দিয়া খাল
বাপে পুত্রে বায়রা, মায়-ঝি এ জাল॥
উত্তর : রান্নারতা মাও মেয়ে
এবং বাইরে পিতা-পুত্র কাজ করছে।

(ঝ) ওরে ভাই উনা
দুই পায়ে যাইতে দেখ্ছ তিন জনা?
উত্তর : ছেলে কোলে গর্ভবতী মা।

(ঞ) মাইয়া আছিল নারীর পেটে
আমি গেছলাম চিরাং এর হাটে॥
উত্তর : থরুয়া (কলার মোচা)

(ট) মুখটা কালা সকলে কয় ভালা
কালিদাস পণ্ডিতে কয় উঠে না আর যদি শোয়॥
উত্তর : নারীস্তন

(ঠ) খায় দুধ ভাত আগে ঘি
বিনা ঠেংগে খাড়য় কি?
উত্তর : পুরুষাঙ্গ।

বর্তমানে কিছু কিছু শিলুক আধুনিক ভাবধারার পরিচয় বহন করে। এগুলো একেবারে হালের। নিম্নে উদাহরণ :

(ক) কালো বন তলে
কালো হরিন চলে॥
উত্তর : উকুন।

(খ) রামের বামেতে বসি
নহি আমি সীতা,
উড়িষ্যা দেশেতে আছে

মোর এক মিতা।
সাগরে, চরে আছি
নদীতে নাই,
বল তো দেখি আমি
কোন জিনিষটা ভাই?
উত্তর : 'র' অক্ষর।

(গ) পা পিষ্ঠ মাথাটা
দুই হাত বিশ আঙ্গুল নাকটা
চক্ষু কর্ণ নাই (নাভি)
কোন জিনিসের ভাই॥
উত্তর : মানুষ।

(ঘ) দ্বাদশ লোচন বিংশতি চরণ
দু'হাতে দণ্ড ধরি রথে আরোহণ করি
শাস্ত্রে যাহা নাহি পাই,
ভূমণ্ডলে তাহা পাই॥
উত্তর : দুহালের মই।

শিশু শিলুক : শিশু শিলুক বা ধাঁধা শিশু ও কিশোর মহলে পরিচিত। এগুলো সহজ সরল। একটু চিন্তা করলেই তা উত্তর করা যায়। অনেক সময় এগুলো বড়রাও চর্চা করে থাকেন। এগুলো ছুটকি জাতীয় শিলুক। ছন্দোবদ্ধ। সাধারণত এক কথায় উত্তর দেয়া যায়। নিম্নে শিশু শিলুকের উদাহরণ :

(১) জঙ্গল থেকে আইল ভুতিয়া
পাতে দিল মুতিয়া॥
উত্তর : লেবু।

(২) আসমান থাইকা নামলো বুড়ি
তেনাতোনা লইয়া,
ছন খেতে নামায পড়ে
আল্লা হকবর কইয়া॥
উত্তর : বজ্রপাত।

(৩) মামুদের বাড়ি গেলাম
দেউড়িতে মুছিয়া দিলাম॥
উত্তর : নাকের বিষ্টা

(৪) ছোট খাট পুস্কনী কই এ গুড়গুড় করে
রাজা আয়ে বাদশা আয়ে তুইল্যা সেলাম করে॥
উত্তর : হুঁকা।

(৫) গাছের নাম জগতমাতা
একেক ডালে একেক পাতা॥

উত্তর : কলা গাছ অথবা কচু গাছ।

(৬) আগ্ দড় দড় গুড়ি মোটা পাড়ের বেটা সেকান্দর
এই শিলুক ভাঙ্গাইতে লাগে বেইলের আড়াই পর॥
উত্তর : মাখন তোলা কুরা।

(৭) মামুদের বাড়ি গেলাম
ছনে বনে শুইয়া রইলাম॥
উত্তর : বাঙি ফল।

(৮) মামুদের বাড়ির পিছে
ঘাড় ভাঙ্গা বলদে নাচে॥
উত্তর : ঢেকী।

(৯) সোনা পংখী পানি খায়
দুনিয়াই দেখা যায়॥
উত্তর : আয়না।

(১০) ঠাইরো লাই
খাই বস্তুর বাকল নাই॥
উত্তর : লবন।

(১১) হাত আছে পাও নাই
গলা আছে মাথা নাই॥
উত্তর : জামা

(১২) কাঠের বলদ গোস্তের শিং
চলছে বলদ্ বাদলা দিন॥
উত্তর : শামুক।

(১৩) ছোট খাট গাছ খান
গোড়া ধরে পাঁচ খান,
সেই পোড়া লাল অয়
হাজার টাকার মাল অয়॥
উত্তর : কমলা।

(১৪) খাইলে হুডা
না খাইলে মোডা॥
উত্তর : কলা।

(১৫) কোন জিনিষ টানে টানে খাটো হয়?
উত্তর : জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট।

(১৬) পানির তলে নারকেল গাছ
কাটতে লাগে বার মাস॥
উত্তর : ছায়া

(১৭) এমন কথা শুনছনি?

গাছের আগে পুস্কনী॥

উত্তর : ডাব/নারকেল।

এ জাতীয় অসংখ্য শিলুক বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রায় সর্বত্রই এখনও চালু আছে। এগুলো কার রচনা, কবেকার রচনা তা বলার উপায় নাই। তবে এই গ্রাম্য শিলুকগুলি যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতজনে আনন্দ দিয়ে আসছে। এখনও শিশু-কিশোর মহলে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

আরও তিনটি শিশু শিলুক :

(ক) পাঁচ বেডায় তুইল্যা দেয়
বত্রিশ বেডার ঘাড়ে,
দুয়ারে আছে বুইড়্যা বেডা
টাইন্যা নেয় ঘরে॥
উত্তর : ভাত খাওয়া।

(খ) আছিলাম পাত্তালে
তুলছে খচ্চরে
ছুঁয়োনা আমারে
নিবো গ্যা তোমারে॥
উত্তর : কেঁচো গেথে বড়শিতে মাছ ধরা।

(গ) ভিতরে হইলদা, উপরে সাদা
এই শিলুক যে ভাঙ্গাইতে না পারবে, সে একটা গাধা॥
উত্তর : ডিম।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন লোকেরাই সাধারণত শিলুকের সঠিক উত্তর করতে পারে। অনেক ধরনের শিলুক বা ধাঁধা অংকের নিয়মে করতে হয়। নিবন্ধের প্রথমে উল্লেখিত গদ্য শিলুকগুলি গাণিতিক নিয়মে অংক কষে উত্তর দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর ময়মনসিংহের শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরাঞ্চলেও এসব শিলুক চালু আছে কমবেশি অদ্যাবধি।